কবিয়াল

এণ্টনী ফিরিঙ্গী

মদন বন্দ্যোপাধ্যায়

সত্যব্রত লাইব্রেরী ॥ কলিকাতা ৬ ॥

দ্বিতীয় সংস্করণ
২৯শে শ্রাবণ, ১৩৬৫

প্রকাশক
সত্যব্রত গুহ
৭বি, রাজেন্দ্রলাল স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ শিল্পী
শঙ্কর দাশগুপ্ত

প্রচ্ছদ মুদ্রক
মোহন প্রেস
২, করিশ চার্চ লেন
কলিকাতা-৯

ব্লক
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এন্‌গ্রেভিং কোং
১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

মুদ্রক
শ্রীগৌরচন্দ্র পাল
নিউ শ্রীদুর্গা প্রেস
২।১, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

৫.৫০ ন. প.

বাংলার কবিগানের লুপ্তপ্রায় ঐতিহ্যকে
আজও যাঁরা সজীব রাখার চেষ্টা
করছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে

বাংলা সাহিত্যে কবিয়ালদের উদ্ভব আকস্মিক বা তৎকালীন বাবু-সমাজের খেয়ালখুশিতে নয়। মোটামুটি ভাবে যদি আমরা বাংলা সাহিত্যের প্রচলিত ধারার দিকে দেখি, তাহ'লে দেখা যাবে আদি থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ধারাই গীতিধর্মী। যাত্রা, কবি ও পাঁচালীকাররাই এ ধারার শেষ উত্তরাধিকারী। এবং শুধু তাই নয় এই কবি-গান, যাত্রা-গান ও পাঁচালী-গানের মধ্যেই শাক্ত ও বৈষ্ণব—বাংলার এই চিরন্তন ধারা মিলিত হয়েছে। বাঙালীগণ একই সঙ্গে শাক্ত ও প্রেমের পূজারী একথা তাঁরাই প্রথম বললেন তাঁদের গানের মধ্য দিয়ে।

যাত্রা, পাঁচালী এবং কবিগান এ তিনেরই প্রাণ প্রতিষ্ঠা গীতি-মুখরতায়। চর্যা থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হ'য়ে যে গীতিধারা বৈষ্ণবে এসে মিশেছিল—তারই মূল গতি-শাক্ত-সংগীতে মিলিত হ'ল। তারপর চলে গেলেন ভারতচন্দ্র, ইংরেজ হাত বাড়াতে লাগল বাংলার সংস্কৃতির উপর—এ থেকে পাশ কাটিয়ে বাংলার একান্তই নিজস্ব গীতিধারার অনুসন্ধান—যাত্রা, পাঁচালী এবং কবি-গান।

কবিযুগকে উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের সূতিকাগার বললে সম্ভবত অত্যুক্তি হয় না। দশম শতাব্দী থেকে যে কাব্যসত্তার রূপ-গ্রহণকার্য চলছিল তার প্রথম ছেদ ভারতচন্দ্রেই; আর ভারতোত্তর কাব্যসাহিত্য—কবিগান—সেতুসম্ভব ক'রে তুলেছে সম্প্রতি কালের অভিজাত কাব্যসত্তার সঙ্গে বাংলার প্রাচীন কাব্যসত্তার।

কবি বাঁধুনির নানান্ রীতি প্রচলিত ছিল। ছকে বাঁধা গান (দাঁড়াগান) থেকে একেবারে সভাস্থলে গান বেঁধে এই কবিওয়ালার দল নিজেদের বুদ্ধির প্রাখর্য, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং সারস্বত কর্মের অধিকার প্রতিষ্ঠা ক'রে গেছেন।

দুঃখের বিষয় সভাস্থলে রচিত গীতিগুলির অধিকাংশই আজ আমাদের আয়ত্তের বাইরে। প্রসংগত বর্তমান উপন্যাসের নায়ক

এণ্টনী কবির গানগুলির কথা বলা যেতে পারে। তৎরচিত বহু গীতির কথা আমরা শুনে এসেছি, অথচ কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হ'তে গিয়ে দেখা গেল, সভাস্থলে রচিত তাঁর গান নিতান্তই দুর্লভ। সাধারণ কারণেই আমাকে তৎকালীন সংবাদপত্রের সাহায্যে সভাস্থলের বর্ণনা ও প্রতিপক্ষের প্রাপ্ত গান-মাধ্যমে পরিবেশ সৃষ্টি করতে হয়েছে।

রাজন্যপোষণ থেকে বর্জিত এই সাধারণ মানুষের দল, সাধারণ মানুষেরই জয়গান গেয়ে গেছেন। দুঃখের বিষয় বাবুদের পৃষ্ঠপোষণ অর্থানুকূল্যেই শেষ হয়েছে। নইলে বাবু-স্মৃতির বহু সামগ্রী সাক্ষ্য-স্বরূপ রইল—রইল না শুধু হাড়ি, মুচি, ধোপা, ময়রা এই জাত-কবিদের বিস্তৃত কাব্যকথা।

যাই হোক্ এ সমস্ত অসুবিধাকে অঙ্গীকার ক'রেই এ উপন্যাসের সুরু। এত কবি থাকতে এণ্টনীকে নিয়ে কেন উপন্যাস তৈরী হ'ল এ প্রশ্ন স্বাভাবিক। এণ্টনীর কবিদলে আবির্ভাব থেকে কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত যে জীবন-গতি, তার সামাজিক জীবন ও ভাবজীবনের পরিণতিই মূলত তাঁকে সমগ্র কবি-সমাজের পুরোধা ক'রে তুলেছে। এক কথায় তৎকালীন কবি-সমাজ জীবন্ত রূপ পরিগ্রহ করেছে এণ্টনীতে। তাই তাঁর প্রতি এই আকর্ষণ।

প্রসংগত বলা যেতে পারে বর্তমান উপন্যাস রচনায় কল্পনার পরিধিকে সীমায়িত করতে হয়েছে। বোধ হয় দুটিমাত্র ক্ষেত্রে বিতর্কের সুযোগ রাখা আছে। একটি নায়িকার নামকরণে, অপরটি মন্দির প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে।

অনেকের মতে নিরুপমা-ই এণ্টনী-পত্নীর নাম। কিন্তু প্রতিপক্ষ হিসাবে ভোলা ময়রার গানে সৌদামিনী নামের ব্যবহার দেখা যায়। 'তোর বামৃনি সৌদামিনী'……ইত্যাদি। এ হেন পরিস্থিতিতে আমি সৌদামিনী নামটি গ্রহণ করি।

বৌবাজার স্ট্রীটে Indian Association Hall-এর বিপরীত দিকে আজও যে মন্দির বর্তমান—সেই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী মাতৃমূর্তি 'ফিরিঙ্গী কালী' নামে প্রচলিত। এই ফিরিঙ্গী প্রতিষ্ঠাতা কে? এণ্টনীর জীবন পরিণামের সঙ্গে কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা কিছুই আকস্মিক

নয়। পূর্বসূরী অনাথকৃষ্ণ দেব এবং হেমেন্দ্র দাশগুপ্ত প্রমুখ বিদগ্ধজনের বিক্ষিপ্ত আলোচনা ঐ প্রসঙ্গে আমার সিদ্ধান্তের ভিত্তিভূমিও বটে।

পরিণত সাহিত্য ঐতিহ্যের প্রায় সব ক'টি লক্ষণ যখন বাংলায় স্পষ্ট—সেই সময় 'চরিত্র উপন্যাস' সৃষ্টির তাগিদ আমি ভেতর থেকে অনুভব করি। বিগতকালের কোন খ্যাতিমান্ ব্যক্তিচরিত্র নিয়ে উপন্যাস করতে গেলে উপাদানের স্বল্পতা প্রথমেই দেখা দেয়। আবার স্বল্পদিনের খ্যাতকীর্তি চরিত্রের অতিপরিচিতি ঔপন্যাসিকের পক্ষে বিশেষ পরীক্ষা সাপেক্ষ। 'চরিত্র উপন্যাস' গ'ড়ে ওঠে সফল মানুষের জীবনকথায়। পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক উপন্যাসেও খ্যাতকীর্তির চরিত্র থাকে। কিন্তু চরিত্র উপন্যাসে চরিত্রই মূল রসকেন্দ্র আর তাকে ঘিরেই ঘটনাস্রোত বা অন্য চরিত্রের গতায়াত ঘটে। এখানে অনেক সময়ই মানবিক লক্ষণাদি উহ্য রাখতে হয়। সমগ্র কবি-সমাজের নিরবয়ব রূপটি এণ্টনীর ভেতর কিন্তু মূর্ত করতে হয়েছে। তাই যেখানে সাংকেতিকতার আশ্রয় নেওয়া প্রয়োজন ছিল, সেখানে আমি মানবিকতার পরিস্ফূটনে ব্যস্ত থেকেছি।

উপন্যাসের প্রাথমিক উপাদান সংগ্রহ ব্যাপারে আমি হাওড়া জেলার 'চন্দ্রভাগ' গ্রামের শ্রীকৃষ্ণ পাঠাগার, হুগলী জেলার দিগ্ সুই গ্রামের সাধনা সাহিত্য কুটীর, ক'লকাতার চৈতন্য লাইব্রেরী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ ও বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরী প্রভৃতির আনুকূল্য পেয়েছি। ব্যক্তিগতভাবে শ্রীনারায়ণ চৌধুরী, ভোলা ভট্টাচার্য, হীরেন বসু, নিশীথ ঘোষাল, পশুপতি ভট্টাচার্য প্রভৃতির কাছ থেকে তথ্যাদির ব্যাপারে নানাভাবে সাহায্য পেয়েছি। তাঁদেরকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। বর্তমান বাংলার শ্রেষ্ঠ কবিয়াল শেখ গুমানী দেওয়ান মহাশয়ের নামও এই গ্রন্থের সংগে চিরকাল থাকবে। তাঁর উৎসাহ আমার পক্ষে এক বিশেষ সম্পদ।

পরিশেষে, নিরীক্ষার স্তরের এই উপন্যাসের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ব'লেই আমার মনে হয়।

সময়। ধিক ধিক করে এগিয়ে যাচ্ছে। নতুনকে প্রাণ দিয়ে, যৌবন-জলে স্নান করিয়ে রূপ-রস-গন্ধে অনুরক্ত করিয়ে কাল-বৃদ্ধ স্থির শূন্যে বিলীন করে দিচ্ছে। সময়। তাকে কি নির্ণয় করা যায় না?

না।

চমকে উঠি। দমকা বাতাস এল খানিকটা বর্তমান কালের ধুলো নিয়ে। রাস্তায় একটা হাডসন গাড়ী কির্ কির্ শব্দে বাতাস চিরে এগিয়ে গেল। আবার ঠাণ্ডা। ঝিরঝিরে হাওয়া। ধিক ধিক সময় বয়ে যাওয়া। সামনে গঙ্গা। ওপারে মিল। আকাশে তারার আলো। মিটমিট করে জ্বলছে।

সন্ধ্যা আঁধার। এপারে রাস্তার আলো জ্বলেনি। মন চারদিকে ঘুরে আবার স্থির হল।

প্রশ্ন জাগল। সময়। তাকে কি নির্ণয় করা যায় না?

যায় বইকি।

কি করে?

শ্রুতিকে অনুসরণ করো।

শ্রুতি? কিন্তু তুমি কে?

আমি? একটা ম্লান হাসি শুনলাম। ওপাশে বিশ্রামালাপী দুই সখার মধ্যে একজন হাসছে। আর আমার সামনে একটা ধুলোর ঘূর্ণি।

এই যে আমি।

ওতো মলিন ধূলি।

হ্যাঁ, আমি ধূলি। এখানকার পুরাতন ধূলি। কত কাহিনী, কত আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন, সুখ-দুঃখের ইতিহাস আমি বহন করে চলেছি তা যদি জানতে, যদি শুনতে।

হে পুরাতন, আমাকে ক্ষমা করো, ধূলি বলে তোমায় তুচ্ছ করেছিলাম। তুমি পবিত্র, তুমি মহৎ। তুমি আমার প্রণাম গ্রহণ করো।

ইতিহাসকে বর্তমান শ্রদ্ধা করে না বলেই তোমার মনেও তুচ্ছ-ভাব এসেছিল। ও কিছু না। জানো, একদিন তোমার মত আর একজন এখানে এসে বসেছিল। তোমার মত একটা বিবাগী মন। দীর্ঘশ্বাস আমাতে মিশিয়ে বলেছিল—কি ছিল, আর কি হয়ে গেল—চন্দন গন্ধের জায়গায় পচা গন্ধ। কত বড় বড় নৌকো লাগত। চন্দন কাঠের, বড় এলাচের। কত দেশবিদেশের লোক। কত সখ্যতা। হায় রে কাল! সব ভুলিয়ে দিলে।

হায় রে কাল! সব ভুলিয়ে দিলে। প্রতিধ্বনি করে উঠলাম। দূরে পুরাতন ঘড়ি ঢং ঢং করে সময় অতিক্রমণের সঙ্কেত ঘোষণা করল। সাতটা।

মৃদু একটা সুর আসছে। সস্তা ওয়াল্‌জ্‌। হোটেল। ওপারের মিলের অবুঝ সাদা মানুষগুলো মদ খেতে এসেছে হোটেলে। গ্রামোফোন রেকর্ড বাজছে।

ও কী বাজনা! কত উচ্চস্তরের গানের মজলিস হয়ে গেছে সেকালে ঐ ইঁট-ভাঙ্গা ইন্‌-এ। কত রকমের গান—ফরাসী, পর্তুগীজ, ইংরেজী। কত রকমের বাজনা বাজত। মন-প্রাণ খুলে তারা আনন্দ করতে জানত। সময় হিসেব করত না। তোমরা কিছুই আস্বাদ করতে পারলে না। বড় সংকীর্ণ কালে এসেছ।

সংকীর্ণ কাল!

সত্যিই বড় ক্ষুদ্র বিচারের পরিধি এই সংকীর্ণ কালের। দেশ থেকে প্রদেশে, প্রদেশ থেকে জাতে, জাত থেকে গোষ্ঠী পরিবারে,

গোষ্ঠী পরিবার থেকে একক স্বামী-স্ত্রী-পুত্রে। তাও স্বার্থ সংকীর্ণতায় সদাই ডুবু ডুবু। পিতার কাছে পুত্র বিমুখা, পুত্রের কাছে পিতা। প্রেম, স্নেহ, মমতা, শ্রদ্ধা, এইসব হতভাগ্য কথাগুলো তোমাদের স্বার্থের সংকীর্ণতায় লুপ্তপ্রায়। নবীন মেঘ দেখলে যৌবন উচ্ছল হয়ে উঠে। নবীন ধারায় সিক্ত হাওয়ার তীব্র বাসনা জাগে। তারপর বর্ষণ যখন নিত্যসঙ্গ দেয়, আকাশ যখন বিরহী চোখে সদাই উদাস, তখন যৌবন বিরক্ত। ঘন বর্ষার ক্লান্ত একঘেয়ে দিন ভাল লাগে না। তোমরা ওপর ওপর কণামাত্র নিতে চাও, গভীরে যেতে চাও না। গভীরে যেতে যে চরণ ক্লান্ত হয়। দিন যায় অনেক। বর্তমানের ধর্ম যে অস্থিরতা। তাই তোমরা প্রেম, স্নেহ-মমতা, শ্রদ্ধা-ভালবাসা, আত্মীয়তা, আতিথেয়তা, নিষ্ঠা, ভক্তি, উপাসনার সত্যিকার রূপ দেখনি। তারা আমার মতই ইতিহাসের ধুলিতে লীন হয়ে গিয়েছে।

স্তব্ধ হয়ে বসে থাকি। মৃত্নমন্দ হাওয়ার সঙ্গে কানে কানে কে যেন আবার বলল: স্থির হও। তোমাকে আমাদের এখানকার একটি পুরাতন পরিবেশে নিয়ে যাচ্ছি।

যখনকার কথা বলছি তখন এই সহর তেমনি জমজমাট নয়। ইংরেজরা প্রবল হয়ে উঠছে। কলকাতা সহরকে ধীরে ধীরে জমিয়ে তুলছে। তবু এখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের কোন অসুবিধা ছিল না। মালের আমদানী-রপ্তানী পুরোদমেই চলত।

সারাদিন এই গঙ্গার ধারে, যেখানে তুমি বসে ধীরে ধীরে অতীত ইতিহাসে নিজেকে খুঁজতে যাচ্ছ, সেখানে সারাদিন কর্মব্যস্ততা। তীরে বড় বড় গহনা নৌকো। পালের জাহাজ। ছোট ছোট পানসির ভীড়। তীর থেকে মাল আসে, জাহাজ নৌকো থেকে নিয়ে যায়। রামে রাম, ত্নয়ে ত্নই, তিনে তিন—কাঠিদার মালের হিসেব গোনে।

তীরে গরুর গাড়ী, ঘোড়া, জুড়ি, পালকির সঙ্গে নানা জাতের মানুষের ভীড়। বটতলা, অশথতলায় তামাকের দোকান, গাঁজা-

গুলির আড্ডা। মদের দোকানের পাশে ফলমূল, সরবৎ আর খাবারের দোকানে মাঝিমাল্লা, ফিরিঙ্গী, ব্যাপারী, ভিখারী আর নানা রকমের দালালদের ভীড়।

প্রয়োজনীয় কাজের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা-তামাশা আর রঙ্গ-রসের যতি ছিল গালিগালাজ। সাহেবের চপেটাঘাতের সঙ্গে জুতোর ঠোক্কর নিত্যসঙ্গী করে জনেরা কাজ করে। মুখে তাড়ি আর মদের গন্ধ। চোখে গোলাপী নেশা। চোখপাকানি আর গালাগালের ফাঁকে তাঁরাও তুকলি রসের চুটকি দিয়ে মনটাকে সরস করে বৈরী ভাবটা মুছে ফেলতে দ্বিধা করে না।

এমনি এক কর্মমুখর বেলায় একটি কুড়ি-একুশ বছরের গোরা যুবক কুর্তা-পাৎলুন-টুপি পরে ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে তীরে নামল। তারপর শিস্ দিতে দিতে সামনে এগোয়। ফোতোকাপ্তেন, মোসায়েব, ফিরিঙ্গী চাটুকার দালাল পিছু পিছু যায়। গোরা যুবকটি হাসে আর আড়চোখে চেয়ে চেয়ে শিস্ দেয়।

—আরে, হান্স যে! কবে ফিরলে?

স্মিতহাস্যে বললে গোরা যুবকটি—এই নৌকো ভিড়ল।

—তারপর, বাজার কী রকম বুঝছ?

—এখনও বুঝিনি। বোঝার চেষ্টায় আছি।

—হাঁ, ভাল কথা, জোসেফিন প্রায়ই তোমার নাম করে। যেও কিন্তু সন্ধ্যার পর। একটু পানাহার করা যাবে।

—ও নিশ্চয়, যাব বইকি।

—কী আনলে, লবণ ছাড়া?

—নানান্ জিনিস।

—কাকে দিলে?

—সেনেদের গুদামে তুলছি, তারপর দেখি। আচ্ছা চলি। শিস্ দিতে দিতে হান্স এগোতে থাকে।

—সেলাম সায়েব। লোকটি সামনে এসে পাকানো কুঁচি-করা চাদরটায় মোচড় দিয়ে মাথা হেঁট করল।

—আজ্ঞে হুজুর একটু যদি মীমাংসা করে দেন মোদের মামলাটায়।

—মামলা! হামি কী মীমাংসা করিব?

—আজ্ঞে, আপনারা প্রভুর জাত, একটু কৃপা করুন। আসুন না হুজুর এই দিকে।

—কী ব্যাপার আছে বোলিবে তাড়াতাড়ি। হামি যাইব।

—একটু তফাতে তাহলে আস্তে হয় আজ্ঞে।

—চল, কোথায় যাইতে হইবে।

—এই যে।

লোকটি এগিয়ে চলল তীর থেকে বড় সড়কে পা দিয়ে সামনের একটা ছোট সড়কের দিকে। ভেতরে একটু ঢুকেই পুকুরের ধারে বটতলায় কয়েকজন লোক গোল হয়ে বসে আছে। সেখানে ওরা এল।

—এনেছি হুজুরকে। হুজুরই বিচার করুন কার আগে প্রাপ্য। কে ওস্তাদ।

—কী ব্যাপার আছে?

—ব্যাপারটা আর কিছুই নয় সায়েব, কুড়ি ইঞ্চি ছাতির বড় আম্বা হয়েছে, হেড়ো তুম্বার মতন তাই তোমাকে সালিশী মেনেছে।

—ওরে আমার গরু-ঢাকির নন্দন, বাজান্ তো ধপাস, এ তো তাকুড় তুকুড় নয়, এ হল বম্ বম্ ফটাস।

—এই উল্লুক, কী ব্যাপারটি আছে আগে বলিবে।

—ব্যাপারটা সায়েব ছোট তামুকের। কে পেরসাদ করে দেবে তাই নিয়ে টানাটানি। কল্কেটার এখন দ্রৌপদীর মত নীরস অবস্থা, আমরা মা-হারা পঞ্চ পাণ্ডব, তাই ভাগ নিয়েই গোল।

—কই দেখি, কী জিনিষ আছে?

—এসো সায়েব, এই যে আমাদের চাঁদবদনি।

লোকটি হান্সের হাতে কল্কেটা এগিয়ে দিল।

—দাও, ফারার দাও।

—এঁ্যা! তুমিই তাহলে প্রসাদ করে দেবে!

—তামাকু আছে, আমি ফায়ার করিতেছি অগ্রে, ইহার পর হামি যাকে দিবে সেই প্রথম হইবে।

—ইয়া আল্লা একী পাল্লা!

—কা বকছে, ফায়ার দিবে না তো ভেঙ্গে দিয়ে যাইবে।

—আরে কর কী সায়েব! এই নাও। কিন্তু এইভাবে বস, আমার মত উবু হয়ে। তারপর কল্কেটাকে দু'হাত দিয়ে আঁকসির মত আটকে দাও বদনে, আর শেষবেশ মার টান বম্ বম্ দম-ভরে। কী রে নটবর, গোঁজলা কবির গানটা ধর্‌না, সায়েব রসেন নিক।

নটবর দাঁতের কাঠিটা ফেলে দিয়ে কানে হাত দিয়ে সুর ধরলে উচ্চগ্রামে :

এসো এসো চাঁদবদনি
এ রসে নীরস কোরো না ধ্বনি,
তোমাতে আমাতে একই অঙ্গ,
তুমি কমলিনী আমি সে ভৃঙ্গ,
অনুমানে বুঝি আমি যে ভুজঙ্গ,
তুমি আমার তায় রতন মণি।

—এই তো সায়েব, ঠিক হচ্ছে। বম্ বম্, ওস্তাদ বটে! বল্‌না ব্যাটা নটবর, থামলি কেন ছানাবড়া চোখে। ওরে, ও আমাদের স্বয়ং ওস্তাদ। গা ব্যাটা—কী বল সায়েব?

হান্সের তখন বলবার মত অবস্থা নেই। এ কী তামুক রে বাবা! তবু প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে হান্স বললে—ঠিক বলিয়াছ। নাও, তুমি প্রসাদ ধর কালো বেবুন।

কালো লোকটি অমনি হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ছোঁ মেরে কল্কেটা নিয়ে ঘাড় হেঁট করে বললে—ওস্তাদের জয় হোক।

হান্সের তখন চোখ রেঙেছে। মনও একটু। তাই ঘাড় দুলিয়ে নটবরকে হুকুমের সুরে বললে—চালাও গাহনা চালাও।

নটবর গাইতে থাকে :

তোমাতে আমাতে একই কায়া
আমি দেহ প্রাণ তুমি লো ছায়া
আমি মহাপ্রাণী তুমি লো মায়া
মনে মনে ভেবে দেখ আপনি।

গান শেষ হলে হান্স অর্ধনিমীলিত নয়নে নটবরের দিকে চেয়ে বললে—অতি সুন্দর, আমাকে একটু বুঝাইবে।

—ও কি ছাই বেঝাবে ওস্তাদ, দাড়াও—। টান শেষ করে কল্কেটা আর একজনকে দিয়ে।—শোন বলি, তোমাতে আমাতে একই কায়া মানে হচ্ছে, এই ধর তুমি আমি, আমরা দুজনে মিলে এক—বুঝলে ?

—হুঁ, তাহার পর ?

—তারপর আমি যদি দেহ হই তুমি ছায়া মানে ঐ রোদে আমার যে ছবি দেখছ, দেখছ তো ? ঐ যে। অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখিয়ে বললে লোকটি—ঐ তুমি।

—বুঝিলাম অতি গভীর থট্, কিন্তু হামার যে মাথাটি ঘুরিতেছে।

—ও একটু ঘোরে ওস্তাদ, দমটা জবর দিয়েছ। তা হারু দে না ইঁট এগিয়ে, ওস্তাদ একটু গড়িয়ে নিক।

ইঁট পেতে দিল হারু। হান্স ইঁট মাথায় দিয়ে আড় [illegible] মাটিতেই শুয়ে পড়ল।

—যাক বাবা, একটা সায়েব তাহলেক দলে এল। দিন কতক মজা লোটা যাবেক। বললে রোগা খেরকুটে হান্সের সঙ্গে প্রথম দেখা লোকটি।

—তা যা বলেছিস্, শাপে বর হল মাইরি। কে বললে নিতু গয়লার বুদ্ধি নাই ? খাসা বুদ্ধি—দেখি দেখি থুতনিটা, একটু চুমু খাই।

—যা শালা, চামার কোথাকার। ফিচ্‌লেমি ভাল লাগেক না।

—কী ভাল লাগে, খেঁতুমণির ঠোনা। তা যা খেঁতুমণির ওখানেই যা।

তার কী আর উপায় আছে রে শালা, গাঁজায় রাজা হলে বেশ্যে মাগীরাও দূর দূর করে। হাতে রূপচাঁদ নাই। চল না একদিন নন্দদুলালের মাটি খুঁড়ি। ইন্দর চৌধুরীর অনেক সোনাদানা ওখানে পোঁতা আছে। যুদ্ধের সময় নাকি পুঁতে রেখেছিল।

—তোর জন্যে বোধ হয়। তুই তো কড়ে রাঁড়ীর ভাতার হবি কিনা, তাই গাচ্ছিত আছে। যা শালা যা, আমরা যাবুনি।

—দেখ, হারু, ইঁট দিয়ে তোর মাথার খুলি ফাটিয়ে দোব বলছি।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, তালপাতার সেপায়ের মুরোদ জানা আছে।

—তবে রে শালা—। একটা আদলা ইঁট ছুঁড়ল নিতু গোয়ালা।

ওদিক থেকেও ইঁট আসে। তারপর ছত্রভঙ্গ। হান্স নির্বিকার হয়ে শুয়ে পড়ে থাকে। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে রোদ এসে ওর রাঙা মুখ আরো রঙীন করেছে। দু-একটা পাকা বটফল কুর্তায় টুপিতে ইতস্তত টুপ টুপ পড়ে। পাখিরা শুকনো কুটোর সঙ্গে বিষ্ঠাও ফেলে।

পুকুরের ওপারে গৃহস্থবাড়ীর বৌ-ঝিরা পুকুরে বাসন মাজার সময়, আহারান্তে হাত ধোবার সময় গেঁজুড়েদের নিত্তনৈমিত্তিক ঝগড়া-ঝাঁটি দেখতে অত্যস্ত। ঐ সব দেখেশুনে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি হয়। কখনও বা বিকৃত মুখভঙ্গি করে বলতে শোনা যায়—মরণ হয় না হাড়হাভাতে মিন্‌সেগুলোর।

আজও আহারান্তে এঁটো বাসন হাতে ও-বাড়ীর বৌটি পুকুর-ঘাটে এসে রোজকার মত এপারের গাঁজাতলাটা নজর করল। অবিলম্বে তার দৃষ্টি স্থির হল ঘুমন্ত হান্সকে লক্ষ্য করে।

—অত মনোযোগ দিয়ে কী দেখছিস্ ভাই বৌ?

—দেখ্ না ঠাকুরঝি, একটা সুন্দর গোরা গাছতলায় শুয়ে আছে। বেচারীর মুখখানা রোদ্দুরে পুড়ে যাচ্ছে।

—মরণ তোমার, গোরার দিকে চোখ পড়েছে। দাদার তাহলে আবার বরাত হল।

—তোর মুখে আগুন লো কড়ে রাঁড়ী, তুই কী সাধ পেয়েছিস্ পিরীতের যে বুঝবি সোয়ামী কী জিনিস!

যার উদ্দেশ্যে বৌটি কথাগুলি বললে সে মেয়েটির কানে বোধ হয় পৌঁছল না। তার আয়ত দৃষ্টি তখন সামনে নিবদ্ধ। বটতলায় ঘুমন্ত হান্সের দিকে।

—কী রে, গিলছিস্ যে ছুঁড়ি? গালে ঠোনা দিয়ে বললে বৌটি।

—যাঃ। কিন্তু ভাই বৌ, গোরাটার কী হয়েছে? মরে যায়নি তো! আতঙ্কিত স্বরে বললে মেয়েটি।

—না গো সখি। গোরাচাঁদ এখন দম দিয়ে পড়ে আছে। গেঁজুড়ে বোধ হয়।

—ছিঃ ছিঃ, কী ঘেন্না! অমন সুন্দর চেহারা আর এমন বেয়াড়া নেশা।

—অত আফশোষ করিস্‌নি লো, শেষে পিরীতে হাবুডুবু খাবি।

পিরীত কি হয় যায়, কাহার কথায়।
উভয় মন সংযোগ, নয়ন কারণ তায়॥
পিরীতের গুণাগুণ, করে যে জন জানে সেজন।
অন্য জন বৃথা কেন, তাহারে বুঝতে চায়॥

—থাক, পুকুরঘাটে রঙ্গরস করতে হবে না।

—ওলো ছুঁড়ি, ভেতরে ভেতরে জ্বলেপুড়ে মরছিস্। যেখানে যা পাস্ হাঁ করে শুনিস্ আর পড়িস্। কবির খবর শুনলে তো দামদম পা ফেলে ছুটিস্। আর এই ধনির একটু পুলক জেগেছে, অমনি ফোঁস।

—খুব ফুর্ত্তি যে! আজ দাদা আসবে কিনা তাই রসে ফেটে পড়ছিস্। মেয়েটি বলে। চোখ থাকে কিন্তু গাছতলায়।

—তা সখি যা বলেছিস্। কিন্তু তোমার যে

হেরিয়ে কমল কেন প্রকাশে কমল (প্রাণ)।
জানিতেম তপন হেরি, বিকশে কমল॥
তার সাক্ষী দেখ তব বদন কমল।
হেরিলে প্রফুল্ল মন হৃদয় কমল॥

—সত্যি ভাই ঠাকুরঝি, তোর মুখখানা ঠিক সকালের রোদ-লাগা পদ্মের মত। কি রূপ নিয়েই না জন্মেছিলি। অথচ এমন ভাগ্য করে এসেছিস্ যে কাউকে দেবার উপায় নেই অমন রূপের ডালা।

—কেন জ্বালাস্ ভাই।

—জ্বালাই কী সাধে লো। জ্বলি যে নিজে। আমারই সাধ হয় তোর অঙ্গে অঙ্গ রাখি।

সুধামুখী তোমার নয়ন অমিয় বরিষে
কটাক্ষে জীবন পায়, বিরহ বিষে
কেমন কুরঙ্গ আঁখি, কত রঙ্গ করে দেখি
কখন হানয়ে বাণ, কখন তোষে।

—সত্যি কী আমি রূপবতী?

—বলছি তো, তোমার কুরঙ্গ আঁখিতে একটু কটাক্ষ কর, দেখবে কত তৃষিত চাতক তোমার জন্যে হাঁ করে থাকবে। ঐ যে, গুণধর বোধ হয় তোমার রূপের ফাঁদে পা বাড়াল। চল চল সদু ঠাকুরঝি, গোরাটা গিলে ফেলবে তোকে। কেমন ড্যাব ড্যাবে চোখে হাঁ করে তাকিয়ে আছে।

হান্স ঘুম থেকে উঠেছে। সামনে নজর যেতেই বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে থাকে। চোখের পাতা পড়ে না।

—কী হ্যাংলার মত চেয়ে চেয়ে গিলছে রে। চলে আয় সদু ঠাকুরঝি। হাত ধরে টান দেয় বৌটি।

—হ্যাঁ হ্যাঁ চল্, ভাল দেখায় না—।

আরো একবার ওপারে দণ্ডায়মান হান্সের দিকে চাইল সৌদামিনী। চোখাচোখি হয়। তাকিয়ে থাকে।

—আঃ, কী করছিস্ সৌদামিনী। বৌটির স্বরে উষ্মা প্রকাশ পায়।

—কিছু তো করিনি সখি। ম্লান হাসে সৌদামিনী।

—আর রঙ্গে কাজ নেই। লোক হাসবে। বামুনের ঘরের বাল-বিধবার গোরার দিকে নজর। চ বলছি—।

—চল, কিন্তু বাসন মাজবে না ?

—না, চ।

—যথা আজ্ঞা। আস্তে আস্তে ঘাট থেকে উঠে আসে সৌদামিনী।

ওদিকে হান্স নিষ্পলক চেয়ে থাকল যতক্ষণ সৌদামিনীকে দেখা গেল। কী দীর্ঘ কেশ। ভারী নিতম্ব ছাড়িয়ে নেমে গেছে। কি রং! চাঁপাফুলকেও হার মানায়।

খিড়কির কাছে এসে আর একবার সৌদামিনী তার ভাসা-ভাসা চোখে ফিরে তাকাল। চোখ ফেরে না।

—বড় বেশী বাড়াবাড়ি করছিস্ সদু ঠাকুরঝি। গরীব গেরস্থের ঘরে আর কেলেঙ্কারী করিস্‌নে।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপল সৌদামিনী। তারপর মুখ ফিরিয়ে এগিয়ে গেল।

হান্স আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। যেতে মন সরে না। দেহে নেশার অবসাদ। চোখে সুন্দরীর নেশা। মনে এক অপরূপ আবেশ। আগে কখনও এমন অনুভব করেনি। নিজের জাতের মেয়েদের দেখেছে হান্স, কিন্তু এত রূপলাবণ্য, এত শুভ্রতা, এত উদ্দাম যৌবন দেখেনি। দীর্ঘ কেশ দূর থেকেও মন হরণ করে তার উপস্থিত অস্তিত্ব অন্ধকার করে দিয়ে গেল। এক মুহূর্তে তার যৌবনের সমস্ত চঞ্চলতা বর্ষণ-ভারাক্রান্ত শ্যাম-গম্ভীর আকাশের মত নিথর নিস্পন্দ হল।

বিষণ্ণ দ্বিপ্রহর। বটগাছের মাথায় কোকিল ডাকছে।

হান্স ধীরে ধীরে মাটি থেকে টুপিটা কুড়িয়ে নিল। এবার ক্লান্ত চরণে পথে নেমে পড়ে।

নগরে সন্ধ্যা এল। বন্দরতীর নিস্তব্ধ হয়ে এসেছে। নৌকোর মাঝিমাল্লারা আলো জ্বালে। গঙ্গার বুকে রান্নার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে দেশী সঙ্গীতের সুর ভাসে বাতাসে। তীরের মানুষেরা নিজেদের সাধ্যমত প্রমোদ ভূষণে ভূষিত হয়ে বাড়ী থেকে বেরোয়।

ঠাকুরবাড়ীতে সন্ধ্যারতির ঘণ্টা বাজে। মেয়েরা গা ধুয়ে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালে। তারপর পাকশালে আহার্য পাকের আয়োজনে তৎপর হয়। নানা জাতের সাহেব-মেম নিজের নিজের জুড়িগাড়ী করে প্রমোদ ভ্রমণের সঙ্গে প্রেমালাপের সুযোগ-তৎপর। সাহেবদের সঙ্গে ধনী দেশী বাবুরাও জুড়ি পালকি করে হাওয়া খেতে খেতে সুন্দরী সন্ধান করতে থাকেন। রেষারেষি, টেক্কা দেওয়ার কাজে মোসায়েবরা সদাই ব্যস্ত। বাবুদের একা একা হাওয়া খাওয়া তাই বরাতে জোটে না সাহেবদের মতন। তাঁরা কেউ কেউ আসেন গঙ্গার ধারে। তারপর মোসায়েব কি চাকরের সাহায্যে পানসি, বজরায় ওঠেন। সেখানে খেমটা-বাইনাচের সঙ্গে খেউড় শুনতে শুনতে পানাহার করেন। বাড়ী ফেরেন মধ্যরাত্রে কিংবা রাত্রিশেষে। বেহারা কি সহিসেরা কোলে করে অপেক্ষমান জুড়ি-পালকিতে তুলে দেয়। বাবুদের কারো বা গন্তব্যস্থল বাগানবাড়ী। সেখানে বিবি, বাই অথবা বিদেশী বেশ্যা নিয়ে আমোদ-আহ্লাদের সঙ্গে মদ্যপানের আসন্ন ক্ষণটির জন্যে জুড়িগাড়ীতে মোসায়েবদের নিয়ে তীরবেগে ছুটে চলেছেন। ভদ্র মধ্যবিত্ত নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যে কেউ চলেছে শুঁড়ির দোকানে, কেউ গুলিগাঁজার তুরংএর আড্ডায়, কেউ বা বেশ্যাবাড়ী, কেউ বা কবি-তরজা-খেমটার আসরে—ইতর-ভদ্র অনেকেই আট-দশ ক্রোশ দূরবর্তী অঞ্চল থেকে নিজেদের আহারাদি সঙ্গে নিয়ে কবিগান ও কবির লড়াই শুনতে আসে। এ এক বিচিত্র নেশা। নাওয়া-খাওয়া সব ভুলে গিয়ে গোঁড়া শ্রোতারা বিখ্যাত কবিদের গান শুনতে শুনতে নিজের নিজের ভাল-লাগা কবিদের পক্ষ নিয়ে লাঠালাঠি, কাটাকাটি, মারামারি করতে দ্বিধা করে না এ নগরে, শুধু এ নগরে কেন সারা বাংলাদেশে তখন কবিগানের আসর হবে শুনলে লোক নেচে উঠত। বাংলাদেশে তখন বার মাসে তের পার্বণ লেগে থাকত। এই পার্বণ উপলক্ষে ধনীদের গৃহে আমোদ-প্রমোদের মেলা বসে যেত। তার প্রধান অঙ্গ কবিগানের আসর। তাছাড়া বারোয়ারী ব্যবস্থায় নাচ-গানের আসর লেগেই থাকত।

মোট কথা, সন্ধ্যার পর চিত্ত-বিনোদনে সবাই তৎপর ছিল। কী ইতর কী ভদ্র সকলে। ফিরিঙ্গীদের ত কথাই নেই। অন্ধকার নামলেই আমোদ আর নেশায় ওরা সব ভুলে যায়।

সেদিন হান্স সান্ধ্য-উৎসবে সহজভাবে যোগ দিতে পারল না। বাড়ী গিয়ে উপযুক্ত পোষাকে সজ্জিত করেনি নিজেকে। দুপুরের সেই বটফল আর পাখিদের বিষ্ঠা মাখানো পোষাকেই জোসেফের ইন্-এ হাজির হল।

—কে ঐ সুন্দর যুবকটি। মহিলাদের মধ্যে গুঞ্জন ওঠে।

ইনের অভ্যন্তরে নাচঘরে রঙীন ঝাড়লণ্ঠনের বাতিগুলো ঝলমল করছে। বেহারাগুলো টানা-পাখা টানছে। সুরার গন্ধে চারদিক ভরে উঠেছে। বেলোয়ারী সুরাপাত্রে সুরা ঢালছে বেয়ারারা। পাত্রে বরফকুচিও পড়ে। চুঁচুড়ার বরফকুণ্ড থেকে রোজ দশ টাকা মণ দরে মণ তিনেক বরফ আসে এই ইন্-এ। তখন একমাত্র চুঁচুড়ায় বরফ তৈরী হত। ওখান থেকে চন্দননগর, কলকাতা এবং অন্যান্য জায়গায় চালান যেত ফিরিঙ্গীসাহেব ও ধনী দেশী-বাবুদের জন্যে। বরফ-দেওয়া মদ সে-দিনও বিলাসী সাহেবদের প্রিয় বস্তু ছিল।

হলের মধ্যে জোসেফ তদারকে ব্যস্ত।

—কে ঐ সুন্দর যুবকটি, বলতে পারেন মসিয়েঁ রে। একটি সুবেশা তরুণী জিজ্ঞেস করল।

—নিশ্চয়। ও হল হান্সম্যান এণ্টনী, বিরাট ধনী মিঃ কেল্টীর ভাই, ওর ঠাকুরদাদা যথেষ্ট ক্ষমতাবান পুরুষ ছিলেন। কলকাতার বিখ্যাত জমিদার সাবর্ণ চৌধুরীদের পক্ষ নিয়ে তিনি জব চার্ণকের সঙ্গে পাল্লা দিতেন। এণ্টনী নিজেও ভাল ব্যবসা করছে।

—আমার সঙ্গে একটু পরিচয় করিয়ে দেবেন? ক্ষীণ কণ্ঠে মেয়েটি বললে।

—ও, নিশ্চয়। রে উঠে গেল। তারপর এণ্টনীর সামনে এসে হেসে বললে—গুড ইভনিং। কবে ফিরলে? ভাল আছ?

-আজই। ভাল। খানিকটা চমকে উঠেই যেন বললে এণ্টনী

—তা এই আসছ বুঝি? পোষাক পর্যন্ত বদলাওনি।

প্রত্যুত্তরে কিছু বললে না এণ্টনী। ঘাড় নেড়ে হাসল একটু।

—এস, তোমার সঙ্গে আমাদের পুলিশ-কর্তার মেয়ে মাদমোয়াজেল এ্যানের পরিচয় করিয়ে দি। মেয়েটি সুগায়িকা এবং আদবকায়দা-দুরস্ত।

—ধন্যবাদ, চলুন।

ওরা এগিয়ে গেল গঙ্গার ধারে ব্যালকনির দিকে।

ব্যালকনি যাবার প্রাক্কালেই পথ রোধ করল জোসেফিন।

—হাল্ল, কোথায় ছিলে এতক্ষণ? দাদা বললে তুমি আসবে বাড়ীতে, এলে না তো। কিন্তু এ কী চেহারা হয়েছে? চুলে চিরুণী দাওনি, পোষাক বদলাওনি—ব্যাপার কী! এস, এখানে বসি একটু।

জোসেফিন হাত ধরল। এণ্টনী রে-র দিকে একবার চাইল। রে বললে—আসছি। তোমরা আলাপ কর।

রে চলে গেল ওদের সামনে থেকে।

—কই, কিছু বলছ না তো? জোসেফিন রাগের ভান করে মুখটাকে ভারী করে।

এণ্টনীর কিছুই ভাল লাগছে না। দুপুরের সেই গৌরাঙ্গী বারে বারে মনে এসে সমস্ত ভুলিয়ে দিচ্ছে। সব আদবকায়দা শ্লথ হয়ে যাচ্ছে। ভাল লাগে না। মদ খেয়েও ভাল লাগে না এখানকার পরিবেশ। বহুদিন না-দেখা জোসেফিনকে। তবু চেষ্টা করে হাসল, জিজ্ঞাসা করল—কেমন আছ জোসেফিন? তোমাকে আগের থেকে আরো সুন্দর দেখতে হয়েছে।

—তবু ভাল, এতক্ষণ বাদে আমাকে ভাল করে নজর করলে। কিন্তু তোমার ব্যাপার কী?

—ব্যাপার তেমন কিছু নয়। তবে এমন একটা ঘটনার মধ্যে গিয়ে পড়েছিলাম যে ভুলতে পারছি না কিছুতেই।

—কী এমন ঘটনা যা ভোলাতে পারছে না আমার উপস্থিতি? এই প্রমোদ-পরিবেশেও তুমি বিমর্ষ হয়ে বসে আছ, আশ্চর্য! ঘটনাটা বলবে?

জোসেফিনের মুখের দিকে চেয়ে বললে এন্টনী—শুনতে তোমার ভাল লাগবে না সেই ঘটনা। কালা নেটিভদের ঘটনা।

—ওঃ। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল জোসেফিন। কিন্তু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল এন্টনীর দিকে।

জোসেফিনের মধ্যে একটা আশঙ্কাও জেগে উঠল। নেটিভ মেয়েদের প্রতি তাদের সমাজের পুরুষগুলোর বড্ড ঝোঁক। চুঁচুড়ায় ওলন্দাজদের অনেক পুরুষ নেটিভ মেয়েদের নিয়ে আছে। এখানেও অনেক পর্তুগীজ, ফরাসী পুরুষ নেটিভদের পিছু পিছু ঘোরে। সুযোগ পেলে ঘরে আনে। কলকাতার ইংরেজ পুরুষদের অনেকেও তাই করে। নেটিভ মেয়েগুলোর মধ্যে কী আছে? কী যাদু দিয়ে ওরা পুরুষগুলোকে বশ করে নিজেদের কাছে রাখে? নেটিভ মেয়েরা যে-ভাবে সেবাযত্ন করে আমরা নাকি তার ধারে-কাছেও যেতে পারি না। তারা অত ঘ্যান ঘ্যান করে না, উজাড় করে ভোগ করতে দিতে জানে। হান্স কী তবে কোন নেটিভ মেয়ের পাল্লায় পড়ল!

জোসেফিন ভ্রূ-কুঞ্চিত করে জিজ্ঞেস করে—নেটিভ মেয়েদের পাল্লায় পড়নি তো?

এন্টনী কিছুক্ষণ চুপচাপ চেয়ে রইল। তারপর একটু হেসে বললে—ঠিক বলতে পারছি না।

—সন্দেহ হয়?

—হতে পারে, বিচিত্র কী। আবহাওয়ার প্রভাবে সব সম্ভব।

—তোমার কী ওদের ভাল লাগে?

—তা লাগে। বড্ড খোলামেলা ভাব ওদের। ছিটেফোঁটা যা বুঝি ওদের ভাষা ভালই লাগে। বিশেষ করে গান যা শুনেছি খুবই উচ্চ ভাবের। সুরও অদ্ভুত। ভাবছি একটু বেশি করে মিশব। ওদের ভাষা ভাব ভাল করে জানব।

—তা হলেই হয়েছে। সব ঘোচাবে দেখছি তুমি। ওসব পাগলামি কোর না হান্স। আমার অনুরোধ রাখ। চল একটু নাচি।

—ভাল লাগছে না।

হান্স, তুমি…তুমি কী রকম যেন বদলে গেছ। হতাশার সুর জোসেফিনের কণ্ঠে।

—হয়ত বা। ম্লান হাসল এণ্টনী।

—আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু ভেবেছ?

—তোমার ভবিষ্যৎ, কই ভাবিনি তো।

দুজনেই কিছুক্ষণ চুপচাপ। ওদিকে নাচের বাজনা বাজছে। নাচঘরে নাচ চলেছে।

হান্স নীরবতা ভেঙে বললে—জোসেফিন, সত্যিই যদি আমাকে নিয়ে তোমার ভবিষ্যৎ ভাববার কল্পনা থাকে তা ভেব না, কষ্ট পাবে। আমি কোথায় থাকি, কী করি কিছুই স্থির নেই।

—তোমার কাছ থেকে এতটা আশা করিনি হান্স। আচ্ছা, উঠছি আজ।

জোসেফিন উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে গেল সোজা নাচঘরের দিকে।

এণ্টনী একটা নিঃশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে বাকী মদটুকু নিঃশেষ করতে থাকে।

দিন যায়। এণ্টনী দিন দিন নিজেদের সমাজ থেকে সরে যাচ্ছে। সন্ধ্যের দিকে ইন্-এ গিয়ে হৈ-হুল্লোড় করতে যাচ্ছে না। হারু, নটবর ইত্যাদির সঙ্গে বিভিন্ন দাঁড়-কবিদের আসরে গিয়ে সারারাত ধরে গান শোনে। দিনে সামান্য একটু ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যে গঙ্গার ধারে গঞ্জের বাজারে যায়। তারপর ঘোড়া ছুটিয়ে সোজা পুকুর-পাড়ের বটতলায় গাঁজার আড্ডায়। গাঁজার নেশায় বেশ পোক্ত হয়ে উঠেছে হান্স। স্নানাহার ভুলে খরা দ্বিপ্রহরের শেষ পল পর্যন্ত বটতলায় পড়ে থাকে আর সবাই চলে গেলও। পুকুরের ওধারে গেরস্তবাড়ীর খিড়কির দিকে হাপিত্যেশ করে চেয়ে থাকে।

যতক্ষণ না চোখাচোখি হয় সৌদামিনীর সঙ্গে ততক্ষণ অপেক্ষা করে শুষ্ক বিরস মুখে। সৌদামিনী পুকুরঘাটে এলে এণ্টনীর মুখে হাসি ফেটে পড়ে। নয়ন ফেরে না—সৌদামিনী ঘাট থেকে চলে না যাওয়া পর্যন্ত। কোন ইশারা, কোন কথা এখনও হয়নি। শুধু তৃষিত নয়নের তৃষ্ণা মেটায়।

ওদিকে সৌদামিনীর চোখে আস্তে তৃষ্ণা জাগে। ভাজের কটূক্তি মেনে সংযতও হয়েছিল। কিন্তু দিনের পর দিন কাঠ-ফাটা রোদে প্রতীক্ষার খবর ভাজের কথার ঝাঁঝের সঙ্গে কানে আসে। দুপুরে আহারান্তে ভাজ ঘুমোলে সৌদামিনী ইদানীং ঘাটে আসে হাত ধোওয়ার অছিলায়। হাতের জল হাতেই শুকোয়। চোখ ফেরে না। তারপর এক সময় পাখিদের কাকলিতে চমকে ওঠে। মনে লোকভীতি জাগে। সজাগ হয়। ধড়মড়িয়ে ফেরে দ্বিপ্রহরান্তে। মনে বেদনা, শরীরে শিহরণ, চোখে নেশা আর চেতনায় কশাঘাত। নিস্তব্ধ আঙিনার সংলগ্ন দওয়ায় চুপচাপ বসে। একসময় সমস্ত বেদনা মন্থন করে সুর ধ্বনিত হয়ে ওঠে সৌদামিনীর কণ্ঠে ধীরে ধীরে।

ধিক ধিক ধিক তার জীবন যৌবন।
এমন প্রেমের সাধ করে যেই জন, সে চাহে না, আমি তার যোগাই মন ॥
যেখানেতে না রহিল মানীজনার মান, সে কেমন অজ্ঞান তারে সঁপে প্রাণ,
সেধে কেঁদে হয়ে গেছে কলঙ্কভাজন।

একি প্রণয়ের রীতি সই শুনেছ এমন, কেহ সুখে থাকে কেহ দুঃখে জ্বালাতন।
শয়নে স্বপনে মনে যে যারে ধেয়ায়, সেজন তাহার ফিরে নাহি চায়,
তথাপি না পারে তারে হতে বিস্মরণ ॥

সখি পিরীতি পরম ধন জগতের সার, সুজনে কুজনে হলে হয় ছারখার,
সামান্য খেদের কথা একি প্রাণ সই! কারেই বা কই, প্রাণে মরে রই,
ঘরে পরে আরো তাহে করয়ে লাঞ্ছনা।

যারে ভাবিব আপন সই তার এ বোধ নাই, এমন প্রেমের মুখে তারো মুখে ছাই,
হেন অরণ্যে রোদনে ফল আছে কি, এ হতে সুখী একা যে থাকি,
ধরে বেঁধে করা কিনা প্রেম উপার্জ্জন ॥

যার স্বভাব লম্পট সই তার কি এ বোধ, আছে কি করিবে তব প্রেম অনুরোধ,
অতি দৃঢ় উভয়েতে হওয়া এ কেমন, এজন-মিলন না দেখি কখন,
রঘু বলে কোথা মিলে ছুজনে সুজন ॥

সুরে বুকফাটা ক্রন্দন বাতাসে মেশে।

বটতলায় হান্সম্যান এণ্টনীর কানে আলতো বাজে সৌদামিনীর কণ্ঠের করুণ সুর—চোখ বুজে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে শোনে—ভাল লাগে; সহানুভূতি জানাবার ইচ্ছাও প্রবল হয়ে ওঠে।

ওদিকে সৌদামিনীর ভাজের ঘুম ভাঙ্গে গানের সুরে। বিরক্তি নিয়ে তিরস্কার করে ওঠে—অত গলা বাজিয়ে কাকে গান শোনাচ্ছিস্ হতভাগী! লজ্জাসরম বলে আর কিছু রাখলিনে। না, এবার তোর দাদা আসুক, বলবো সব।

—তোমাদের ভাত খাই বলে কি নিজের ইচ্ছেয় একটি পদও গাইতে পারবো না!

—না, পারবে না। লম্পট একটি ফিরিঙ্গীর সঙ্গে ফোষ্টিনষ্টি করার জায়গা এটি নয়!

—কি যা তা বলছো বৌ, ফোষ্টিনষ্টি কখন করলাম! বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না কি?

—বাড়াবাড়ি আমি করছি, না তুমি করছো সহু ঠাকুরঝি? বলি, এদিকে যে পাড়ার লোক পাঁচ কথা পাঁচকানে ঢালাঢালি সুরু করেছে! এরপর কি আমাদের মুখে চূণকালি দেবে? ছাপোষা ভাইয়ের কু না দেখলে কি তোমার মুখে হাসি ফুটবে না!

সৌদামিনী উত্তর দেয় না। বিরলে অশ্রু বিসর্জ্জন করে।

একি জ্বালায় জ্বালাতন করলে কালা
সহে না সহে না কলঙ্কের মালা—

মনের ভেতরটা হু হু করে ওঠে। মনকে ধিৎকার দেয়। সঙ্কল্প করে আর ঘাটে যাবে না।

কিন্তু মন মানে না। সুযোগ পেলেই পুকুরঘাটে ছোটে সৌদামিনী। দুরু দুরু বক্ষে অকারণ নাচন লাগে। মন জোর

করে বলে, যে যা বলে বলুক, যা হবে হোক, নয়ন আঁধার যেন না হয়।

দিন যায়। কলহ বাড়তেই থাকে। ভাজ কারণে অকারণে অশ্রাব্য কু-কথায় গাল পাড়ে। শান্তি যায় গৃহস্থবাড়ীর।

আর ওদিকে গাঁজার আড্ডাটি জমে উঠছে দিনদিন। নতুন নতুন ভদ্রাভদ্র বন্ধু জুটছে এণ্টনীর। কলকাতা থেকেও বিত্তবান ভদ্র গাঁজিয়াল বিষয়কর্মে এসে এই আড্ডা আবিষ্কার করছে। গাঁজার মাহাত্ম্য ব্যাখ্যানে প্রিয়পাত্র এখন সে এণ্টনীর।

বিনয়ের অবতার হয়ে ভবতারণ চাটুজ্জে কলকাতার গাঁজার আড্ডার গল্প ফাঁদে।

—বুঝলে সাহেব, কলকাতায় এখন রঙে রৈ রৈ! বেশ আছি সেখানে বাবু শিবচন্দ্রের দৌলতে।

—শিবচন্দ্র কে বাবু ভবতারণ, এণ্টনী আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞাসা করে।

—তিনি আমাদের পক্ষির দলের সৃষ্টিকর্তা, রাজা নবকৃষ্ণের বন্ধু-লোক।

—তাই নাকি বাবু! এই বলে এণ্টনী বিস্ময় চোখে চেয়ে থাকল ভবতারণের দিকে। তারপর বললে, পক্ষির দলটি কি বস্তু তাহার বিষয় বলিবে বাবু ভবতারণ ?

—নিশ্চয় বলিব সাহেব, আমাদের পক্ষির দলটিতে পক্ষি হিসাবে গণ্য হইতে চাহিলেই গণ্য হয় না সাহেব। পক্ষিকর্তা মানে বিচারকের সামনে পরীক্ষা দিতে হয়।

—পরীক্ষা কি কি রকম কওনা গো ভবতারণবাবু, আর একটি সহচর জিজ্ঞাসা করে।

পরীক্ষা কি জান হারু, সে এক বিষম ব্যাপার! কেউ ভুক্ত হতে এলেই বিচারক প্রশ্ন করবেন, কত ছিলিম! ভুক্তন অভিলাষী যদি বলে, একশো ছিলিম একাসনে। বিচারক আদেশ দিবেন, আরম্ভ হউক।

ভুক্তন অভিলাষী একটির পর একটি ছিলিম নীরবে, না কেশে, নিরানব্বোইটি ছিলিম টেনে যেই একশো ছিলিমে একটুখানি খুক করে কাশলো ওমনি বিচারক তাকে গুরুদণ্ড দিয়ে দলভুক্ত করে নাম দিলেন ছাতারে।

—গুরুদণ্ডটি কি বাবু?

—ঐ তো সাহেব, ছাতারে পক্ষির নাম পাওয়াটিইতো গুরুদণ্ড। ছাতারে নিম্ন শ্রেণীর পক্ষি। সুতরাং ভুক্ত-অভিপ্রায়ী তখন রোদন করে বিচারককে বললে, ধর্মাবতার পক্ষিরাজ, আমার এই লঘুদোষে গুরুদণ্ড দিয়ে এত অপমান করবেন না। বিনয়ে খগেশ্বর একটু তুষ্ট হলেন, বললেন, হাকিমের হুকুম ফেরে না, তবে তোর স্তবে আমি তুষ্ট। কিন্তু ছাতারে নাম ফেরৎ হবে না। যা, তোর নাম স্বর্ণছাতারেই রাখলাম।—বুঝলে সাহেব, এইভাবে আমাদের পক্ষির দলে ভুক্ত হতে হয়।

—বাঃ, ভারী সুন্দর নিয়মটি কিন্তু বাবু।

ভবতারণ তারিফে হেসে বলে, আমাদের পক্ষির বুলিও আছে সাহেব।

—শুনাও শুনাও বাবু।

—শোন তা হলে,

ভিষিণ কিটি কিটি, কিস্ কিসিন
চুকু মুকু বুক্ চুক চুকুন।
কিকি কিচি কিচি, কিচিন কিন্।
কুকু রাম শালিখে, কুকু গঙ্গা বিসং
ছোট বিলের পাখি মোরা, বড় বিলের কে?
উড়তে না পেরে পাখি, পোষ মেনেছে॥
কুকু গাং শালিখে, কুকু গঙ্গা বিসং।—

বুঝলে সাহেব, আমাদের এই রকম বুলিতে কথাবার্তা চলতো। হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম, আমাদের পক্ষিদলের সৃষ্টিকর্তা সাহেব একটি লোকের মত লোক।

—কি রকম?

সব রকমেই তিনি বিশেষ। কি দানে, কি প্রাণে। লোকের, বিশেষ করে বাগবাজারের লোকের উপকার করতে তিনি মুক্তহস্ত। অভাব জানালে তিনি মেটাবেনই। তবে কি জানো, তেনার বাবা মহাশয় একটু কোনজুস্। তবে হ্যাঁ, বুকের পাটাও তেনার, এই বলে বাবু ভবতারণ চুপ করে কল্কের জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়।

হারু তাড়াতাড়ি কল্কেটি এগিয়ে ধরে।

—বুকের পাটার ব্যাপারটি কি কও না গো, নটবর হাতের খোড়কের কাটিটা দাঁতে গুঁজে বলে ওঠে।

—হচ্ছে হচ্ছে, দাঁড়াও না হে, এই বলে ভবতারণ কল্কেতে মৌজে টান দেয়। তারপর কিছুক্ষণ ঝিম মেরে বসে হঠাৎ ঘাড় দুলিয়ে বললে, তা হলে একটু খুলেই বলি আমাদের খগেশ্বর শিবচন্দ্র মুখুজ্জে আর তেনার বাবামহাশয়ের ব্যাপারটি, কি বল সাহেব!

—বলিবে, ভাল করিয়াই বলিবে, নটোবর গাঁজা ঠিক করিয়া আমাকে দাও। বাবু তুমি বল।

—বুঝলে সাহেব, আমাদের শিবচন্দ্র মুখুজ্জের বাবামহাশয় বাবু দুর্গাচরণ বড় বড় জমিদারের দেনার ব্যবস্থায় বন্ধক-বন্দী করে দিয়ে প্রচুর অর্থ-সম্পত্তি অর্জন করেছেন। শিবচন্দ্রের অর্থের ভাবনা নেই। বিবাহও করেছেন পরমা রূপবতীকে। বাবু দুর্গাচরণ বৌমার রূপের ব্যাখ্যানে পঞ্চমুখ। কিন্তু শিবচন্দ্রবাবু একটু মানে, মানে বারদোষ। বুঝলে সাহেব, বারদোষ ছিল।

—বারদোষটি কি বাবু?

—বারদোষ মানে সাহেব একটি স্ত্রীলোক নিয়ে ফূর্তি করা। বুঝলে?

—হ্যাঁ বুঝিয়াছি, তুমি বল।

—কি বলছিলাম, ও হাঁ, শিবচন্দ্রের একটু বারদোষ ছিল। বাবু দুর্গাচরণ সেই সংবাদ পেয়ে মনে বড় দুঃখ পেলেন। চিন্তা করতে থাকলেন, কি করে ছেলেকে ঘরের সুন্দরী বৌয়ের দিকে মন করানো যায়। কাজকর্ম দিয়ে আটকালেও গভীর রাত্রে ঠিক বাড়ী ছেড়ে ছেলে

তাঁর চলে যায় উপপত্নীর বাড়ী। অথচ মুখে কিছু বলা চলে না। একে বাবা তার ওপর সমাজে চল ধনী লোকের উপপত্নী রাখা। অথচ ইচ্ছে নয় বাবু দুর্গাচরণের ছেলে ঘরের অমন রূপসী বৌ ছেড়ে উপপত্নীর কাছে রাত্রি বাস করবেন। মনে মনে সঙ্কল্প করলেন, যেমন করেই হোক ছেলেকে ঘর-মুখো করাতেই হবে। ছেলে বাইরের মেয়েমানুষের কাছে পড়ে থাকবে এ তেনার কিছুতেই মনঃপূত হয় না।

—তা কি করলেন বাবু দুর্গাচরণ?

—তুই থাম না হরু, বলতে দে না বাবু ভবতারণকে—নটবর আগ্রহ নিয়ে চেয়ে থাকে ভবতারণের দিকে।

ভবতারণ বলতে থাকে : নানান্ জিনিষ করেও যখন কিছু করতে পারলেন না, তখন একদিন রেগে স্থির করলেন আজ কিছুতেই যেতে দেবেন না।

রাত হলে, খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকলে, ছেলের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে থাকলেন বাবু দুর্গাচরণ। ইচ্ছেটা তাঁর, ঘুম পেলে ছেলে আজ নিশ্চয় বৌয়ের কাছে শুতে যাবে।

শিবচন্দ্রের ভাল লাগে না। কিছুক্ষণ গেলে হাই তুলে বলে, বড্ড ঘুম পেয়েছে শুতে যাই, কাল শুনবো।

দুর্গাচরণ ছেলের চোখমুখ দেখে বুঝলেন সব। তবু বললেন, যাও, আমিও সদর বন্ধ করে উপরে যাই।

শিবচন্দ্র চলে গেলে দুর্গাচরণ নিজে গিয়ে সদর বন্ধ করে বারান্দায় পাইচারি করতে করতে স্থির করলেন, আজ তিনি ছেলের ঘরের দোরে বারান্দায় নিদ্রা দেবেন। উদ্দেশ্য, বাবা মহাশয়কে পা দিয়ে ডিঙিয়ে তো আর ছেলে যেতে পারবে না, সুতরাং ওটিই হবে বাধা।

বিছানা করে শুলেন বটেক বাবু দুর্গাচরণ। কিন্তু নিদ্রা যেতে মন সরলো না, জেগেই রইলেন। তারপর এক সময় খুট করে শব্দ উঠতেই বাবু দুর্গাচরণ চোখ বুজে নিদ্রার ভান করলেন।

শিবচন্দ্র বাবা মহাশয়কে ঐ ভাবে দোরের সামনে শুয়ে থাকতে দেখে প্রথমটা ইতস্তত করে কিছুক্ষণ দাঁড়ালেন, তারপর ঘুমন্ত বাবা

মহাশয়কে সন্তর্পণে ডিঙিয়ে সদর দরজার চাবিটি বালিশের তলা থেকে নিয়ে সোজা সদর দরজার দিকে রওনা দিলেন।

এদিকে দুর্গাচরণ পা টিপে টিপে পুত্রের পিছু নিলেন—দেখবেন, কোথায় যায় ছেলে তাঁর, কেমন সে সুন্দরী; যার জন্যে ছেলেটা রাতদুপুরে তার কাছে ছুটলো।

—তারপর কি, তারপর কি বাবু ভবতারণ, উৎসুক কণ্ঠে হারু জিজ্ঞাসা করে।

ভবতারণ মুরুব্বিয়ানার হাসি হেসে বললে, বাবা মহাশয়ের চক্ষুতো একেবারে ছানাবড়া।

—মানে?

—মানেটা হচ্ছে হারুবাবু, অমন সুন্দরী যে থাকতে পারে, বাবু দুর্গাচরণ স্বপ্নেও ভাবেননি। তাই ছেলের এই উপপত্নী রাখার ব্যাপারে আর তাঁর কোন ক্ষোভ রইল না। ছেলেকে তারিফ করে বললেন, বেশ করেছ বাবা শিবচন্দ্র, এমন সুন্দরীকে কিন্তু বাড়ীর বাইরে রেখো না, ঘরে নিয়ে চল।

শিবচন্দ্র বাবার প্রস্তাবে অবাক। সেই সুন্দরীও হকচকিয়ে গেল। বাবু দুর্গাচরণ কিন্তু ছাড়লেন না তাঁর জিদ। ছেলেকে ডেকে বললেন, অমন সুন্দরীকে বাইরে আমি নষ্ট হতে দেবো না। আজই বাড়ী নিয়ে যাবো। তারপর সুন্দরীকে বললেন, চল মা লক্ষ্মী আমার ঘরে গিয়ে ঘর আলো করবে চল। মেয়েটি অবাকই থাকে। বলবে কি, এ তো তার সৌভাগ্য।

বাবু দুর্গাচরণ বেশ খুশী হয়েই শিবচন্দ্রের উপপত্নীকে নিজের গৃহে নিয়ে গেলেন সেই রাতে। সমাজ তো হতবাক্। হ্যাঁ, সাহস করলেন বটেক বাবু দুর্গাচরণ। তা সাহেব বুঝতেই পারছো ঐ শিবচন্দ্র মুখুজ্জেই বাগবাজারের পক্ষিদলের সৃষ্টিকর্তা আর এই অধম ঐ খগেশ্বরের অধীনে এক পক্ষিপ্রজা!

—বুঝলাম বাপু, তোমরা কলকাতা-ভারী দল করেছো, কিন্তু

আমাদের দলের মত কি তোমাদের সাহেব ওস্তাদ আছে? হারু টক্কর দিয়ে বলে ওঠে।

—তা নেই বটে, তবে আমরা ইংরেজি কায়দায় ঐ মদ আর মাংস খাবার বিরুদ্ধে রীতিমত ছড়া বেঁধে গেয়ে বেড়াই।

—একটি শুনাইবে বাবু, এণ্টনী বলে ওঠে।

—শোনাতে বলছো……হেঁ হেঁ……দেখি দেখি একটান, হাতটি এগিয়ে দেয় ভবতারণ নটবরের দিকে।

নটবর টান-শেষে কল্কেটা দিয়ে বললে, লাগাও দেখি বাবু গাঁজার মাহাত্ম্যখানা!

ভবতারণ মৌজ করে গলাখাঁকড়ি দিয়ে সুর ধরলে:

দেবের দুর্ল্লভ দুগ্ধ ছানা,
তা না হলে গুলি রোচে না,
কচু ঘেচুর কর্ম্ম নয়রে যাদু।
শুঁড়ির দোকানে গিয়া
ট্যাক টাক ফেলে দিয়া,
ঢুক করে মেরে দিলে শুধু॥

—বাহবা বাবু ভবতারণ, বাহবা! এই না হলে কি নেশা! আরে ছো। ওর ওই ঢুক করে মেরে দিলে শুধু, ঐ পর্যন্তই। নেশার রাজা গাঁজা। গাঁজার সাজই বা কত! হেঁ হেঁ বাবা। হারু মাথা দুলিয়ে বলে ওঠে।

—কি সাহেব, শুনলে তো, না মন পড়ে রয়েছে সুন্দরীর দিকে! ঘন ঘন তাকালে কি হবে! বামুনবাড়ী বড্ড কড়া, শেকল পরিয়ে রেখেছে হয়ত সোনার পাখিটিকে! একে বামুনের ঘরের বাল্য-বিধবা তায় আবার তোমার দৃষ্টি। ভবতারণ কাঁচা-পাকা বাবরী নাচিয়ে হেসে বললে।

—আমি কি খুব খারাপ আছি, আমি কি ভয়ের কারণ আছি, বলিতে পার বাবু।

ভবতারণ কিছু বলার আগেই গিরিজা চক্রবর্তী জিব কেটে বললে, বালাই ষাট! কে বললে, কে বললে আপনি খারাপ আছেন,

ভয়ের কারণ আছেন! আপনি অতি সদাশয় মহৎ লোক। আমাদের এই সুন্দর আড্ডার ধারক, ওস্তাদ।

—কিন্তু বাবু গিরিজা, তোমাদের স্ত্রীলোক আমাকে দেখিলে ভয় পায় কেন?

—তোমরা যে আমাদের স্ত্রীলোকদের ধরে নিয়ে যাও, সেই ভয়ে তোমাদের দেখলেই তারা পলায়ন করে।

—আচ্ছা বাবু, যদি স্বেচ্ছায় তোমাদের স্ত্রীলোক আমাদের সঙ্গে থাকিতে চায় তাহা হইলে কি আর বলিবার আছে?

—না সাহেব, স্বেচ্ছায় গেলে কি আর বলবো। আর আজকাল তো দেখছি আমাদের স্ত্রীলোকরা তোমাদের সঙ্গে দিব্যি হেসে খেলে ঘর করছে। তোমরা ভাল খেতে পরতে দাও সেইজন্য তারা সুখেই থাকে।

এণ্টনী কিছুক্ষণ চুপ করে উদাস দৃষ্টিতে পুকুরের ওপারের খিড়কীর দিকে চেয়ে থাকল। তারপর একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, উহাদের গৃহে একটি সুন্দরী স্ত্রীলোক আছে বাবু, উহাকে না দেখিলে থাকিতে পারি না। কেন বলিতে পার গোরাচাঁদ?

—তুমি প্রেমে পড়েছ সাহেব।

—প্রেম কাহাকে বলে?

এবার সবাই মুখ চাওয়াচায়ি করে। প্রেমের কি ব্যাখ্যা দেবে ভেবে পায় না।

বাবু ভবানীচরণ বেশ একটু ভেবেচিন্তে বললে, প্রেম হচ্ছে কি যেন, ইংরেজরা যাকে লভ্ বলে, তার থেকেও উচ্চ ধরণের। কি জানো সাহেব, প্রেমিক না হলে প্রেম কি বস্তু বুঝিবার উপায় নাই।

—ঠিক বলেছো বটেক বাবু। হারু মাতব্বরের মতন ঘাড় নেড়ে আবার বললে, কৃষ্ণপ্রেম কি বস্তু রাধারাণীই বুঝেছিলেন। কুল-শীল-মান সব খুইয়ে কৃষ্ণপদ ভজনা করা একি চাট্টিখানি কথা না কি ওস্তাদ! সেদিন বিরহ তো শুনলে দাঁড়-কবির আসরে, বুঝতে পারনি?

এণ্টনী উদাস দৃষ্টিতে চেয়েই ছিল ওপারের খিড়কির দিকে, ভাঙা স্বরে বললে, কিছু বুঝিয়াছি।

—আহা, প্রভু নিতাই কি গাহনাই না করলে। ভবানী তো কুপোকাত! গা নারে নটবর, প্রভুর সেই 'বঁধুর বাঁশি বাজে বুঝি বিপিনে', হারু গদগদ স্বরে বলে ওঠে।

সই কেন অঙ্গ অবশ হইল, সুধা বরষিল শ্রবণে—এণ্টনী সুমধুর কণ্ঠে হঠাৎই গেয়ে উঠল।

—বাহবা ওস্তাদ, তুমি যে অবাক করে দিলে! ঠিক যেন দাঁড়া-কবি। আর কণ্ঠে যেন সুধা ঝরছে! হারু উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠল।

নটবর সুর ধরলে :

বৃক্ষডালে বসি পক্ষী অগণিত, জড়বৎ কোন কারণে,
যমুনারি জলে বহিছে তরঙ্গ, তরু হেলে বিনা পবনে॥

বঁধুর (শ্যামের) বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে—এণ্টনী ধুয়া তোলে। নটবর সাবলীল ভঙ্গিতে গেয়ে চলে :

একি একি সখি, একিগো নিরখি, দেখ দেখি সব গোধনে।
তুলিয়ে বদন, নাহি খায় তৃণ, আছে যেন হীন চেতনে।
বঁধু (শ্যামের) বাঁশী বাজে বুঝি বিপিনে॥

—বাহবা নটবর, উচ্ছ্বসিত স্বরে তারিফ করে এণ্টনী।

এণ্টনীর কাছ থেকে তারিফ পেয়ে নটবর দাঁড়িয়ে ওঠে। তারপর নেচে নেচে হাত ঘুরিয়ে গান ধরে :

হায় কিসের লাগিয়ে, বিদরিয়ে হিয়ে, উঠি চমকিয়ে সঘনে।
অকস্মাৎ একি, প্রেম উপজিল, সলিল বহিছে নয়নে॥

—একি ওস্তাদ! তোমার চোখ যে জলে ভরে উঠল—বিস্ময়ে চেয়ে রইল নিতাই।

এণ্টনী কিছু বল্লে না। গানের সুরের সঙ্গে ওর মাথা দোলে। তারপর নটবরের গলার সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইতে থাকে :

আর একদিন, শ্যামের ঐ বাঁশী বেজেছিল কুঞ্জবনে,
কুল লাজ ভয়, হরিল তাহাতে, মরিতেছে গুরু-গঞ্জনে।
বঁধু (শ্যামের) বাঁশি বাছে বুঝি বিপিনে॥

এ-পারে গানের মাতামাতিতে ও-পারের খিড়কী দরজা খুলে গিয়েছিল—সৌদামিনীর ভাজ হাত ধোওয়ার অছিলায় ঘাটে এসে ফিরিঙ্গীর মুখে বাংলা গান শুনে অবাক হয়ে দাঁড়িয়েই থাকে। সৌদামিনীও অপমান আর কটুকথার জ্বালা উপেক্ষা করে ঘাটে এসে বিস্ময়বিহ্বল নেত্রে এণ্টনীকে লক্ষ্য করে। চোখাচোখিও হয়। পুলক শিহরণ জাগে সারা দেহে মনে। নয়ন ফেরে না।

এণ্টনীও নিজেকে হারায়। সৌদামিনী স্তব্ধ চোখে কাঁপতে থাকে।

—আহা, কি রূপ! ভবতারণের চোখে পড়ে। সৌদামিনীর রূপের প্রশংসা মুখ থেকে আলতো বেরিয়ে আসে। তারপর এণ্টনীর দিকে নজর যেতেই হারুকে ফিস্ ফিস্ স্বরে বললে, এণ্টনী ফিরিঙ্গী ত দেখছি প্রেমে গদগদ!

হারু ঘাড় নাড়ে। মুখে কিছু বলে না, এসব প্রেমরঙ্গ পছন্দ হয় না ওর।

ও-পারের মেয়েলী তিরস্কার ভেসে আসে—হতচ্ছাড়ী, মুড়ো খেংরা দিয়ে না ঝাঁটালে কালামুখীর চৈতন্য হবে না! আরো অশ্রাব্য কথা শোনার আগেই লাজারক্ত সৌদামিনী দ্রুত পুকুরপাড় ত্যাগ করে।

এণ্টনী দেখে শুনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কল্কের জন্য হাত বাড়ায়।

—এই যো ওস্তাদ ধরো, নটবর কল্কে এগিয়ে দেয়।

এণ্টনী দমভোর টান দিয়ে নেশায় বুঁদ হতে চায়।

হারু প্রসঙ্গ পাল্টায়, এণ্টনীর হাবভাব লক্ষ্য করে, ও ভবতারণের দিকে চেয়ে বলে, আপনাদের কলিকাতার দাঁড়া-কবির কথা শোনাও না গো!

ভবতারণ একটু যেন খুসীই হল। জাঁকিয়ে বসে বার কয়েক গলাখাঁকড়ি দিয়ে বললে, বলি তা হলে শোন হারু। আমাদের ওখানে রাজা নবকৃষ্ণই দাঁড়া-কবির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। আর দাঁড়া-কবির রাজা বলতেও পারো তুমি হরু ঠাকুর, মানে হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গীকে। হরু ঠাকুরের প্রবল প্রতাপ কলকাতার দাঁড়া-কবি মহলে। রাজা নবকৃষ্ণের সভায় তাঁর যথেষ্ট প্রতিপত্তি। কঠিন কঠিন সমস্যা

পূরণের ওস্তাদ আমাদের হরু ঠাকুর। পণ্ডিতে যা পারে না, হরু ঠাকুর আনায়াসে তা করে ফেলেন। একবারের একটি ঘটনা বলি তা' হলেই তাঁর এলেম বুঝতে পারবে।

—হরু ঠাকুরের নাম শুনেছি, গানও শুনেছি বুড়ো কর্তা। আমাদের ব্যাপারটি শোনাও ভনিতা না করে। ফরেশডাঙ্গায় থাকি বলে মনে করো না কিছু জানিনে, কিছু শুনিনে। নিতাই তার বাঁকা চোয়াল আরো বেঁকিয়ে বলে উঠে।

—থাম না নিতে, শুনতে দে না। কেউ কিছু ফাঁদলেই তোর ফোড়ন কাটা স্বভাবে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। চুপ কর। বলগো বাবু ভবতারণ, নটবর বললে মুখ থেকে কল্কেটা নামিয়ে।

ভবতারণ আশ্বাস পেয়ে বলতে থাকেঃ যা বলছিলাম, হরু ঠাকুরের এলেম যে কি ধরণের তা রাজা নবকৃষ্ণও সময় সময় দিশে করতে পারতেন না। একবার রাজার সভায় প্রচুর পণ্ডিতের সমাবেশ। নবকৃষ্ণের মেজাজ সরিফ। কিন্তু মনে একটি সমস্যা। গত রাত্রে অনেক চেষ্টা করেও সেই সমস্যা পূরণ করতে পারেননি। তাই সকালে সভায় এসেই পণ্ডিতমণ্ডলীর কাছে নিবেদন করলেন—পণ্ডিতপ্রবরগণ আপনাদের নিকট আমার একটি সমস্যা নিবেদন করছি। যদি নিজ-গুণে সমাধান করে দেন তা হলে আমি শান্তিপূর্ণ মনে আপনাদের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হই।

পণ্ডিতগণ সমস্বরে বললেন, সমস্যাটি নিবেদন করুন, আমরা যারপরনাই চেষ্টা করিবার অভিলাষী।

মহারাজ বললেন, সমস্যাটি হল: বঁড়শী গিলিছে যেন চাঁদে।

—যথা আজ্ঞা, এই বলে পণ্ডিতগণ মনোনিবেশ করলেন সমস্যা পূরণের দিকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা যায়। বেলা বাড়ে। কিন্তু কেউই যথাযথ উত্তর দিতে পারলেন না।

মহারাজের ধৈর্য্য থাকে না। পাইককে ডাক দিয়ে হরু ঠাকুরকে এত্তালা পাঠালেনঃ যে অবস্থায় থাকুক যেন সেইভাবেই আসে। দেরী না হয়।

হরু ঠাকুর তখন তেল মেখে গামছা কাঁধে ফেলে গঙ্গাস্নানে যাচ্ছিলেন। পাইক যেতেই ঐ অবস্থায় রাজসভায় এসে নবকৃষ্ণকে করজোড়ে বললেন, মহারাজ অদেশ করুন, অধম হাজির।

রাজা নবকৃষ্ণ বললেন, একটি সমস্যাপূরণে পণ্ডিতমণ্ডলী গলদঘর্ম, তুমি কি আমার উক্ত সমস্যাটি পূরণ করতে পারবে?

হরু ঠাকুর বিনয় করে নিবেদন করলেন, অধমের ক্ষুদ্র বুদ্ধি। তবু চেষ্টা করিবার মানস করিতেছি, আপনি আজ্ঞা করুন।

রাজা বললেন, বঁড়শী গিলিছে যেন চাঁদে—এই পদটি পূরণ কর।

—যথা আজ্ঞা, হরু ঠাকুর বসে গেলেন সভায়।

পণ্ডিতরা মুখ চাওয়াচায়ি করতে থাকেন। কেউ কেউ মন্তব্যও করেন, আমরা গেলাম হিমসিম খেয়ে আর ঐ দাঁড়া-কবি করবে সমস্যাপূরণ—এ যে দেখছি দাঁড়কাকের ময়ূরপুচ্ছ পরিধান!

এদিকে হরু ঠাকুর কিন্তু বেশী সময় বসে থাকলেন না। কিছুক্ষণ পরই উঠে দাঁড়াতেই সভাস্থ সকলে বিস্মিত নেত্রে চেয়ে থাকল ওনার দিকে।

হরু ঠাকুর উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, মহারাজ সমস্যাটির পূরণ শুনাইবার অনুমতি পাইলে এই অধম শুনাইতে প্রস্তুত।

নবকৃষ্ণ আশ্চর্য হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন হরু ঠাকুরের দিকে। তারপর খুশী হয়ে স্মিতহাস্যে বললেন, অনুমতি করছি, শুনাও।

হরু ঠাকুর কৃতজ্ঞহাসি হেসে উচ্চকণ্ঠে সমস্যাটির পূরণ করলেন:

একদিন শ্রীহরি মৃত্তিকা ভোজন করি, ধুলায় পড়িয়া বড় কাঁদে।
রাণী অঙ্গুলি হেলায় ধীরে, মৃত্তিকা বাহির করে, বঁড়শী গিলিছে যেন চাঁদে॥

সভার পণ্ডিতরা স্তব্ধ। রাজা নবকৃষ্ণ উল্লসিত হয়ে উঠলেন। সাধু সাধু রবে তারিফ করলেন হরু ঠাকুরকে। তারপর এক হাজার মুদ্রা হরু ঠাকুরকে বকশিস্ দিলেন।

হরু ঠাকুর মুদ্রাগুলি গামছায় বেঁধে রাজা নবকৃষ্ণের জয়ধ্বনি করে সভা ত্যাগ করলেন। পণ্ডিতরা থ হয়ে তেমনি বসে থাকলেন।

এই হরু ঠাকুর প্রেম সম্বন্ধে এমন একটি সুন্দর ভাব দিয়েছেন যা

শুনলে সাহেব তোমার প্রেমের ধারণা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। শুনবে নাকি সাহেব ? এই বলে ভবতারণ চুপ করে।

—নিশ্চয় শুনিব, এণ্টনী আগ্রহ নিয়ে বলে ওঠে।

ভবতারণ ইতিমধ্যে একটান টেনে নেয়। টানশেষে কিছুক্ষণ নীরবে চোখ বুজে বসে থাকল। তারপর সুর করে গেয়ে উঠল :

নাম প্রেম তার, সাকার নহে, বস্তুটি নিরাকার
জীবন যৌবন ধন কিবা মন প্রাণ—বশীভূত তার
সুখের লোক বলয়ে পিরীতি সুখের সার ;
প্রাণের বাহির হয় সে যখন জীবনে যেন মরে রই।

—আহা, কি মনোহর! বাবু ভবতারণ তোমাকে ধন্যবাদ। আমি বুঝিয়াছি প্রেম কি বস্তু। আমি হৃদয়ে অনুভব করিয়াছি। আহা, কবিদিগের ভাবের তুলনা নাই! সকল লোকের মনের কথা কবিরাই শুনাইতে পারে।

নটবর এবার মেজাজ দিয়ে বলে উঠে, তুমি ত খাসা গাইছো ওস্তাদ! তা মাঝে মাঝে না গিয়ে এখন থেকে রোজই চল না আমাদের দলের আস্তানায়। আসর হলে আসরে। গান শুনবে আর ধূয়ো মেলতায় গলা দেবে। আর মহলায় আমাদের সঙ্গে নতুন গানের মহড়া, চিতেন, পরচিতেন, খাদ—এই সব শিখবে। তারপর ভবানী-বিষয়ক, বিরহ, সখী-সংবাদ, মাথুর গানে পাকাপোক্ত হয়ে নিজের দল বানাবে। তুমি পারবে ওস্তাদ। দাঁড়া-কবি হবার ক্ষমতা তোমার আছে, এ আমি হলপ করে বলতে পারি।

—যাইব নটবর, তোমাদের দলেই নিয়মিত যাইব। গান শিক্ষা আমাকে করিতে হইবে। এখন এই মোহরটি নিয়া গিয়া কিছু দুগ্ধ-মিষ্টান্ন লইয়া আইস।

—যা যা নোটে, ওরে ওঠ না। ওস্তাদের কাছ থেকে মোহরটা নিয়ে দুধমিষ্টি তো আনবি। আর ভরি দশেক গাঁজাও নিয়ে আসিস্। নিতাই গোয়ালা ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, জিহ্বাও ওর বেশ রসালো হয়ে উঠেছে।

নটবর তীব্র দৃষ্টিতে নিতাইয়ের দিকে চেয়ে বললে, শালার পেটের পীলে যেন পড়ে যাচ্ছে! তর সয় না।

—যা যা নিয়ে আয়, বেশী কথা কইতে নেই। নেশা উড়ে যাবে।

নটবর বিরক্তি নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। তারপর এণ্টনীর কাছ থেকে মোহরটি নিয়ে দুধমিষ্টি আনতে যায়।

নটবর চলে গেলে ভবতারণ চাটুজ্জে প্রথম কথা বললে। আচ্ছা সাহেব, তোমার বাড়ীতে কে কে আছেন? কোন স্ত্রীলোক নেই?

—উপস্থিত নাই। এখন আমার এই চন্দননগর বাসায় আমি আর আমার কাজের জন্য লোকজন থাকি।

—আচ্ছা সাহেব, তোমার ভাই কেলি সাহেব শুনি প্রচুর ধনরত্নের মালিক?

এণ্টনী ঘাড় নেড়ে বললে, হ্যাঁ, তিনি উপস্থিত আমার কাছ হইতে দূরেই থাকেন, কথা শেষে এণ্টনী ম্লান হাসলো।

—আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করবো সাহেব?

—করিবে নিশ্চয়। সঙ্কোচ করিবার হেতু নাই, আমরা উভয়ই বন্ধু।

—তুমি কি ওপারের ঐ বাড়ীর সুন্দরী স্ত্রীলোকটিকে ভালবেসেছো, মানে প্রেমে পড়েছো? ভবতারণ এণ্টনীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ম্লান হেসে এণ্টনী বললে, এ নগর পিরীতিনগর বাবু ভবতারণ, এইখানে প্রেমে না পড়িয়া উপায় নাই। নেতাই ঠাকুরের একটি গান আমার মন ধরিয়াছে, এই বলে এণ্টনী সুর করে গাইতে থাকে:

পিরীতি নগরে বিষমো সখি!
মনচোরেরো যে ভয়! বসতি হইতে দায়।
নয়নে নয়নে সন্ধানো, মনো অমনি হরিয়ে লয়॥
সন্ধান করিয়ে মনচোর, ভ্রমিছে নগরময়!
কুলেরো বাহিরো হোয়ো না, থেকো সাবধানে লো সদায়॥

—চমৎকার স্মরণশক্তি ত তোমার সাহেব! আর প্রেমকে তুমি

ঠিক বুঝেছো। প্রেমের সময়-অসময় নেই, ক্ষেত্র-অক্ষেত্র নেই, আমাদের হরু ঠাকুর গেয়েছেন :

প্রেম কি যাচ্‌লে মেলে, খুঁজলে মেলে?
সে আপনি উদয় হয় শুভযোগ পেলে।

—তা এক কাজ কর না সাহেব, দূত পাঠাও।

—না বাবু ভবতারণ, উহা আপনি যদি উদয় হয় তাহা হইলেই হইবে।

ভবতারণ নীচুস্বরে বললে, উদয় যে হয়েছে তা গঞ্জনা শুনেই বুঝতে পারছি। এবার একটু এগিয়ে যাও, যদিও সাহেব তুমি ভিন-দেশী ভিন-জাতির, তবু তোমায় বন্ধু বলেই ভালবেসেছি, তোমার দুঃখে আমিও কষ্ট পাই সাহেব, এণ্টনীর হাতটি নিজের মুঠির মধ্যে নেয় ভবতারণ।

—আমি তাহা জানি বাবু ভবতারণ, কিন্তু বাবু অগ্রসর হইয়া স্ত্রীলোককে ভোগ করা যায়, করিয়াওছি আগে, কিন্তু প্রেম! এই বলে উজ্জ্বল চোখে চেয়ে থাকল এণ্টনী ভবতারণের দিকে। কয়েকটি মুহূর্ত গেলে কাঁপাস্বরে আবার ও বল্লে, প্রেম ধীরে ধীরে চোখের জল ফেলিয়া দুঃখ দিয়া, এই বলে এণ্টনী একটু চুপ করে বুকের কাছে হাত রেখে বললে, এই স্থানে কাঁপাইয়া নাচাইয়া এক সময় ধরা দেয় বাবু। তোমার ঠাকুর কবি তাই বলিয়াছে—"সে আপনি উদয় হয় শুভযোগ পেলে"—শুভযোগের জন্য প্রতীক্ষা করিব।

ভবতারণ আশ্চর্য হয়, এত গভীর প্রত্যয় পেলো কোথা থেকে ঐ বিদেশী ফিরিঙ্গী—দিশে পায় না ভবতারণ।

কিছুক্ষণ পর নটবর আসে গজগজ করতে করতে, এক হাতে ওর দুধের পাত্র আর এক হাতে মিষ্টান্ন।

—কি হলো রে নটু, অত গজগজ করছিস্ কেন?

—থাম উলোর বাঁদর! জানো বাবু ভবতারণ ওই নিতে শালা উলোর বাঁদর একে, তায় আবার উলোর এক মদ্দা গোয়ালিনীর কাছে আছে, সেই মাগীর কত ঢং? এমনি লজ্জাবতীর মতন, নিত্তে ব্যাটার

খোঁজে গেলে একগলা ঘোমটা দেবে আর দুধ কিনতে গেলে তো রক্ষে নেই। সেই কথায় আছে না ঃ

উলোর মেয়ে কুল-কুহুটি
নদের মেয়ের খোঁপা
শান্তিপুরে নথ নাড়া দেয়
গুপ্তিপাড়ার চোপা ॥

দুধউলি তো নয় কূল-কুহুটি, যত সব জুটেছে এই ফরেশডাঙ্গায়। জায়গাটাকে পয়মাল ক'রে দিলে! নাও গেলো, আম্বা মিটিয়ে গেলো!

রসনার জ্বালায় নিতাই কথা বাড়ালে না, মিচকি হেসে নটবরের হাত থেকে জিনিষগুলো নিলো নিতাই।

নটবর জিনিষগুলো দিয়ে এণ্টনীর দিকে ফিরে বললে, সাহেব আজ কিন্তু সন্ধ্যের দিকে আমাদের গাহনায় যেতে হবে। আগে থেকে ব'লে রাখছি। আজ আর নিতের সঙ্গে খেমটা মাগীর মাজা নাচানি দেখতে যেয়ে কাজ নেই।

—নে নে খেয়ে নে দেখি, সন্ধ্যে রাতের কথা সন্ধ্যেকালেই হবে। নে ধর। এই নাও সাহেব, চোঁ চোঁ ক'রে মেরে দাও সবটা। মৌতাত হবে। এই ব'লে নিতাই একটি মাটির পাত্র ক'রে বেশ খানিকটা দুধ এণ্টনীকে দেয়, তারপর হারুকে গাঁজার মোড়কটা দিয়ে বললে, বেশ কোষে বাপু এ ছিলিমটি বানাস্—নিতাই খবরদারীতে মহাব্যস্ত হয়ে ওঠে।

দুপুরে কাক-ডাকা রোদে গাঁজার আড্ডা টাকনা সহযোগে জমে ওঠে। গেরস্থ বাড়ীতে আহারান্তে দিবানিদ্রার আয়োজনে শীতল-পাটি বিছানোর সময় উপস্থিত। গাঁজিয়ালদের ঘরের দিকে নজর যায় না। বটতলাকে সর্ব্বস্ব জেনে ভোলানাথের সেবায় বমবম শব্দ তুলে কালকে বিদ্রূপ করে।

অত্যাচারের সীমা নেই। সেদিন সৌদামিনীকে ওর দাদা বেশ গালিগালাজের সঙ্গে চুলের মুঠি ধরে ঠেলে ফেলে দিলে দাওয়া থেকে —বাড়ী থেকে বেরিয়ে যা। আমারি খাবি আমাকেই চোপা!

—নেজ্জ কথা বলবে না তো কি ! ওমনি খোয়ার ক'রে কি বিধবা বোনকে ভাত দিতে হয় ! আহা গো, এমন লক্ষ্মী পিতীমের মত মেয়েছেলের একি ছিরি করলে দেখ দিকি। কপালখানা কেটে টকটকে রক্ত বেরুচ্ছে গা। আয় দিদি, আমার সঙ্গে চ দেখি। তোর আর এ বাড়ীতে থেকে কাজ নেই—নাপিতবৌ দরদ ঢেলে দিলে স্বরে, সৌদামিনীর মাথাটি কোলে নিয়ে।

—তোমাকে আর দরদ দেখাতে হবে না নাপিতবৌ, বাড়ী যাও—সৌদামিনীর ভাজ মুখ ঝামটা দিয়ে ব'লে ওঠে।

—উচিত কথা বলবো, তাতে ভয় কি ! দরকার হলে কোতওয়ালীতে যাবো। দশজন লোক ডাকবো। তোমরা মাগ-ভাতারে মিলে মেয়েটাকে মেরে ফেলবে, আর তাই দেখে চুপ ক'রে থাকবো না কি ? —চ দিদি, ওঠ দেখি, ধুলোর সজ্জা কি তোর সাজে। বাছারে ···

—ভাল হচ্ছে না নাপিতবৌ। যেমন মানুষ তেমনি থাকো। আর তোকেও ব'লে রাখি সদু, একবার যদি বাড়ীর চৌকাঠ পেরোস্ তাহলে আর এ বাড়ীতে ঢুকতে দেবো না জানিস্।

সৌদামিনী কোন উত্তর দেয় না।

নাপিতবৌ ওকে টেনে তুলতে তুলতে বলে, অমন একলসেঁড়ে ভায়ের ভাতের থেকে রাস্তার ভাত ভাল। চল দিদিমণি, ওঠ দেখি।

সৌদামিনী নাপিতবৌয়ের কাঁধে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে ফ্যালফেলে দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। ভাজের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই ভাজ মুখ ফিরিয়ে নেয়। দাদাও। সৌদামিনী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে।

—চল বাছা, এখানে আর নয়, এই ব'লে নাপিতবৌ সৌদামিনীর হাত ধরে সদর দোরের দিকে এগিয়ে যায়।

—তাই বিদেয় হও, আপদ কোথাকার। এবার দাদা উচ্চকণ্ঠে ব'লে ওঠে।

—যাবে আর কোন্ চুলোয়, কোন চুলো কি আর রেখেছে! দেখ না, এখুনি আবার ফিরে এলো ব'লে কালামুখী। গতর নেড়ে

তো খেতে হয় না এখানে। যাবে কোন্ চুলোয়! ভাজ লজ্জাহীন চীৎকার ক'রেই ব'লে ওঠে।

—যাবার অনেক চুলো আছেঃ নাপিতবৌ ফোঁড়ন কেটে সৌদামিনীকে নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায়।

স্থূলকায় মাঝ-বয়েসী নাপিতবৌ স্বেচ্ছায় উদারতা দেখিয়ে সৌদামিনীকে উদ্ধার করার মতন মনের মেয়েমানুষ মোটেই নয়। কিছুদিন আগে এণ্টনীকে সৌদামিনীর খবরাখবর দেবার কাজ নিয়েছিল। নটবরই এণ্টনীর কাহিল অবস্থা দেখে নাপিতবৌকে জুটিয়েছিল। তারপর থেকে প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলায় সাহেবের বাসায় নাপিতবৌ হাজির দিয়ে সৌদামিনীর খবর ইনিয়েবিনিয়ে ব'লে একটি ক'রে মুদ্রা নিয়ে যেতো।

এণ্টনীও এই ব্যবস্থার পর প্রতি সন্ধ্যেতে নাপিতবৌয়ের অপেক্ষায় থাকতো—কি বলিল সে, আমার প্রতি কোন সংবাদ পাঠাইয়াছে কি? জিজ্ঞাসায় অধীরতার আকুতি প্রকাশ পেত।

নাপিতবৌ অবস্থা বুঝে বলতো—জ্বালায় জ্বালায় জ্বলে গেল মেয়েটা। আর সহ্য করতে পারছে না। ভায়ে-ভাজে উঠতে বসতে গঞ্জনা দিচ্ছে।

—উহার খুব কষ্ট হইতেছে। কি করা যাইতে পারে বলিতে পার নাপিতবৌ?

—তাকে ত নিয়তই বলছি, কেন মিছে এখানে পড়ে কষ্ট পাচ্ছিস্। সাহেব ত তোর জন্যে পাগোল।

—তাহাতে সে কি বলিল?

—বলবে আর কি সাহেব। চুপ ক'রে চোখের জল ফেলে। হাজার হোক বামুনের ঘরের কড়ে-রাঁড়ী। পুরোনো রীতিটা কি টপ ক'রে বিস্মরণ হতে পারে?

এণ্টনী ঘাড় নাড়ে। তারপর ব্যস্ত হয়ে ব'লে ওঠে, উহার উপর কোন জোর করিও না নাপিতবৌ।

—সে আর আমায় বলতে হবে না। কত ঘরবর দিলুম, কত্ত

ভাঙলুম আমি, আমার বোঝ নেই গা। নটবরকে খবর করো, সব জানতে পারবে সাহেব আমার ব্যাপার।

—তাহা আমি জানি, এই ব'লে এণ্টনী হেসে একটি মুদ্রা নাপিত-বৌয়ের হাতে দেয়।

অর্থ পেয়ে খুসী হয়ে নাপিতবৌ উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে, তোমার মতন মানুষ হয় না। তোমাকে পেলে সে ছুঁড়ির যৈবন ধন্যি হবে। তুমি কিছু ভেবো না। আমি যখন মাঝে আছি তখন ও ছুঁড়িকে তোমার ঘরে তুলবোই। আজ আসি গো সাহেব।

—আবার কাল আসিও।

—আসব বই কি, নিশ্চয় আসবো, এ সময় না এলে কি চলে। নাপিতবৌ চলে যায়।

প্রতিদিন নানান্ রঙে সৌদামিনীর খবর যেমন এণ্টনীকে শুনিয়ে যেতো, তেমনি ভাজের আড়ালে রসিয়ে এণ্টনী প্রসঙ্গের অবতারণা করতো নাপিতবৌ সৌদামিনীর কাছে। সৌদামিনীর শুনতে ভালই লাগতো। ও প্রতিদিনই অপেক্ষা করত নাপিতবৌয়ের। জ্বালায় ঐটুকুই শান্তির আশা।

সৌদামিনী ইদানীং ভাজের অত্যাচারের ভয়ে সামান্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে সাহস পেতো না, আয়নাতে মুখ দেখা দূরের কথা। কথা আর সয় না। চুলগুলো জট পাকিয়ে গেছে। শরীর দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। গৌর রঙে তাম্র আভা—এসব লক্ষ্য করে না সৌদামিনী। নিজের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীনই থাকে।

আজও যখন সৌদামিনী জবুথবু হয়ে বসেছিল দাওয়ায় তখনি নাপিতবৌ এসে ভাজকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললে, মেয়েটাকে বাক্যি-যন্ত্রণায় শুধু দগ্ধে মারছে না, হাড়িহদ্দও ক'রে রেখেছে! এমনধারা ব্যাপার বাপু সারা ফরেশডাঙ্গা ঘুরেও দেখিনি। আয় দিদি, তোর চুলগুলো একটু গোছ ক'রে দিই।

—থাক্, আর তোমায় সোহাগ জানিয়ে চুল বেঁধে দিতে হবে না। বলি ভাবন ক'রে কি পোড়াকপালী ঘাটে গিয়ে ঐ ফিরিঙ্গীটার

সঙ্গে রঙ্গরস করবে নাকি। কি লো লজ্জাখাকি। কদর্য ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে ব'লে উঠল সৌদামিনীর ভাজ।

সৌদামিনী রাগে লাল হয়ে ওঠে, ফেটেও পড়ে। একরকম চীৎকার ক'রেই ওঠে—মুখ সামলে বৌ, নৈলে……।

নৈলে কি করবি কালামুখী! ধরে মারবি নাকি? ওগো শুনছো, তোমার বিদ্যেধরী সহোদরা আমাকে মারবে ব'লে শাসাচ্ছে যে গো! বলি তুমি বেঁচে আছো, না মরে গেছো। মরে না থাক মর মর।

এসব শোনার পর সৌদামিনীর দাদা স্থির থাকতে পারে না। ঘর থেকে বেরিয়ে আসে,—কি হয়েছে সদু, অমন অসভ্যের মতন চীৎকার করছিস্ কেন?

—অসভ্য আমি, না তোমার ছোটলোক বৌ: রাগের জ্বালায় কাঁপতে কাঁপতে ব'লে ওঠে সৌদামিনী।

—মুখ সামলে কথা বল, ছোট মুখে বড় কথা শোভা পায় না, ছিঃ!

—আহা রে! কি মানী এলেন রে! উঠতে বসতে অসভ্যের মতন ফাঁক খুঁজে খুজে যা তা ব'লে গালিগালাজ করবেন, উনি হলেন মানী। তুমি তো ও সব শুনেও শোন না। বৌ যে! বৌয়ের কথায় ওঠো বসো, বৌ বলছে ভ্যাঁ কর, ওমনি ভ্যাঁ করছো—তুমি আবার মানুষ!

—কি বললি! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। তবে রে, দেখাচ্ছি মজা তোমার—রাগে ছুটে গিয়েছিল সৌদামিনীর সামনে কুশলচাঁদ, তারপর বেশ কয়েকটা চপেটাঘাত ক'রে চুলের মুঠি ধরে দাওয়া থেকে ফেলে দিয়েছিল।

নাপিতবৌ এই সুযোগেরই যেন অপেক্ষায় ছিল। ধীরে ধীরে মিঠেকড়া কথায় কাজ গুছিয়ে সৌদামিনীর মন ভিজিয়ে ওকে নিয়ে আস্তে আস্তে ওদের সদর দরজা পার হয়েছিল।

সন্ধ্যের পর নাপিতবৌ এল এণ্টনীর বাসায়। বেহারা রামচরণ বললে, সাহেব ত এখন বাড়ী নেই।

—তা কোথায় গিয়েছে? বটতলায়, না গঞ্জে? এখুনি ফিরবে কি?

—না গো বাছা, আজকাল সাহেব রাতে গানের আসরে যাচ্ছে। আজও কোথায় গানে যাবে।

—মহা মুস্কিল, বড্ড দরকার ছিল যে।

—দরকার থাকে কাল সকালে এস না হয়, আজ কোন উপায় নাই।

—তাই আসবো বাপু, তুমি সাহেবকে বলো আমি এসেছিলাম।

—আচ্ছা বলবোখন, এই ব'লে রামচরণ নিজের কাজে ব্যস্ত হয়।

নাপিতবৌও দাঁড়ায় না।

এণ্টনী আজকাল প্রায়ই নটবরদের দলের সঙ্গে কবি গাইতে যাচ্ছে। তাই অনেক দিন বাড়ী ফেরে না। ওদিকে বটতলার আড্ডায় যেতেও বেলা করে। ব্যবসা-বাণিজ্যেও ঢিলে পড়েছে। কবিগানে যেন নতুন নেশার আস্বাদ পেয়েছে সে। নিখুঁতভাবে গানের প্রতি শব্দ লক্ষ্য করে। দোহারদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে সুরকে সহজ ক'রে নেয়। অর্থগুলি নিজে না বুঝলে বাঁধনদার, নটবরদের কাছ থেকে বুঝে নিতে দ্বিধা করে না। মহড়া, চিতেন, পরচিতেন, ফুঁকো, মেলতা ইত্যাদি গানের বিন্যাস আজকাল সহজেই করতে পারে এণ্টনী। তেয়ট্, রূপক, খেমটা ইত্যাদি তাল সম্পর্কেও মোটামুটি ধারণা হয়েছে। এ ছাড়া কাহিনীঃ রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের কাহিনী দলের সরকার, নটবর এমনকি রামচরণের কাছ থেকেও শোনে।

এণ্টনী এ নেশায় নাওয়া-খাওয়ার কথা ভোলে। ভাবে চিন্তায় শয়নে ধ্যানে বাঙালী মনকে বুঝতে চায় এণ্টনী নিজের জাত ঐতিহ্য সামাজিক সংস্কারের বাধা অতিক্রম ক'রে।

অবাক হয় নটবর, হারু বেহারা, রামচরণ, দলের সরকার—সাহেব করছে কি।

আর আসরে যখন ধুতি পরে খালি গায়ে মালা গলায় দিয়ে এণ্টনী ধুয়া তোলে তখন অবাক হয় উপস্থিত ভদ্রাভদ্র পুরুষ আর চিকের আড়ালে বিভিন্ন মহিলারা :

—কি তাজ্জব কথা! ওমন সুন্দর গোরা দাঁড়া-কবির দলে ধো তুলছে, একি কাণ্ড!

—না, এলেমদার বলতে হবে ফিরিঙ্গীটাকে। কোথা থেকে জোটালে কে জানে।

—গলাটি খাসা! যেমন জোর তেমনি সুরেলা। কিন্তু একা তো গাইছে না, ঐ দোহারদের গলা ছাপিয়ে যা শোনা যাচ্ছে।

—গাইবে রে গাইবে। সামনের সনে দেখবি ঐ ফিরিঙ্গী সাহেব নেচে গেয়ে বিরহ শুনিয়ে তোর বুকে হুতাশ তুলবে।

—না, সখ আছে ফিরিঙ্গীটার। নিজের জাতের মেমনাচ খানাপিনা ছেড়ে এই সামিয়ানার নীচে সারারাত কবি গাওনা করা কি চাট্টিখানি কথা! কি ভীষণ কাণ্ড রে বাবা, আগে কে শুনেছে এমন ব্যাপার।

—হ্যাঁ, আমাদের মস্ত ভাগ্যি তাই দেখলাম এই কাণ্ড। তুমি তো আসতেই চাওনি। বললে পাঁচ ক্রোশ হেঁটে যাবনি। সেই সেবার নেতাই ঠাকুরের গানের বেলায় প্রথমটা আসতেই চাওনি, শেষে এসে একদিন নয়, তিন তিনদিন গান শুনলে।

—নে বাপু কথা থামা, দেখ সাহেব কেমন সুর তুলছে কানে হাত দিয়ে।

—আস্তে আস্তে।

—বাহবা বাহবা, সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে কেমন নাচে রে ঢোলের তালে তালে!

—সাধু সাধু!

তারিফে হেলে দুলে তালে তালে নাচে এণ্টনী আর মেলতায় জলদ ধুয়ো দেয় দোহাররা।

নটবর বিস্ময়ে তারিফ ক'রে ব'লে ওঠে, ঘুরেফিরে ওস্তাদ ঘুরেফিরে!

রাত্রে দাঁড়া-কবির আসরে সকলের মনোরঞ্জনের পর ভোরে যখন ক্লান্ত চরণে বাড়ীর দিকে ফেরে তখনই সারা মন জুড়ে একটিমাত্র মুখ ভাসে, সে মধুমুখী—এন্টনী একদিন বলেছিল নটবরকে। ও আমার মধুমুখী। ও মুখ ভাবিলে আমার নেশায় আর মিষ্টান্নের প্রয়োজন নাই নটবর; সেই মধুমুখী সৌদামিনী! বিছানায় এসে বিশ্রামেও সেই মুখ—দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে এন্টনী।

সেদিন ভোরে গান শেষে ছোড়া ছুটিয়ে রোদ উঠার আগেই বাড়ী ফিরলো এন্টনী। সহিসের হাতে ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে দালানে উঠে নাপিতবৌকে দেখে বললে, কি সংবাদ নাপিতবৌ?

নাপিতবৌ সাহেবকে দেখে একগাল হেসে বললে, তোমার মস্ত সু-খবর আছে।

—কি খবর করিলে আগে বল। সব ভালত?

—হ্যাঁ বাপু, সব ভাল, আগে বকশিস দাও দিকি তারপর অন্য কথা।

এন্টনী একটি মুদ্রা দিয়ে বললে, এইবার বল কি সংবাদ আনিলে।

—দিদিমণি যে আমার কাছেই আমার বাড়ীতে রয়েছে। কাল সে কি কাণ্ড, কি রক্তপাত!

—কাহার বল নাপিতবৌ, কাহার রক্তপাত?

—কেন, আমার দিদিমণির। ওর দাদা চুলের মুঠি ধরে কাল দাওয়া থেকে ফেলে দিয়েছিল যে।

—কি নিষ্ঠুর উহার দাদা! সিপাই ডাকিলে না কেন?

—তা ডাকলে কি এত সহজে তাকে নিয়ে আসতে পারতুম। তা সাহেব, তোমাকে সে ছুঁড়ি সত্যি সত্যিই ভালবাসে। কাল রাতে কত কথাই না তোমার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে। তুমি আজকাল দাঁড়া-কবি করছো বলতেই দিদিমণি খুব খুসী।

—আমি কবি গাহিতেছি শুনিয়া সে সুখী হয়, একগাল হেসে বললে এন্টনী।

—হ্যাঁ, খুসী গো খুব। তা একবার যাবে নাকি?

—নিশ্চয় যাইব, চল।

একটু বিশ্রাম নেবে না সাহেব। এইত রাত জেগে ফিরলে। চোখ রাঙা জবাফুল করেছো। আমি না হয় বিকেলে আসবো।

—না নাপিতবৌ, উহাকে না দেখিলে আমি ঘুমাইতে পারিব না। চল।

—বেশ চল, কিন্তু লোকে যে দেখবে?

—উহার জন্য ভয় করিও না। তোমার কোন ক্ষতি হইবে না। সকল দায়িত্ব আমার। সে যদি আমার সহিত আসিতে চায় উহাকে লইয়া আসিব।

—বেশ এস, নাপিতবৌ উঠে দাঁড়ালো।

—দাঁড়াও, সহিসকে গাড়ী যুথিতে বলি, এই ব'লে আস্তাবলের দিকে এগিয়ে যায় এণ্টনী।

নীরব নিঝুম হয়ে বসেছিল সৌদামিনী। গত রাতে ঝড় বয়ে গেছে মনে। মুখে তার আভাস—সারারাত ঘুম নেই। আশঙ্কা আর আনন্দের কত ভাবনা একসঙ্গে মনের মধ্যে তুফান তুলে ভোরের দিকে শান্ত ক'রে গেছে।

এতদিন যে কামনা একান্তে লালন ক'রে এসেছিল সেই কামনা-বাঞ্ছিত মানুষটি ভোর হতেই আসবে। তারপর করস্পর্শ দিয়ে একান্ত আপনার জন জেনে কাছে টেনে আদর-আহ্লাদের কত গুঞ্জন তুলবে—ভাবতে শিহরণ জাগে সারা দেহে মনে সৌদামিনীর। আবার আশঙ্কায় সংস্কার-বন্ধনে পাণ্ডুর হয়ে ওঠে সারা মন। আজন্ম-অর্জিত সংস্কার-বন্ধন কি সহজে ছিন্ন করা যায়!

কিন্তু যৌবন-জোয়ারই সব কিছু ভাসিয়ে দিয়ে ওকে নির্ভরতা দেয়—যাকে তুমি মনের সর্বস্ব দিয়েছো, তাকে তোমার মনের মতন ক'রে সম্পূর্ণ কর।

তাই করবে, দেহমন দিয়ে তার মনের মানুষকে একজন বিখ্যাত কবি ক'রে তুলবে। যাকে দেশ ভুলবে না। ইতিহাস যাকে মর্যাদা

দেখে। সৌদামিনী মনের মধ্যে ভবিষ্যতের ছবি আঁকে। কুলটা বলে বলুক। কিন্তু একটি মহৎপ্রাণ শিল্পীকে সার্থক করতে সে কুলটা হয়েও শান্তি পাবে—আরামের নিঃশ্বাস ফেলেছিল সৌদামিনী ভোর রাতে।

তারপর তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছে সে। অবসাদ আর পূর্ব্বাস্তিত্বের স্মৃতিতে বিহ্বল মন যেন শরীরে কাজ করে না—বিছানায় পড়েই থাকে সৌদামিনী। কখন নাপিতবৌ উঠে চলে গেছে খোঁজও করেনি। তারপর দাওয়াতে রোদ এলে বিছানা ছেড়ে উঠেছিল। মুখ হাত ধুয়ে দাওয়াতে বসেছিল নিঝুম হয়ে।

কিছুক্ষণ পরে গাড়ীর একটা শব্দ নাপিতবৌয়ের বাড়ীর সামনে থামলে সৌদামিনী মুখ তুলে চেয়ে থাকে দরজার দিকে। বুকের ভেতর অকারণ ধক্ ধক্ শব্দ ওঠে।

—ওমা, তুমি উঠেছো দেখছি। যাবার সময় দেখলাম চোখ বুজেছো, তাই আর ডাকিনি। ওদিকে সারারাত ত চোখের পাতা পড়েনি।

—সঙ্গে কেউ এল নাকি? সৌদামিনী কাঁপা স্বরে জিজ্ঞাসা করে।

নাপিতবৌ কিছু বলার আগেই এণ্টনী দরজার কাছে এসে বললে, ভিতরে আসিব নাপিতবৌ?

সৌদামিনী এবার ধড়মড়িয়ে উঠে কম্পিত পদক্ষেপে নাপিতবৌয়ের ঘরের ভেতর চলে যায়।

—এস সাহেব, লজ্জা কি।

এণ্টনী উঠোনে এসে এদিক ওদিক দেখে নাপিতবৌয়ের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে থাকলো।

নাপিতবৌ ঘরের দিকে ইশারা করলো।

—যাইব, এণ্টনী জিজ্ঞাসা করে।

—যাবো না তো কি, নাপিতবৌ ফিস্‌ফিস্ স্বরে ব'লে ওঠে।

—এণ্টনী কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর বলে, ইহা কি সঙ্গত হইবে?

—জানিনে বাপু! অত ভালমানুষের আবার পিরীত করা কেন। নাপিতবৌ বিরক্তিসূচক স্বরে বল্লে।

এণ্টনী আরো কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ ক'রে একসময় ঘরের দরজার কাছে এগিয়ে যায়।

—আসিতে পারি, ঈষৎ কাঁপা স্বরে বললে এণ্টনী চৌকাঠে দাঁড়িয়ে।

ভেতর থেকে কোন উত্তর এলো না। ঘরে সৌদামিনী বসে বসে কাঁপে। কথা আসে না মুখে।

এণ্টনী দরজার কাছে দাঁড়িয়েই থাকে। কি করবে ভেবে পায় না।

নাপিতবৌ বলে, ঘরে যাও না, অত লজ্জা কেন পুরুষ মানুষের।

মন চায়, তবু যেন দ্বিধা। উদার মন অনধিকার প্রবেশে জোর পায় না। এণ্টনী দরজার সামনে থেকেই আন্তরিক স্বরে ব'লে ওঠে, অসুবিধা বোধ করিলে আমি চলিয়া যাই।

এবার মৃদু কণ্ঠস্বর এণ্টনীর কানে ভেসে আসে ঃ

অসুবিধার তো কিছু নেই।

একটি আনন্দসূচক নিঃশ্বাস ফেলে এণ্টনী ঘরে এল। কিন্তু কোন কথা বলতে পারে না। সারা দেহে মনে এক অভূতপূর্ব কাঁপন অনুভব করে। চোখের পল্লব পড়ে না। সৌদামিনীর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে।

সমস্ত লজ্জা সৌদামিনীর মুখমণ্ডলে জড়ো হয়েছে—গৌরে এক ঝলক সিন্দুর পড়ে রাঙা টকটক করে। এণ্টনীকে একবার দেখে মুখ নীচু ক'রে নিয়েছে।

অন্তরগুঞ্জনে মুখর দুজনাই।

—কি মনোহর চাঁদবদনি! এণ্টনীর অন্তরগুঞ্জন শব্দে রূপ পায়।

আরো লজ্জা আরো জড়তা এসে সৌদামিনীকে জড়িয়ে ধরে।

—তোমাকে না দেখিলে আমি থাকিতে পারি না। তুমি কি আমাকে ভয় কর?

সৌদামিনী এবার সলজ্জ দৃষ্টিতে তাকায় তারপর আস্তে আস্তে ঘাড় নেড়ে জানায়, না।

—আমার সহিত যাইতে তোমার কোন আপত্তি আছে?

সৌদামিনী নিষ্পলক চেয়েই থাকে। কথা বলে না।

—আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচিতে পারিব না। তুমি কি আমার সহিত যাইবে—কাতর কণ্ঠে ব'লে ওঠে এণ্টনী।

মন বলে, আমিও তোমাকে ছাড়া বাঁচবো না। কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারে না সৌদামিনী।

—তোমার আপত্তি থাকিলে বল আমি চলিয়া যাই, সজল চোখে এণ্টনী বল্লে, তোমাকে দুঃখ দিয়া লইয়া যাইতে চাহি না। আমার যাহা হইবে তাহার জন্য চিন্তা করিও না। তুমি শান্তিতে সুখেতে থাকিও—এণ্টনীর চোখে জল ঝরে।

সৌদামিনীও কাঁদে। অঝোরে জল ঝরে। তারপর আস্তে আস্তে বলে, আমি যাব।

উজ্জ্বল হয়ে ওঠে এণ্টনীর মুখ চোখ। কি করবে ভেবে পায় না। কখনও সৌদামিনীর কাছে কখনও দরজার কাছে এগিয়ে যায় ও। তারপর একসময় সৌদামিনীর কাছে এসে সহাস্যে বলে, তুমি যদি অনুমতি কর তাহা হইলে এইক্ষণেই তোমাকে লইয়া যাই।

এই সময় নাপিতবৌ ঘরে আসে। বলে, নিয়ে যাবে বই কি। কই, ওঠ দেখি দিদিমণি।

সৌদামিনী একবার নাপিতবৌয়ের দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

—ভাবনা কি, চল আমিও যাচ্ছি, সব গোছ ক'রে দিয়ে আসতে হবে তো। খুসীর হাসি হেসে নাপিতবৌ সৌদামিনীর দিকে চায়।

এণ্টনী ব্যস্ত হয়ে বলে, হ্যাঁ নাপিতবৌ তুমি যাইবে, আহারের আয়োজন করিয়া দিবে।

—তুমি এগোও দেখিদিকি সাহেব।

—এই যে যাইতেছি এই ব'লে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে এণ্টনী।

—ভাববার কি আছে দিদিমণি, চল। সাহেব খুব ভালমানুষ গো। দেখবে শেষে একদণ্ডও ছেড়ে থাকতে পারবে না। এস —নাপিতবৌ সৌদামিনীর কাঁধে হাত দিয়ে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

এণ্টনী কি করবে ভেবে পাচ্ছে না।

সৌদামিনীকে বাড়ীতে রেখে দালানে পায়চারি করতে করতে উচ্চস্বরে রামচরণকে ডাক দিলো।

রামচরণ এসে দাঁড়াল একটু পরে। বল্লে, কি বলছো সাহেব ?

—দেখ রামচরণ, আমাকে যেইভাবে দেখ উহাকে সেইভাবে দেখিবে, উহার যাহা প্রয়োজন তাহা আনিয়া দিবে। দেরী করিবে না। আমি ঘুরিয়া আসিতেছি, এই ব'লে এণ্টনী বাহিরে আসে।

তারপর গাড়ী হাঁকিয়ে সোজা গঞ্জের মতি স্বর্ণকারের দোকানে আসে। দোকানে তৈরী অলঙ্কার যা পেলো তা তো নিলোই, তার ওপর আরো গহনা তৈরীর বায়না দিয়ে কাপড়ের দোকানে এসে এণ্টনী বললে, ভালো ভালো স্ত্রীলোকদের কাপড় দাও।

পরিচিত দোকানদার ব্যস্ত হয়েই বিভিন্ন কাপড়ের পোঁটলা খোলে। শান্তিপুরী, ফরেশডাঙ্গার সরেশ, মুর্শিদাবাদী, বেনারসী—নানান্ শাড়ী এণ্টনীর চোখের সামনে মেলে ধরে।

—ঐ পাঁচখানি শাড়ী দাও, আর ধুতি-চাদর দাও দুইখানি। দোকানদার সরেশ ধুতি-চাদরও বার ক'রে দেখায়।

—উহাই দাও, জিনিষগুলি বাঁধিয়া দাও দত্তবাবু, কত মূল্য হইল ?

—মূল্য বেশি কি আর হয়েছে। ও যা হয়েছে আমি হিসেব ক'রে রাখবো। ওরে রাধু, কাপড়গুলো সাহেবের জুড়িতে তুলে দে।

—আমি যাইতেছি দত্তবাবু, কেমন !

—তা এস সাহেব। হ্যাঁ, ভালকথা সাহেব, শুনলাম তুমি নাকি আজকাল দাঁড়া-কবি করছো ?

এণ্টনী হেসে বললে, হ্যাঁ করিতেছি।

—তা ব্যবসা-বাণিজ্য কি করবে না? গঞ্জে তো আজকাল আসোই না।

—না দত্তবাবু, আসি বই কি, তবে কম আসি, আচ্ছা চলিলাম, এই ব'লে এণ্টনী দত্তবাবুর দোকান থেকে বেরিয়ে আসে। তারপর বাজারে ফলমূল তরি-তরকারী কিনে গাড়ী হাঁকিয়ে সোজা বটতলায় থামে।

—আরে, এস ওস্তাদ, তোমা অভাবে আড্ডা আমাদের মোটেই জমছে না, নিতাই ব'লে ওঠে এণ্টনী গাড়ী থেকে নামতেই।

—আমি কিন্তু বেশীক্ষণ বসিব না নিতাই, ছিলিম লাগাও।

—তৈরী আছে সাহেব, এস, গিরিজা চক্রবর্ত্তী ব'লে ওঠে।

এণ্টনী চক্রে এসে উপু হয়ে বসে। গিরিজা কল্কে এগিয়ে ধরে। কল্কেটা নিয়ে দুহাত দিয়ে চেপে মুখে তোলে এণ্টনী। নিতাই আগুন দেয়। দম্‌ভোরে টান দেয় মহা খুসিতে। টান শেষ ক'রে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে এণ্টনী বললে, নটবর কোথায়?

—এসেছিল, তোমার খোঁজেই গিয়েছে ওস্তাদ, হারু ব'লে ওঠে।

—কোথায় গিয়াছে, আমার বাটীতে, না গঞ্জে?

—বোধ হয় তোমার ঘরের দিকেই গিয়েছে, বললে ত আজ তোমাদের কোথায় যেন গাহনার খবর আছে।

—তাই নাকি! আসিলে বলিও আমি ঘরেই থাকিব। কাজ করিতে হইবে অনেক। তুমি নটবরকে আমার ঘরে যাইতে বলিও। আমি উঠিলাম আজ, এই ব'লে উঠে দাঁড়ায় এণ্টনী।

—ব্যাপার কি ওস্তাদ, এত জিনিষপত্তর নিয়ে অসময়ে ঘরে ফিরছো। ভোজ টোজ দিচ্ছো বুঝি?

এণ্টনী হাসল খুসির হাসি এক ঝলক। তারপর যেতে যেতে বল্লে, পরে সব বলিব তোমাদের।

এণ্টনী চলে গেলে নিতাই বললে, বোধ হয় সরিয়েছে মেয়েটাকে।

—খোঁজ নিয়ে আসবো? হারু উৎসাহিত হয়ে ব'লে ওঠে।

—থাক, এখন আর ঘাঁটিয়ে কাজ নেই, গিরিজা দম দিয়ে বললে।

—হাঁ, তা যা বলেছো, আজকাল এসব তো আক্‌ছার হচ্ছে। বিধবাদের ত তোমরা দাসীবাঁদীর মতনই রাখো বাপের ঘরে, খুব ভাগ্যি করলে শ্বশুর ঘরে। যাবে না তো কি করবে মাগীগুলো বলতে পারো? ভবতারণ মেজাজী স্বরে ব'লে ওঠে।

—তা যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে কালে সমাজে বিধবা খুঁজে পাবিনে হারু। নিতাই ঘাড় তুলিয়ে বলে।

গিরিজা বল্লে, বিধবা সধবা—সবই সমান। কটা বামুনের ঘরে মেয়েছেলে স্বামীর সঙ্গ পায়? কুলীন হলে ত তার কথাই নেই। ষোল বচ্ছরে একদিন হয়ত স্বামীসঙ্গ, তাই পরম ভাগ্যি। এক একটি কুলীন বামুন একশ' দেড়শ' ক'রে বিবাহ করছে, এ শালা দেশে মাগী না মরলে তার বালাই গায় না। সেই কথায় আছে না:

পুড়বে মাগী, উড়বে ছাই।
তবে তার বালাই গাই॥

—তাইতো পালাই পালাই রব। কেউ যাচ্ছে গোরাদের খপ্পরে। কেউ হচ্ছে বেশ্যেমাগী। সতী হতে কটা মেয়েমানুষ স্বেচ্ছায় সহমরণে যায় বাপু। জোর ক'রে ধরে ঢাক ঢোল বাজিয়ে বাঁশের গোঁজা দিয়ে একরকম মেরে ফেলে তবে সতী করা হয় চিতেয় চড়িয়ে। বেরিয়ে যাবে না তো কি! মুখ বেঁকিয়ে বললে হারু।

—উচিত কথা কয়েছে বটেক হারু। নিতাই ঘাড় তুলিয়ে বললে।

—হ্যাঁ, তা যাবেনি কেন বাপু! ফিরিঙ্গীর ঘরেই থাক্ আর কলকাতাতে বেশ্যেগিরিই করুক। ভাল খেয়ে পরে ইহজগতে তো থাকতে পারবে। যাক্ সব রাণ্ডি হয়েই যাক্!

—তা যা বলেছো গিরিজা, কলকাতায় এখন বেশ্যে মাগীদের খুব কদর হে। কলকাতার বাবুরা বেশ্যাদের চরণামৃত পান ক'রে প্রাত্যহিক কর্ম্মাদি ক'রে থাকেন আজকাল। দিনে দিনে এসব যেন বেড়ে চলেছে হে। হিন্দুস্থানী ভোজপুরীরাও ছড়া কাটে হে:

গাড়ী ঘোড়া লোনাপানি, আউর রাণ্ডিকা ধাক্কা হ্যায়।
এসমে যো বাঁচে, মৌজ করে কলকাত্তা হ্যায়॥

বাঁচার কি উপায় আছে, যেখানে যাও সেখানে ঐ। গঙ্গার ধার, চিৎপুর, সোনাগাজি, রূপোগাছি, ধর্ম্মস্থান কালীঘাট, বৌ-বাজার—যেদিকে যাবে দেখবে মাগীরা মাজা তুলিয়ে পানঠোঁটে আড়নয়নে ইশেরা করছে।

—মরি মরি! একবার নিয়ে চল না বাবু ভবতারণ। নিতাই গদগদ স্বরে ব'লে ওঠে।

—থাম না শালা। শুনতে দে। বল বাবু ভবতারণ, হারু রসের চিনির মতন মজে ওঠে!

ভবতারণ গাঁজায় দম দিয়ে ধোঁয়া উড়ালো বড় ফুঁ দিয়ে। তারপর বললে, বুঝলে হারু কলকাতায় এখন হৈ-হৈ রৈ-রৈ ব্যাপার! দিল্লী, লাখ্‌নো, কাশীর বড় বড় বাইজীর নাচ-গানে বৌ-বাজারের রাস্তায় ভীড় জমিয়ে দেয়। বিকেলে কোম্পানীর গড়ের ময়দানে ঘুড়ির বাজীতে লাখো লাখো টাকা উড়ছে। কত রাজা-মহারাজা-জমিদার, কোম্পানীর ফিরিঙ্গী বাজীতে ফোতুর হয়ে গেল। সন্ধ্যেকালে কলকাতার রঙই আলাদা। আর আমাদের বটতলার আটচালায় নিধুবাবুর টপ্পার সুরে আখড়াই গান এই ফরেশডাঙ্গায় মাথা ভেঙ্গে ফেল্লেও পাবে না! আহা, কি মধুর সে গান!

—কও না গো আখড়াই গানের কথা। হারু ভবতারণের কাছে ঘেঁসে বসে।

—শোন বলি তা হলে। কলকাতার শোভাবাজারে রাম মিত্তিরের বাড়ীর উত্তরে এক বিরাট আটচালা আছে। সেখানে রোজ রামনিধি-বাবু সন্ধ্যায় এসে সঙ্গীত করেন। আচ্ছা আচ্ছা গুণীর ভীড় প্রত্তিদিন ওখানে। তাছাড়া আমাদের নারাণ মিশ্রের পক্ষির দলও সব সময়ই ওই আটচালা জমিয়ে রাখে। ওখানে এক একটি পক্ষি একশো দেড়শো ছিলিম উড়ায়। কি গাঁজা খাও তোমরা হেঁ!

যাক্, যে কথা বলছিলাম, আমাদের নিধুবাবুর সুধাময় টপ্পায় মোহিত শুধু আমরাই নয়, আচ্ছা আচ্ছা রাজা-মহারাজারাও। তাঁরা ঐ

আটচালাতেই নিধুবাবুর গান শুনতে আসেন। ঐ টপ্পা শুনে মুর্শিদাবাদের জমিদার মহানন্দ রায় আত্মহারা হয়ে যেতেন।

মহানন্দ রায় কলকাতা এলেই নিধুবাবুকে নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করতে যেতেন অপূর্ব্ব এক সুন্দরী প্রখর বুদ্ধিশালিনী বারাঙ্গনার কাছে। এই বারাঙ্গনাটির নাম শ্রীমতী। কলকাতার বটতলার আটচালায় শুনেছি মহারাজ মহানন্দ যেদিন প্রথম শ্রীমতীর কাছে নিধুবাবুকে নিয়ে গিয়েছিলেন সেদিন সারারাত নিধুবাবু শ্রীমতীকে দেখে দেখে অনেক টপ্পা গান সৃষ্টি ক'রে শুনিয়েছিলেন। পরে অবশ্য উভয়েই উভয়ের প্রেমে পড়েছিলো। নিধুবাবু প্রতিদিন একবার না একবার শ্রীমতীর ঘরে যাবেনই, শ্রীমতীকে না দেখলে নতুন টপ্পার জন্ম দিতে পারতেন না।

প্রেমে কি না হয় হারু। হয়ত দেখবে, কালে তোমার ওস্তাদ এণ্টনী সাহেবও এক মস্ত কবি হয়ে গেছে।

—তা বটেক। আচ্ছা ভবতারণবাবু, আখড়াই গানের একটু নমুনা দাও না শুনি।

—আখড়াই গানে তোমাদের দাঁড়া-কবির মতন উত্তর পাল্টা নেই গো হারু। আখড়াইয়ে দু'দলের মধ্যে যে-দলের সুর আর গাহনা ভাল হয় সেই জয়ী। এই আখড়ায় তিনটি ক'রে গান এক একবারে গাইতে হয় প্রত্যেক দলকে। একটি ভবানীবিষয়, একটি খেউড় আর একটি প্রভাতী। যেমন ধরো, নিধুবাবুর দলের ভবানীবিষয় গান। এই ব'লে ভবতারণ সুর ধরলে :

নিশ্চিত ত্বং নিরাকারা
অজ্ঞান বোধে সাকারা
তত্ত্ব জ্ঞানে চৈতন্যরূপিণী,
করুণাময়ী……

—এই গেল তোমার ভবানীবিষয়। তারপর খেউড়—এই ব'লে এক কলি সুর ভেঁজে ভবতারণ ধরলো :

অনেক যতনে প্রেম, তোমার সহিতে। শেষে প্রভাতী, যেমন ধরো—"না হতে সুখের শেষ প্রভাত হইল," বুঝলে হারু। কলকাতা

শুধু আখড়াই কেন, সব গানেরই সেরা সেরা আসর বসছে কলকাতায়। বেশী নয় মাসে বিশ টাকায় আমাদের মতন লোকদের বেশ ফূর্তি ক'রে দিন চলে ওখানে।

—আর আমাদের চার পাঁচ টাকায় সংসার চলে সারা মাস ধরে এখানে।

—কলকাতা গেরস্থীর জায়গা নয় বাপু। সেখানে রাতারাতি বড় লোক হয়ে রাতারাতি ফতুর হতে হয়, তবেই কলিকাতা বাবু। ওখানে নিত্য নতুন ফন্দি ক'রে পয়সা লুটে মাগীদের শ্রীচরণে পেন্নামি দাও, জুড়ি চেপে ইয়ার বন্ধু মোশায়েব নিয়ে বাগানবাড়ীতে বাইজী নাচাও, হররা কর, বুলবুলির লড়াই লাগাও। পক্ষির দলে ভুক্তন হও; কাঠ-ঠোকরা পক্ষি হয়ে বাপকে ঠোক্‌রাও। ফিরিঙ্গীদের তোয়াজ ক'রে নাচ কর, মদ ঢালো বদনে আর খেউড় শোন আসরে! কলকাতায় নতুন নতুন জিনিষ দেখবে। নকুলে বাঙ্গালীবাবুর সম্বন্ধে একটি ছড়া বলি, শোন হারু:

> ধন্য ওহে কলিকাতা, ধন্য ওহে তুমি,
> যত কিছু নতুনের তুমি জন্মভূমি॥
> দিশি চাল ছেড়ে দিয়ে বিলেতের চাল,
> নকুলে বাঙালীবাবু হলো যে কাঙাল॥
> রাতারাতি বড় লোক হইবার তরে,
> ঘর ছেড়ে কলিকাতায় গিয়ে বাস করে॥

—বুঝলে হারু, কলকাতায় রাতারাতি মানুষ ভোল পাল্টায়, তোমাদের ফরেশডাঙ্গা অত রঙদার নয়। এখানে বাবুদের তেমন হররা নেই।

—কেন থাকবে না, কি দেখেছো এখানকার তুমি ভবতারণবাবু। এখানে যা চাবে তাই পাবে। আচ্ছা আচ্ছা বাছা বাছা রকমারি মদ পাবে, মাগী পাবে, বাইজী নাচ চাও, তাও পাবে। দাঁড়া-কবি এখানকার মত আর কোথাও পাবে না—রাকু নৃসিংহী, গোঁজলা গুঁই, নিতাই বৈরাগী, কেষ্টা মুচির মতন দাঁড়া-কবি দেখাও দেখি

কলকাতায় কটা আছে ? পাঁচালী, মজলিসী গান, কেষ্টযাত্রা, মেমনাচ তোমার কলকাতা থেকে এখানে কমটা কি শুনি ! আর এমন ছবির মতন সহর বাপু তোমার কলকাতাও এখনও হয়নি।

—তা বটে, কিন্তু হারুবাবু, তোমার দাঁড়-কবি বল, যাত্রা বল, বাইজী বল, লোক বল আর অর্থ বল, মদ গাঁজাই ধর—সবই এখন কলকাতায় চলেছে। সেখানে টাকা উড়ছে। তাই ধরার জন্যে সবাই টাট-ঠাট নিয়ে কলকাতায় চলেছে। চল, যাবে নাকি একবার ?

—হ্যাঁ, ইচ্ছে ত আছে। ওস্তাদকে ধরতে হবে। ওস্তাদের নৌকা ক'রে একবার মৌজ ক'রে কলকাতায় গেলে মন্দ হয় না, নিতাই তার বাবরী চুলে হাত বুলতে বুলতে ব'লে ওঠে।

—তা মন্দ বলনি হে, গিরিজাও সায় দেয়।

—এণ্টনী ওস্তাদ কাল এলে বলা যাবে।

—দেখ সে আবার পড়ে কি না। যদি বামনীকে হাতে পেয়ে থাকে তাইলে ও এখন কোথাও নড়ছে না।

—নটে শালা এখনও এলো না। ও শালা ওস্তাদের পেয়ারের লোক। খবর সব ওই রাখে। কারণ কি সেদিন দেখলুম নাপিত-বৌয়ের সঙ্গে এণ্টনী ওস্তাদ কথা বলছে। আর ওকে নটেই জুটিয়েছে। নাপিতবৌ ডাকসাইটে বৃন্দে দূতী। আজ এণ্টনী সাহেবের মুখে হাসির যে ছটা, তাতে মনে হয় ডবকা ছুঁড়িটার মুখে নিশ্চয় মুখ ছুঁইয়েছে। নিতাই চোখ মোটকে মিচকি হাসে।

—তোর অত মাথাব্যথা কেন রে বাপু, সে যা করে করুক। আমরা যা করি তার খোঁজ কি সে করে ? যত সব গোয়ালা-বুদ্ধির কাণ্ডকারখানা ! নে নে, ছিলিম তৈরী কর।

হারুর কথায় নিতাই একটু যেন দমে গেল। চুপচাপ ছিলিম বানাতে থাকে। হারুকে আজ আর গাল দেয় না। ইটও ছোঁড়ে না গিরিজা ভবতারণের উপস্থিতির জন্যে।

ছিলিম তৈরী হয়, আগুন লাগে, ঘোরে, কিন্তু কথা হয় না। কি যেন ভাবছে সবাই। হয়ত এণ্টনীর মুখের সেই উজ্জ্বল হাসির কথা।

উজ্জ্বল। সবই সোনা রং। জ্বলজ্বল করে। হাসি, চোখ, মুখমণ্ডল, চিকুর, শাড়ী, গহনা, ঝাড় লণ্ঠন : সবই উজ্জ্বল।

সৌদামিনী ক'দিনের মধ্যে তার লজ্জা জড়তা কাটিয়ে সহজ অন্তর উজলে ঝলমলিয়ে উঠেছে।

আর এণ্টনী পাগল হয়ে উঠেছে সেই উজ্জ্বলতায়। সৌদামিনীকে নিয়ে কি করবে ভেবে পায় না।

আজও রাত্রে সৌদামিনী রেশমী শাড়ী পরে গহনা গায়ে ফুলের সুবাস ছড়িয়ে লজ্জা-উজ্জ্বল হয়ে যখন বিছানায় বসলো তখন এণ্টনী ওর ভীরু কাঁপা আঙ্গুলগুলো দিয়ে চম্পকবরণ চিবুকটি চোখের সামনে তুলে ধরে আবেশ কণ্ঠে বললে,

ভালবাসি, সখি, বড় ভালবাসি, এ মুখ হাসি।

কৌতূহলে আঁখিপল্লবের লজ্জা ভাঙ্গে। টানা টানা চোখ তুলে তাকায় সৌদামিনী. মৃদু স্বরে জিজ্ঞাসা করে, কোথায় পেলে এ পদ ?

—আমাদের কবি গাহ্নায়।

—তুমি বুঝি কবি ভালবাস ?

—বাসি. তোমাকে যেদিন দেখিয়াছি সেদিন তোমার ভাষা, তোমার গান আমার আপন হইয়াছে। মধুমুখী তুমি হাস আমি দেখি—আবেশজড়িত চোখ, রসশ্লথ স্বর এণ্টনীর।

সৌদামিনীও আবেশে চোখ বোজে। তারপর ধীরে ধীরে বলে, তোমাকে দূর থেকে দেখতাম, মনে হতো তুমি বহুকালের জানা। তোমাকে না দেখলে আমিও যে থাকতে পারতাম না। তুমি বল, আমাকে ছেড়ে যাবে না কোনদিন ?

—না গো না সৌদামিনী। তোমাকে কি আমি ছাড়িতে পারি ! তুমি আমার নয়নমণি। তোমাকে না হেরিলে আমি অন্ধ। তোমা বিনে কিছু জানি না সখি—বুকের কাছে টেনে নেয় সৌদামিনীকে।

এণ্টনীর বাহুবন্ধনে সৌদামিনী আনন্দবিহ্বল হয়ে চোখ বোজে। কথা বলে না।

এণ্টনী পলকে সৌদামিনীর মুখমণ্ডল আলতো ক'রে নিজের মুখের

সামনে তুলে ধরে, তারপর দীর্ঘ চুম্বনে গাঢ় অনুরাগের উষ্ণ পরশ রাখে।

ফুলের গন্ধের মাঝে এণ্টনীর অধর-পরশ সৌদামিনীকে অন্য এক জগতে নিয়ে যায়, জাত-কুল-মান যায় হারিয়ে। প্রেম-বিভোর সৌদামিনী আরো ঘন হয়।

এণ্টনী নিবিড় বন্ধনে বেঁধে চুম্বনে পাগল ক'রে তোলে সৌদামিনীকে, তারপর এক সময় এণ্টনী সৌদামিনীর কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে মৃদু কণ্ঠে সুর তুলে বলে ঃ

"মোর পরাণ পুতলী রাধা"—তুমি আমার রাধা সদু, তুমি আমার রাধা।

—জান পদটি সব ? বড় প্রিয় লাগে আমার রায়গুণাকরের এই পদটি।

—জানি। তোমার জন্য আমি সব জানিব, সব ছাড়িব।

—গাও না পদটি।

এণ্টনী বিভোর হয় সুরে ঃ

মোর পরাণ পুতলী রাধা
সুতনু তনুর আধা ॥
দেখিতে রাধায় মন সদা ধায়
নাহি মানে কোন বাধা।
রাধা সে আমার, আমি সে রাধার,
আর যত সব ধাঁধা ॥
রাধা সে ধেয়ান, রাধা সে গেয়ান,
রাধা সে মনের সাধা।
ভারত ভূতলে, কভু নাহি টলে
রাধাকৃষ্ণ পদে বাঁধা ॥

গান শেষে সৌদামিনী উচ্ছ্বসিত স্বরে ব'লে উঠল, চমৎকার ! সুন্দর তোমার কণ্ঠ, কোথায় শিখলে এ গান তুমি ?

—নটবরের কাছ হইতে। আমার খুব ভাল লাগে রাধাকৃষ্ণের পদগুলি। তুমি শিখাবে আমাকে ?

—হ্যাঁ গো শেখাবো। আমার সব ধ্যান জ্ঞান দিয়ে তোমাকে শেখাবো। তোমাকে বড় দাঁড়-কবি হতে হবে যে!

—সত্য বলিতেছো? আনন্দে আরো কাছে টানে সৌদামিনীকে।

—সত্যি বলছি। তুমি যে সব। তোমার জন্যে আমি সব ছেড়ে সব দেবো। তুমি যে আমার মনচোর।

—মনচোর! বাঃ। কথাটি সুন্দর। একটি গান শুনাইবে। একদিন বটতলায় তোমার গানের সুর শুনিয়াছিলাম—কি মনোহর! পক্ষিরাও তাহাদের কাকলী বন্ধ করিয়াছিল।

গাও না—আদর-আবদারে চুম্বন-চিহ্ন রাখে এণ্টনী সৌদামিনীর অধরে।

—সরো, এমনি ক'রে বাঁধলে বুঝি গাইতে পারি!

—না এমনি ক'রেই গাও, গালে গাল ঠেকিয়ে আবদারের সুরে বললে এণ্টনী।

সৌদামিনী হাসে, ঝরণার মতই উচ্ছল সে হাসির বেগ।

—হাসো আরো হাসো: সৌদামিনীর কুন্তলকুঞ্জে মুখ ঢেকে বললে এণ্টনী।

—সৌদামিনী হাসে সচকিত হাসি। বাইরে ঘুমন্ত চাকরবাকর চমকে ওঠে। বুড়ো রামচরণ মুখ বিকৃত ক'রে বলে ওঠে—বেহায়া মাগী! রাম রাম।

সমাজ-সংস্কার-পরিবেশের কোন বাধা মানে না। মিলন-মুখর মন ছ'জনার। ছ'জনে ছ'জনার মাঝে হারাতে ব্যাকুল। রাত্রির অন্ধকারে ওদের মনে আলোর ঝলকানি লাগে, তাই কোকিল কণ্ঠস্বর। সত্যিই কোকিল-কণ্ঠ সৌদামিনীর: এণ্টনীর কানে সুধা ঢালে:

এ বড় চতুর চোর
গোকুলে নন্দকিশোর॥
নারিনু রাখিতে, দেখিতে দেখিতে
চিত চুরি কৈল মোর।
সে দেখে সবারে, কে দেখে তাহারে,
লম্পট কাল কঠোর।

ফেরে পাকে পাকে, কাছে কাছে থাকে
চাঁদের যেন চকোর।
নাচিয়া গাইয়া, বাঁশী বাজাইয়া
ভারতে করিল ভোর॥

বাইরে রামচরণ মধুর সুর শুনে শূন্যমনে 'আহা মরি!' ক'রে ওঠে।

গান শেষে এণ্টনী গদগদ স্বরে ব'লে ওঠে, অতি মনোহর তোমার কণ্ঠ সৌদামিনী। আর পদটিও চমৎকার। কে এই পদটি বাঁধিয়াছেন?

—আমাদের দেশের বিখ্যাত কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র।

—যিনি অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর লিখিয়াছেন?

—হ্যাঁ গো, তুমিত দেখছি আমাদের কবিদের অনেক খবর জানো!

—আমাদের কবি দলের সরকার বলিয়াছিল, আরো দুটি একটি পদও সে শুনাইয়াছিল। একটি পদ, সেই রসিয়া নাগর—ভারী মধুর। জানো পদটি?

সৌদামিনী হাসে মৃদু, তারপর বলে, আজ কি ঘুমোবে না? এইটেই কিন্তু শেষ। এরপর ঘুমাব কেমন ত?

এণ্টনী বিস্মিত হাস্যে বল্লে, হ্যাঁ ঘুমোবো, তুমি শোনাও।

সৌদামিনী সহজ হয়ে বসে গান ধরে:

বড় রসিয়া নাগর হে
গভীর গুণসাগর হে॥
কখন ব্রাহ্মণ ভাট ব্রহ্মচারী,
কখন বৈরাগী যোগী দণ্ডধারী
কখন গৃহস্থ কখন ভিখারী,
অবধূত জটাধর হে।
কখন ঘেটেল কখন কাঁড়ারী
কখন ঘেটেল কখন ভাড়ারী
কখন লুটেরা কখন পসারী
কভু চোর কভু চর হে॥

কখন নাপিত, কখন কাঁসারী
কখন সেকৃরা, কখন শাঁখারী
কখন তামুলী তাঁতী মণিহারী,
তেলী মালী বাজীকর হে।
কখন নাটক, কখন চেটক,
কখন ঘটক, কখন পাঠক
কখন গায়ক, কখন গণক
ভারতের মনোহর হে॥

গানটি শেষ ক'রে সৌদামিনী বললে, এবার ঘুমাও, আমি পাখা করি।

—ঘুম আসে না। তুমি ঘুমাও। আমি বসে বসে তোমার সুধামুখ দেখি।

আমি তো তোমার কাছেই রইলাম। ঘুমোও লক্ষ্মীটি—সৌদামিনী এণ্টনীর মাথার চুলে গায়ে ওর স্নিগ্ধ হাতের পরশ রাখতে রাখতে আবার বললে, দেখ কাল স্নানের সময় ভাল ক'রে তেল মাখবে চুলে। চুলগুলো ত জটা বানিয়েছো। আর একটি জিনিষ তুমি মোটেই খেতে পারবে না।

—কি জিনিষ?

—যা বটতলায় বসে বসে টানো।

—ও গাঁজা। হাসে একঝলক এণ্টনী।

—হাসি নয়, সত্যি বলছি। দেখ ও নেশা করলে মানুষ সব ভুলে যায়। হয়ত তুমি আমাকেই ভুলে যাবে।

—না না মধুমুখী, আমি তেমন নেশা করিতে চাহি না যাহার জন্য তোমাকে ভুলিব। তবে একটু আধটু খাই। উহাতে দোষ ধরে না।

আর একটি কথা। বাজার বেরুনো বন্ধ করছো কেন? ব্যবসা-বাণিজ্য না করলে সংসার চলবে কি ক'রে?

এবার এণ্টনী হো হো ক'রে হেসে ওঠে।

—হাসি নয়, সারাদিন যদি আমার পিছন পিছন থাকো তা হলে কি ক'রে চলবে বলতো ?

—অর্থের অভাব এখনও হয় নাই সৌদামিনী। তবু তুমি যখন বলিলে তখন যাইব।

—হ্যাঁ, তাই যাবে কাল থেকে। এখন চোখ বুজে ঘুমোও, সৌদামিনী পাখা করতে করতে গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়।

সৌদামিনী অনেক সহজ হয়ে গেছে এণ্টনীর কাছে। নিজের ক'রে নিয়েছে সবই। গৃহের যাবতীয় কাজও খুঁটিয়ে করে। রান্না ত করেই, এমন কি স্নানের তদারকের সঙ্গে এণ্টনির মাথায় চিরুনী দিইয়ে ধুতি পরিয়ে সযত্নে ওকে ভোজন করাতে বসে। পঞ্চব্যঞ্জনে ভাতের থালা সাজিয়ে নিজেই নিয়ে আসে। এণ্টনী খেতে বসলে কোন্‌টা আগে খেতে হয় ব'লে দেয়, হাওয়া করতে করতে সৌদামিনী —ওটা নিম-বেগুন, আগে খাও।

এণ্টনী মুখ বিকৃত ক'রে বলে, বড় তিতো!

—তা হোক, তবু খাও। ও খেলে গায়ের পোকা মরে। এবার ঐ সুক্ত মাখো দিকি ভাতের সঙ্গে।

প্রথম প্রথম অনভ্যাসের ফলে পরিপাটী ক'রে মাখতে পারতো না এণ্টনী। সৌদামিনী নিজে মেখে দিতে দিতে বলতো—এই এমনি ক'রে মাখতে হয় বুঝলে—এইভাবে এক একটি করে বাঙালীর আহাররীতি সম্পর্কে অভ্যস্ত ক'রে তোলে এণ্টনীকে।

ইদানীং আহারান্তে কিংবা সকালের দিকে কুর্তা-পাতলুন পরিয়ে সৌদামিনী গঞ্জের বাজারেও পাঠায় এণ্টনীকে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্যে।

বিকেলের দিকে জলযোগ করিয়ে এণ্টনীকে বাংলা ভাষা শেখায়। বিভিন্ন পুরাণ কাহিনী, রামায়ণ-মহাভারতের উপাখ্যান, বৈষ্ণব মহাজনদের পদাবলী ইত্যাদি শোনায়। মনের সাধ পূরণে অক্লান্ত পরিশ্রম করে সৌদামিনী।

আর এণ্টনী ছায়ার মতন সৌদামিনীকে অনুসরণ করে। কোন

কোন দিন অনিচ্ছা থাকলেও সৌদামিনীর তাগিদে নটবরের সঙ্গে দাঁড়া-কবির আসরে গান করতে যায় শান্ত হাসি হেসে।

শান্ত আনন্দময় এক জগতে ওরা দুইজনেই স্বোয়াস্তিতে দিন কাটায়।

কিন্তু সমাজ সহ্য করে না—এণ্টনী-সৌদামিনীর শান্ত নীড়ে ভীমরুলের মতন হুল বেঁধায়। ফিরিঙ্গী-সমাজ পথে ঘাটে এণ্টনীকে বিদ্রূপ ক'রে অতিষ্ঠ ক'রে তোলে।

হান্সম্যান এণ্টনীকে দেখলেই বলে, ঐ যে নেটিভ স্ত্রীলোকের ভেড়া চলেছে! ওর পাশ দিয়েও যেও না। নেটিভদের দুর্গন্ধ পাবে।

এণ্টনীর নিকট-আত্মীয়, পারিবারিক বন্ধুবান্ধব অনেক বুঝিয়েছে—নেটিভ মেয়েদের নিয়ে ফূর্তি করতে চাও, কর। কিন্তু তাকে বিবাহিত স্ত্রীর মর্য্যাদা দিতে চাও ত খৃষ্টান কর। তুমি নেটিভ স্ত্রীলোকের সঙ্গে থেকে নেটিভের মতন আচার-ব্যবহার করবে, এ কি রকম! এ সব ছাড়ো। ওকে বাড়ী থেকে নিয়ে গিয়ে অন্য কোথাও রাখো, মাঝে মধ্যে গিয়ে ফূর্তি ক'রে আসবে।

এণ্টনী কিন্তু এ সব কথায় কর্ণপাত করেনি। আত্মীয়-স্বজনের উপদেশকে উপেক্ষাই করেছিল। জোর গলায় জানিয়েছিল: ওর ইচ্ছে অনুসারেই আমি চলবো।

—তা হলে আমাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকবে না। কোন যোগাযোগ রাখবো না।

—তা যদি না থাকে, না থাকবে।

আত্মীয়-স্বজন ছি ছি করতে করতে চলে গিয়েছিল। কিন্তু সমাজের অন্যান্য মেয়ে-পুরুষের বিদ্রূপ ও গালাগাল দিন দিন অতিষ্ঠ ক'রে তোলে এণ্টনীকে।

এণ্টনী বামুনের মেয়েকে জোর ক'রে ধরে নিয়ে গেছে, বাঙালীর সমাজেও ঢাকের বাদ্দ্যির মতন এই কথা লোকের মুখে মুখে ফিরছে।

গোঁড়ারা ওকে দেখলেই বলে, ঐ যে শালা জাতমারা ফিরিঙ্গী যাচ্ছে!

সৌদামিনীর দাদা কোতওয়ালীতে খবর দিয়েছে।

এণ্টনী ফিরিঙ্গী গেরস্থ বাড়ীর বৌ-ঝিদের নিয়ে টানাটানি ক'রে অতিষ্ঠ ক'রে তুলছে, এই রটনায় সহরের সম্ভ্রান্ত ভীরু মানুষরাও এজাহার লিখিয়েছে।

পুলিশকর্ত্তা একদিন তাই শাসিয়েও দিলে, এই ধরণের অভিযোগ আর এলে আমি তোমার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা করতে বাধ্য হব।

নটবর, হারু, নিতাই, গিরিজা ইত্যাদি কয়েকটি এদেশী সঙ্গী ছাড়া পরিচিত দেশী-বিদেশীরা রাস্তাঘাটে বিদ্রূপ ক'রে গাল দেয় এণ্টনীকে।

সেদিন বিকেলের দিকে বন্দরতীরে জোসেফের টিপ্পনীতে বিরক্ত হয়ে বাড়ী এসে এণ্টনী সৌদামিনীকে বললে, দেখ সদু আমাদের এখানে আর থাকা ঠিক নয়। এখানকার দেশী-বিদেশী সবাই আমার পিছনে লেগেছে। চল আমরা গৌরহাটিতে গিয়ে থাকি।

সৌদামিনী বোঝে কিসের জ্বালায় এখান থেকে পালাতে চাচ্ছে এণ্টনী। তাই সায় দিয়ে বললে, বেশতো তাই চল না।

—হ্যাঁ সেই ভাল, ওখানে গেলে আমিও নিশ্চিন্ত হয়ে দলটা ঠিক ক'রে নিতে পারবো। যাতে এই পূজোতে গাহনা করতে পারি তার ব্যবস্থা ত করতে হবে।

সৌদামিনী হেসে আবদারের সুরে বলে, ওখানে গিয়ে কিন্তু এবার আমি মায়ের পুজো করবো।

—নিশ্চয় করবে। ঘটা ক'রে ঢাকের বাদ্য ক'রে, পাঁচজনকে নিমন্ত্রণ দিয়ে, কবির আসর দিয়ে, দান ক'রে—যাকে বলে কি যেন কথাটা সেদিন তুমি বলসে ?

সৌদামিনী হেসে কথাটা জুগিয়ে দিলে, জ'াকিয়ে !

—হ্যাঁ, জ'াকিয়ে ভবানীর পূজা করবে। এখন দাও দিকি এক ছিলিম তামুক। তামাক খেয়ে গাড়ী নিয়ে একবার গৌরহাটি ঘুরে আসি।

এই সময় বাইরে কে যেন ডাকে—ওস্তাদ আছ না কি ?

—ওগো, তোমার নটবর এলো বোধ হয়। থাক্, আমি পাকশালে যাচ্ছি। বিশুকে দিয়ে তামাক পাঠাচ্ছি। আর হ্যাঁ, যদি গৌরহাটি যাও ত এখুনি বেরিয়ে পড়। নৈলে রাত্তির হবে যে।

—তুমি তামাক দিতে বল। তামাক খেয়েই বেরিয়ে পড়ছি।

—তাই এস বাপু, দিনকাল ভাল নয়। শত্তুর তো চারদিকে, আমি তামাক দিতে বলছি। এই ব'লে সৌদামিনী ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

নটবর আসে। বলে, কি ওস্তাদ, ও ধারের কি করলে, বট-তলায়ও আজ গেলে না?

—যাবো কি! লোকে যা পেছনে লাগে। দেখ নটবর, আমি গৌরহাটিতে গিয়ে থাকবো ভাবছি। সেখানে গঙ্গার ধারে আমার একটি বাগানবাড়ী আছে। দুই-এক দিনের মধ্যেই চলে যাচ্ছি ওখানে। দলের মহলা ওখানেই হবে, কি বল?

—তা মন্দ নয়। তোমার পেছনে যা ফেউ লেগেছে। তার ওপর ঐ নিতে ব্যাটার জন্যে ত টাকাগুলো ধোঁয়ায় উড়াচ্ছো! ও তোমার ভালই হবে। নিরিবিলিতে দিব্বি কাজ হবে। হারুকে বলবোখন তাহ'লে। আর হ্যাঁ, ভাল কথা ওস্তাদ, গোরক্ষ যোগী খবর করছিল, কি হলো না হলো।

—গোরক্ষনাথকে বলবে দু'চার দিনের মধ্যেই খবর দেবো। তা নটবর, তোমার কাছে টাকাকড়ি আছে তো? না থাকে বল কিছু দিয়ে দিই।

মাথা চুলকে নটবর বললে, না চাইলেই তো পাই তোমার কাছ থেকে।

—এই নাও এই কটি রাখ দেখি, এই ব'লে এণ্টনী কয়েকটি মুদ্রা নটবরের হাতে গুঁজে দেয়।

নটবর টাকাগুলো নিয়ে আমতা স্বরে বললে, আমি যাই তাহলে। একটু বরাত আছে একখানে। কাল আবার আসবো।

—চল আমিও বেরুবো, একবার গৌরহাটি যাবো। ওখানে জন লাগিয়েছি, কাজ কতদূর হলো দেখে আসি।

—এই অবেলায় বেরুবে একা একা! যা শত্তুর করেছো চারদিকে—চল আমিও না হয় যাই।

—তোমার যে বরাত আছে।

—ও থাক, রাতে গেলেও চলবেখন।

—তাই চল, এই ব'লে স্বরটিকে আরও নীচু ক'রে এণ্টনী বললে, ছোট কল্কে আছে ত সঙ্গে ?

নটবর হেসে ঘাড় নেড়ে জানায়, আছে।

—চল, আর তামুক খায় না। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে সৌদামিনীর উদ্দেশে উচ্চকণ্ঠে ব'লে উঠে এণ্টনী—আমি বের হচ্ছি, নটবরও সঙ্গে যাচ্ছে। রাত হলে ভেবো না—কথা শেষে দালান থেকে আস্তাবলের দিকে এগিয়ে যায়।

নটবরও সঙ্গ নেয়।

এবার তোমার মনকে নিয়ে এখান থেকে সোজা পূবের দিকে হাঁটতে থাক ক্রোশ দুই, তারপর পাবে গৌরহাটি।

এই গৌরহাটিতে এককালে ফরাসী লাট দুপ্লে এক বিরাট উদ্যান-ভবন তৈরী করেছিলেন। অমন সুন্দর প্রাসাদ পূর্ব-অঞ্চলে আর কোথাও ছিল না। তখনকার দিনে ইংরেজ মহারথী ক্লাইভ-হেষ্টিংসরা ফরাসী লাট-বেলাটরা আর কলকাতা-চন্দননগর-শ্রীরামপুরের ফিরিঙ্গীরা এখানে সময় সময় উৎসব-আনন্দে একসঙ্গে মিলে পানাহার করত। নাচগানের সঙ্গে সঙ্গে গোপন পরামর্শও চলতো মহারথীদের মধ্যে। এই বিরাট ভবনে একসঙ্গে একটি দালানে একশো জনের বেশী লোকে পানাহার করতে পারতো। বিদেশী দর্শক এখানে এলে, এই প্রাসাদ দেখলে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতো। এখানেই ফরাসীদের এক সুন্দর নাট্যশালা ছিল—পশ্চিমী ধারায় অভিনয় এখানেই প্রথম

হয়েছিল। আর সেই গৌরহাটিতে বসেই ক্লাইভ সৈন্যসামন্ত সমাবেশ ক'রে পলাশী যুদ্ধে গিয়েছিল।

এই গৌরহাটির ডুপ্লের উদ্যান-ভবন ছাড়িয়ে গঙ্গার ধারে একটি সুন্দর বাগানবাড়ীতে এণ্টনী সৌদামিনীকে নিয়ে চলে এলো চন্দননগর ছেড়ে।

—বাঃ! খাসা জায়গাটি কিন্তু—সৌদামিনী প্রথম এসেই খুসী হয়ে ব'লে উঠেছিল।

এণ্টনী একটি তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে হেসে বল্লে, তোমার শান্ত চোখের সঙ্গে এই শান্ত জায়গাটির ভারি মিল। তাইতো চলে এলাম তোমাকে নিয়ে এখানে। চন্দননগরে যা হট্টগোল।

—রঙ্গ রাখো! জিনিষপত্তরগুলো ঠিক ঠিক আসছে কিনা দেখ-দিকি। আমি ঘরদোর সাজিয়ে ফেলি। সৌদামিনী গাছ-কোমর ক'রে কাপড় বেঁধে এগিয়ে যেতে থাকে।

—ধীরে, সখি ধীরে চল! আহা কোমরের গোটের দানাগুলি ভারি সুন্দর নাচে তোমার ধীর চলনে—আর একটু দেখি সখি ঐ লচক লচক নাচন।

ঘুরে দাঁড়ায় সৌদামিনী চোখে কটাক্ষ, মুখে চপল হাসি নিয়ে—ফের! এবার পেছুনে লাগলে!···

—নিঠুর হয়ো না মধুমুখী, পায়ে ধরি সখি। হাঁটু ভেঙ্গে বসে সবুজ ঘাসে এণ্টনী।

সৌদামিনী ওর বসবার ভঙ্গিমা দেখে উছল হাসিতে মুখর করে নির্জ্জন পরিবেশ। তারপর ওর পাশে বসে সোহাগ স্বরে বলে, আচ্ছা, দূরপাল্লায় কবি করতে কি ক'রে যাবে গো আমায় ছেড়ে?

তাই ভাবি নিশিদিন, বিদেশে একাকী কিভাবে কাটিবে দিন! তার চেয়ে যেখানে যাবো সেখানেই তোমায় নিয়ে যাবো সহ্থ। তুমি নৌকাতে থাকবে, গান শেষ হলেই আমি তোমার কাছে চলে আসবো।

—তাই কি হয় নাকি! ঘরদোর সব যে লক্ষ্মীছাড়া হয়ে যাবে। জানো পাঁচটি গরু কিনেছি!

—তাই নাকি, কই দেখিনি তো!

—কালই ত কিনলাম, রামচরণ নিয়ে আসবে আজ কিংবা কাল।

—বাহবা বাহবা, এই না হলে গৃহিনী, একেবারে পাঁচটি গাভী খরিদ! তা পাঁচটি গাভীর দুগ্ধ আড়াই ভাগে ভাগ হবে নাকি তোমার আমার মধ্যে?

—আজ্ঞে না। মোটেই তা নয়, সবটাই তোমার। তুমি যে আমার ভোলা মহেশ্বর গো; ভুলে ভুলেই গাঁজা খেয়েই ফেলো। এই ব'লে হাসে সৌদামিনী একচোট। তারপর হাসি থামলে বলে, সের আটেক দুধ পেটে না পড়লে হাওয়াতে উড়বে যে তুমি। তাই তো খরিদ করলুম।

—ইস্, আবার জেনে ফেলেছো! কিন্তু সদু, সত্যি বলছি বেশী খাই না। সৌদামিনীর হাত ধরে বললে এণ্টনী।

—তা জানি, আর কৈফিয়ৎ দিতে হবে না। এখন যাও দেখি, জিনিষপত্তরগুলোর খবর করো। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। রাতের পথ ভাল নয়। আজকাল বড্ড ঐ পথে ডাকাতি হচ্ছে গো। লোকে যা হাহাকার তুলছে, ডাকাতি করবে না তো কি। কুঠির সাহেবরা তো জুলুমের পর জুলুম করছে। খেতে না পেলে লোকে কি করবে বল। পেট পেট ক'রেই মানুষ অকাজ-কুকাজ করে। যাও না গো। কথায় কথা বাড়ে। আর না, দেখই না।

এণ্টনী যেন অন্য জগতে চলে গিয়েছিল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ও বললে, যাচ্ছি। কিন্তু তুমি যে কথা বললে, সত্যিই তাই হচ্ছে। বড্ড অত্যাচার চলেছে মানুষের ওপর। এত অন্যায় যারা করে তাদের ক্ষমা নেই। ঈশ্বর তাদের ক্ষমা করবেন না।

সৌদামিনী উজ্জ্বল চোখে চাইলো এণ্টনীর দিকে—কি দরদ, কি সহানুভূতি ওর মানুষের ওপর। অথচ লোকে ওকে মন্দ বলে। ছাই পড়ুক অমন লোকের মুখে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সৌদামিনী এণ্টনীর মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে দরদ-ঢালা স্বরে বললে, লক্ষ্মীটি এবার ওঠো। রাতে কথা বলো যত খুসী, একটুও বলবো

না ঘুমোও। এখন ওঠ, কথা শেষে হাত ধরে টেনে তোলে ওকে সৌদামিনী।

বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। এখানকার শান্ত নির্জ্জন শীতল ছায়ায় সৌদামিনী নিজেকে আরো খুলে মেলে এণ্টনীকে ঘিরে সংসার গুছিয়ে নিয়েছে।

ভোরে সবার আগে সৌদামিনীর ঘুম ভাঙ্গলে বিছানায় ঘুমন্ত এণ্টনীর কপালে তৃপ্তির চিহ্ন এঁকে আস্তে আস্তে গৃহকর্ম্ম স্থুরু করে মঙ্গল-ছড়া দিয়ে, প্রতিটি কাজ সারে নিখুঁত ক'রে, বুঝেও নেয়, গরুর তদারক, আস্তাবলে ঘোড়ার দানাপানির খবর করাও বাদ দেয় না।

একটু বেলা বাড়লে চাকরকে বাজারে পাঠিয়ে গঙ্গায় স্নান সেরে এণ্টনীকে জাগায়, তারপর পাকশালে এসে নিজের মনের মতন ক'রে এক একটি রান্না সারে সৌদামিনী।

এণ্টনীর আজকাল বেশ দেরী হয় খেতে শুতে। দিনে রাতে ব্যস্ত মহলা নিয়ে।

নটবর, হারু, নিতাই ইত্যাদি দলের অনেকেই সদর বাড়ীতে অধিকাংশ দিনই থেকে যায়। রাত্তে বাড়ী ফিরতে সাহস করে না। জোর মহলা চলে।

সৌদামিনীই বারণ করেছিল এণ্টনী মারফৎ—রাতেও না হয় ওরা এখানেই খাবে শোবে। কি দরকার বাপু রাত্তির ভিত্তিরে গিয়ে, শেষে যদি ঠ্যাংয়াড়ের পাল্লায় পড়ে—ওদের থাকতেই বল এ'কদিন না হয়।

এণ্টনী হেসে বলেছিল, তাই ব'লে দেবো। কিন্তু অত লোকের রান্না তুমি কি সামলাতে পারবে? শেষে অসুখ-বিসুখ বাঁধাবে একটা।

—অত নরম নয়গো বাঙালী মেয়ে, তা ছাড়া বাংলা দেশের মেয়েরা রান্না ক'রে খাওয়াতে সব সময়ই ভালবাসে।

সত্যিই তাই। এণ্টনী বিস্ময় চোখে পরিবেশনরত সৌদামিনীকে দেখে—কি আগ্রহ নিয়েই সকলকে খাওয়াচ্ছে সত্ঃ খুসী হয় মনে মনে।

হারু, নটবর, এমন কি নিতাইও সৌদামিনীর ব্যবহারে আদর-যত্নে মুগ্ধ হয়ে তারিফ করে—ঠাকুরাণী আমাদের সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণে।

এদিকে পূজোও প্রায় এসে গেল। আর কটা দিনই বা আছে: ভোরের বাতাসে শিউলি-গন্ধ পেলেই সৌদামিনীর এ কথা মনে হয়।

দালানে পটো ঠাকুর গড়ার কাজ প্রায় সম্পূর্ণ ক'রে ফেলেছে। সৌদামিনী বারে বারে তাড়া দেয় পটোকে—কবে রঙ দেবে, দোমেটে করছো তো করছোই।

আশ্বিনের ঝিকিমিকি রোদে সৌদামিনী আরো আনন্দ-চঞ্চল। এণ্টনীকেও তাড়া দেয় যখন তখন—কটা দিন আছে বলতো আর। এখনও জিনিসপত্তর কিছুই কেনা-কাটা হলো না। আমি পুরুত-মশায়কে দিয়ে ফর্দ্দ করিয়ে রেখেছি, তুমি ব্যবস্থা কর।

—হবে গো হবে, থেলো হুঁকোয় তামাক টানতে টানতে মহলা ঘরের দিকে যায় এণ্টনী।

এণ্টনীর মাথায় এখন মহা ভাবনা। প্রথম আসরে তুর্নাম না হয়ে যায়। সখের দল ব'লে তো আর লোকে ছেড়ে কথা কইবে না। তাই পরিশ্রমের অন্ত নেই। জলের মতন টাকাও খরচ হচ্ছে। ব্যবসা-বাণিজ্য এক রকম না করার মতই। সৌদামিনী বললে ও হেসে বলে, লক্ষ্মীর সঙ্গে সরস্বতীর চিরকালের বিবাদ। সরস্বতীর ভজনা করছি এখন, লক্ষ্মীর তুয়ারে হাজার বার গেলেও সে ফিরে চাইবে না।

সৌদামিনী চুপ ক'রে থাকে। কি আর বলবে, সে জানে কবি করলে আর কিছু করা সম্ভব নয়। তাই রাত্রির অন্ধকারে ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ফেলে আশঙ্কাকে তাড়াতে চেষ্টা করে—যা আছে ওর অনেক আছে। ঠিক মতন চললে চলে যাবে। কিন্তু ও যে বড় খরচে। জলের মত খরচ করে টাকাকড়ি—আবার পাশ ফিরে সৌদামিনী এণ্টনীকে জড়িয়ে আবদারের সুরে বলে, তুমি কিন্তু ইদানীং বড্ড খরচ বাড়াচ্ছো। একটু টেনে চলবে বুঝলে, লক্ষ্মী, একটু বুঝে চলো।

—বুঝি তো সব মধুমুখী। কিন্তু দল জমাতে গেলে এখন খরচ

একটু বেশীই হবে। নিজে তো এখনও গান বাঁধতে শিখিনি। একজন সরকার রাখতেই হবে।

—তা হবে, তবে ওরই মধ্যে একটু কম কর। আয় নেই। কলসীর জল গড়াতে থাকলে কতক্ষণই বা থাকে।

—তা বটেক, দেখি কি করিতে পারি। মহলা কি রকম শুনছো ?

—ভালই তো। অত ভাবনা করো না। আমি বলছি তোমার মুখের গান কালে লোকের মুখে মুখে ফিরবে। ওগো, আমি মা ভবানীর কাছে মানৎ করেছি যে তোমার গান ভালো হওয়ার জন্যে। এইজন্যেই মহা ধুমধাম ক'রে মায়ের পূজা করবো প্রতি সনে।

—জানো তো কবে আমার গান ?

—জানি গো, অষ্টমীর দিন। কিন্তু শোন বাপু, গান শেষ হলেই সোজা বাড়ী চলে আসবে। বাড়ীর প্রথম পুজো।

—তাই আসবো গো, আবেগে সৌদামিনীকে জড়িয়ে ধরে এণ্টনী বললে, আমার কি কম সাধ, আমার মধুমুখী রাঙা শাড়ী পরে ভিজে দীর্ঘকেশ এলিয়ে নথ নেড়ে পূজার আয়োজন করবে! আহা! কি অপরূপ সে দৃশ্য—আমি দেখবো সে দৃশ্য, এ সাধ আমি মনে মনে লালন করছি মধুমুখী।

—আঃ ছাড়ো না, বড্ড সুড়সুড়ি লাগে—দিন দিন বড় দুষ্টু হচ্ছো। কথা রয়েছে যে অনেক।

কিন্তু সৌদামিনীর সবকথা হারিয়ে যায় এণ্টনীর আবেগ-উষ্ণ অধর স্পর্শে।

ঢাকের বাদ্দ্যি বেজে উঠেছে আগমনীর আবাহনে। আনন্দ-মুখরিত বাংলা দেশ। ঘরে ঘরে শরৎ আলোর ঝলকানি। সবাই দুঃখের বর্ষাকে ভুলে গেছে। মৃদুমন্দ হাওয়ায় দোলায়িত হরিৎ শীষে নিটোল শিশির-মুক্তোয় প্রথম রোদ দেখে এদেশের সব মানুষই হাসে, উৎসবে মাতে।

গৌরহাটি গ্রামও উৎসবে মেতে উঠেছে। বিশেষ ক'রে এণ্টনীর বাড়ীর দুর্গা পূজার কথা লোকের মুখে মুখে ফেরে—ফিরিঙ্গী সাহেব কি ঘটা ক'রেই না ধনী হিন্দুর মতন দুর্গা পুজো করছে।

—হ্যাঁ গো, কি সুন্দর প্রতিমাই না হয়েছে ফিরিঙ্গী বাড়ীর।

—আরে সাহেবের বৌ যে হিন্দু। দেখলিনে, কেমন লালপেড়ে শাড়ী পরে পুজোর জোগাড় করছে। খাসা দেখতে কিন্তু বৌটি বাপু।

দলে দলে মেয়েপুরুষ ছেলেমেয়ের দল এণ্টনীর বাড়ীতে ঠাকুর দেখতে আসে। নানান্ মন্তব্য ফেরে লোকের মুখে মুখে।

সপ্তমী পূজার শেষে এণ্টনী সৌদামিনীর উপবাস-ক্লান্ত শুকনো মুখ দেখে বললে, বড্ড শুকিয়ে গেছো তুমি। এবার মুখে জল দাও না। পুজো তো অনেকক্ষণ হয়ে গিয়েছে।

—দাঁড়াও বাপু, লোকজন আগে প্রসাদ পাক তারপর হবেখন। আর তুমি যেন কোথাও বেরিয়ে বসো না। তোমার দেখা তো এই পেলাম। যা কাজের ভীড়, তুমি এস দেখি প্রসাদ খেয়ে যাও, এই ব'লে সৌদামিনী পাকা গিন্নীর মতন নিতম্ব দুলিয়ে গজ-গমনে ঠাকুরদালানের দিকে এগিয়ে যায়।

এণ্টনীর চোখ ফেরে না। ওর ভাল লাগে ফুল-ফল-ধূপ-ধুনোর একসঙ্গে মেশা এক গন্ধময় পরিবেশে সৌদামিনীর এই বিশেষ রূপটি। আর ভাল লাগে প্রতিমা দর্শনরত বিভিন্ন মুখ ঃ খুঁতিয়ে খুঁতিয়ে লক্ষ্য করে তাদের নতুন সজ্জা, হাসি, কথাবার্তা। ভাল লাগে ওর এই উৎসব-নেশা আর সেইসঙ্গে ভক্তিশ্রদ্ধা। কি আকুতি! মা মা ব'লে আকুল-করা ডাক—সত্যিই যেন মা ঐ মৃন্ময়ী মূর্তিতে বিরাজ করছেন! এণ্টনী দেহে মনে অদ্ভুত এক সূক্ষ্ম অনুভূতির কাঁপন অনুভব করে।

—অমন ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে কি ভাবছো? এস, জল খেয়ে যাও।

এণ্টনী চমকে ওঠে, মৃদু হেসে বলে, ভাবছি যত না, দেখছি তত। ভারী অদ্ভুত লাগছে সত্যি আজকে এই পুজোর দালান।

—ভাবনা পরে করো, এখন এস খেয়ে যাও লক্ষ্মীটি। আমার অনেক কিছু কাজ বাকী যে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমাকে আজ আটকালে চলবে না; এই যে যাই, এই ব'লে এণ্টনী ব্যস্ত হয়েই এগিয়ে যায়।

প্রভাত আলোয় সজ্জায় সুরে বাদ্যিতে মুখর অষ্টমীর দিন। এণ্টনীর ঘুম ভাঙ্গে। দেহ-মনে এক স্বপ্নমাখা অনুভূতির নতুন আস্বাদ। বিছানায় বসে তারই স্বাদ উপভোগ করে। সৌদামিনী নেই বিছানায়, কখন উঠে গিয়েছে পূজার আয়োজনে। ভারী সুন্দর মন কিন্তু সদুর —তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললে এণ্টনী। তারপর আস্তে আস্তে জানালার কাছে এলো।

বাতাসে শিউলি গন্ধ। পুলক জাগে। অদূরে শান্ত গঙ্গা। আবছা প্রভাত আলোয় কে এক মেয়ে স্নান করছে—সদু! সৌদামিনী! উচ্চকণ্ঠে চকিত ক'রে ডেকে উঠল এণ্টনী।

সৌদামিনী ত্রস্ত হয়: ভিজে কাপড় সামলে ইসারায় জানায়, কি হচ্ছে ছেলেমানুষি, লোকে কি ভাববে! কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ে সৌদামিনীর, আজ ওর দলের গান যে! আজই প্রথম আসরে "এণ্টনীর দল" ব'লে একটি নতুন কবিদল স্বীকৃতি পাবে—সৌদামিনীর মন ভরে ওঠে: এক অপূর্ব পাওয়ার আনন্দ-স্পর্শে দেহ ওর মালতীলতা—এণ্টনীকে জড়াতে ইচ্ছা করে।

—এস না তাড়াতাড়ি, কি করছো ঘাটে? এণ্টনীর ডাক শুনে সৌদামিনীর সম্বিত ফেরে। চকিতে সে মহামায়ার উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে এণ্টনীর মঙ্গল কামনায় তৎপর হয়।

ওদিকে নটবরও এসেছে সদরবাড়ী থেকে অন্দরে। রামচরণকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে, ওস্তাদ ঘুম থেকে উঠেছে কি।

—না গো, সাহেব এখনও ঘুমোচ্ছে। তা তোমাদের কি ঘুমটুম নেই। এই তো শেষ রাতে তোমাদের বাদ্দ্যি থামলো।

—ঘুমোতে পারলে তো ভাল হতো রামচরণ। কিন্তু ভাবনায় যে

আমাদের ঘুম উড়ে গেছে। তা জান তো আজ আমাদের দলের গাহনা। মানে এণ্টনী সাহেবের দলের গাহনা আছে। গর্বিত মেজাজী স্বরে ব'লে ওঠে নটবর।

—সে কি আর জানতে বাকী আছে। সাহেবের হয়েছে ভিমরতি তাই তোমাদের পোয়া বারো! ব্যবসা-বাণিজ্যিটা পর্যন্ত গোল্লায় দিলে!

—রামচরণ, ভেতর থেকে সৌদামিনীর ডাক আসে।

—ঐ আবার ঠাকুরুণ ডাকে, তুমি বসো বাপু, আমি দেখছি সাহেব উঠেছে কি না।

সত্যিই নটবরের ঘুম নেই। সাহেবকে আসরে নামিয়ে গান সুরু করতে না পারলে অন্য কিছু ভাবতে পারছে না। পরিবার কালিদাসীকেও তাই ব'লে এসেছিল পয়সা-কড়ি চাইতেই—দাঁড়া মাগী দাঁড়া, আমাদের মহরত হয়ে যাক, তারপর শুনবো।

—পেট কি শুনবে ?

—শুনবে রে শুনবে, না শোনে বাপের উঠানে হাঁটা দে।

—তা বলবিনে হতচ্ছাড়া ড্যাকরা মিন্‌সে, গাঁজা তো জুটছে! দাঁড়া না আমি দেখাচ্ছি তোকে, শুতে আসিস্‌নে একবার ঘরে, ঝাঁটা দিয়ে ঝেঁটিয়ে তোর…।

—যা যা, তোর মতন অনেক মাগী আমার পায়ে লুটোয়, তুই তো একটা পেতনী! তায় আবার বাঁজা—যা যা, কানের কাছে ম্যালা ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করিস্‌নে ঃ নটবর রেগে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছিল। তারপর সোজা গৌরহাটি।

অভাব-অনটন আছে, কিন্তু দাঁড়-কবির নেশায় নটবর মহাদেব। গাঁজার তত ভক্ত নয়। তবে নেশা আছে, কিন্তু নিতাইয়ের মত নয়। নিতাই নটবরের দু' চোখের বিষ। একেবারেই দেখতে পারে না। শুধু এণ্টনীর জন্যে কিছু একটা ক'রে ফেলে না। তা নৈলে সেদিন রূপসীর ঘরেই গলা টিপে ধরতো সে। বলে কিনা চামার, অত ঢলো না রূপসী—

শালা নাপতের বড় আস্পদ্দা হয়েছে। বেশ্যে মাগীর সামনে অপমান! একবার বাগে পাই তারপর তোমায় দেখে নেবো।

কিন্তু তা আর দেখার চেষ্টা করেনি। ভুলে গেছে নটবর সে সব মান-অপমানের কথা। কবিগানের মহলায় গাঁজার নেশার মতই বুঁদ থাকে। শুধু এক চিন্তা: সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি চাই-ই। গানকে ভাল করতেই হবে। তাই ঘুম নেই। রাতদিন স্নান-আহার ভুলে ঢোলে নানান্ বোলের রেওয়াজ করে নটবর।

এণ্টনীর ভাল লাগে। নটবরের নিষ্ঠায় মুগ্ধ হয়। সৌদামিনীকে বলে, নটবর আমাদের ভাল বাজনদার ব'লে নাম পাবে।

—তা পাবে, দিনরাত যা পরিশ্রম করছে বেচারী। আচ্ছা, ওকে বাড়ী যেতে দেখি না তো? সৌদামিনী বেশ আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞাসা করে।

—গান না হওয়া পর্যন্ত ও বাড়ী যাবে না বলেছে।

—আশ্চর্য তো। ওর বৌ তো আছে?

—আছে, তবে এমনটি নেই। সৌদামিনীর চিবুক স্পর্শ ক'রে হেসে বলে এণ্টনী।

—আঃ, কি কর! বল না গো, নটবরের বৌ ওকে কিছু বলে না?

—জানি না তো, আচ্ছা ওকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখবো।

এণ্টনী জিজ্ঞাসাও করেছিল, বাড়ীতে যাচ্ছো না নটবর, তোমার স্ত্রী ত ভাবতে পারে।

নটবর হেসে বলেছিল, ভাবনার মতন মাগী সে নয়। ঠিক আছে সে।

—না না নটবর, যাবে। মাঝে মাঝে স্ত্রীকে নিয়ে ঘরে থাকবে। মন ভাল হবে।

নটবর এ কথার উত্তরে কিছু বলেনি। তারপর তো গাহনার মহলার ব্যস্ততা। নিজেদের সম্বন্ধে ভাবনা করার অবকাশ থাকে না। কেউই ভাবে না—এণ্টনী হারু নটবর যত্তে হরিহর জগন্নাথ, এমন কি

নিতাইও না। গানের পাল্লায় ওজন বাড়াতেই হবে। রাম স্বর্ণকারের দলের সঙ্গে পাল্লা। ও দলে ভাল সরকার। ও দলের দোহাররা জোরদার। ওদের সঙ্গে পাল্লায় ভারী হবার জন্যে সবাই আপ্রাণ পরিশ্রম করে।

আজ অষ্টমী। আজই সন্ধ্যেরাতে চুঁচড়ায় গান। তাই ভোরেই নটবর ছুটে এসেছে সদরবাড়ী থেকে অন্দরে এণ্টনীর খোঁজে।

ওদিকে সৌদামিনী স্নান সেরে এলো। এণ্টনী ওর পায়ের শব্দের সঙ্গে সুরের গুণগুণানি শুনে বিছানায় চোখ বুজে ঘুমের ভান করে।

সৌদামিনী দেখে। বোঝে দুষ্টুমি। কিন্তু কিছু বলে না। আপন আমেজে গুণগুণ সুর ভাঁজতে ভাঁজতেই সৌদামিনী ভিজে কাপড় বদল করে।

এণ্টনী মিটমিটে দৃষ্টি ফেলে চায়। দেখে যেন ওর আশ মেটে না —সৌদামিনীর একরাশ ভিজে চুল তার মসৃণ পিঠের স্পর্শকাতর হয়ে নিতম্ব ছাড়িয়ে নেমে গিয়েছে হাঁটু পর্যন্ত—জাম-কালো কেশ! বিন্যাস না হলেই যেন আরো মনোময়ঃ

> বেঁধোনা সখি বেঁধোনা কেশ হায়!
> ফণিনীর ফণায় বড় ভয়,
> কুন্তল কুঞ্জ কর আমি কুঞ্জনাথ তায়॥

এণ্টনী মনে মনে বলে আর দেখে।

সৌদামিনী লক্ষ্য করে না। আপন মনে ভিজে কাপড় ছেড়ে লাল-পাড় গরদের শাড়ীটি পরিপাটী ক'রে পরে নেয়। জানলা দিয়ে কাঁচা-সোনা রোদ আসে। সৌদামিনীর সর্বাঙ্গে ঝলমল করে সে রোদ।

সৌদামিনী ঠাকুরদালানে যাবার উদ্যোগ করতেই এণ্টনী ধড়মড়িয়ে উঠে পথ আটকালো—যেও না, আরও কিছুক্ষণ থাকো। তোমাকে এ বেশে এখানে আরো একটু দেখি!

—একি, ছোঁবে নাকি! সরো সরো এখন যে···

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে এণ্টনী বললে, জানি গো জানি, ছুঁইনি, ছোঁবোও না। শুধু নয়নভোরে দেখবো।

—কি পাগলামি করো বলতো। ঘুমোও না। দুপুরে খেয়ে-দেয়েই তো বেরুবে। আজ যে তোমার গাহনা আছে।

—গাহনা আছে জানি। কিন্তু মধুমুখী এখন আমার এ মন যে তোমার কেশের গহন অরণ্যে হারিয়ে যেতে চায়। সত্যি সদু, তোমার তুলনা নেই! তুমি যে কি তাই যদি জানতে তাহলে আমার নয়নকে বঞ্চনা করার চেষ্টা করতে না।

—নিজেকে না জেনেছি ব'লেই তো তোমাকে জানি, ঠোঁট টিপে হেসে বললে সৌদামিনী।

এণ্টনী আবেশ চোখে চেয়ে হেসে বললে, তবে এ কাঙালীকে বিন্দুমাত্র ভিক্ষা দিতে কৃপণ কেন?

—বাঃ রে, কৃপণ কোথায়। তবে ভিক্ষা দেওয়ারও তো সময় অসময় আছে! এমন অসময়ে ভিক্ষা দিতে পারবো না কাঙালী ঠাকুর। অন্য সময় চেয়ে নিয়ো বকেয়া—সরস হাসিতে ভুলিয়ে সৌদামিনী বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করে।

—দাঁড়াও সখি, আমার কথাটা শুনে যাও। আমি মাধুকরী করি একই বার, একই স্থানে, একই ইচ্ছায়। এখন মনের বাসনা মনে নিয়া যাই নটবর সন্ধানে, আজ্ঞা কর মধুমুখী।

খিলখিল শব্দে হেসে উঠে সৌদামিনী কথা শুনে। তারপর হাসি থামলে বলল, বেশ কিন্তু গুছিয়ে রসালো কথা বলতে শিখেছো তুমি!

—শিখলাম তো তোমারই যত্নে সবকিছু সদু। তাই তো সবাইকে বলি তোমার তুলনা নেই—আন্তরিকতার মধুর স্পর্শ থাকে এণ্টনীর স্বরে।

সৌদামিনীর মন ভোরে ওঠে। মনে মনে ব'লে ওঠে সে, আমার জন্যে তোমার সব ছেড়ে আমার সব নিয়েছো। নিজের পরিবেশ আত্মীয়স্বজন ত্যাগ ক'রে তুমি নিজেকে সম্পূর্ণ আমার মনের মতন ক'রে সাজিয়েছো—ধীরে ধীরে একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে সৌদামিনী স্নিগ্ধ সজল চোখে চাইলো এণ্টনীর দিকে। তারপর আবেগকম্পিত মৃদু স্বরে বললে, তোমার প্রেমের তুলনা নেই গো।

—কেন, তুমি তো আছো সৌদামিনী। বরং তোমারই তুলনা মেলে না। তুমি আমার প্রেমগঙ্গা। কোথাকার এক অজ্ঞাত বিদেশী নষ্টচরিত্র গাঁজিয়ালকে ভালবেসে তোমার দেহ-মন-প্রাণ সবই দিলে। তাকে ভাবতে শেখালে নতুন ক'রে। গঙ্গার মতই তাকে তুমি বইয়ে নিয়ে গেলে রসসাগরের দিকে! সেই রসসাগরে অবগাহন ক'রে আমি ভূতভবিষ্যের চিন্তাশূন্য হই। সত্যি সত্নু, আমি অপরূপ আনন্দে সদাই মশগুল থাকি—দেখতে পাও না, বুঝতে পার না মধুমুখী! এই তো আমার প্রেমমুকুর। এই ব'লে বুকের কাছে হাত রেখে এণ্টনী ভাব-বিহ্বল স্বরে ব'লে ওঠে, এখানে তুমিই একমাত্র বস্তু। এখানে তোমাকেই আমি অর্চনা করি তোমারই দেওয়া সবকিছু দিয়ে—থরথর ক'রে কাঁপতে থাকে এণ্টনী নিজের কথার ধ্বনির সঙ্গে।

সৌদামিনীর মন ভিজে ওঠে এক অভূতপূর্ব রসসিঞ্চনে।

ঠাকুরদালানে যাবার কথা ভুলে যায় সে। কাছে এগিয়ে এসে এণ্টনীর চিবুকটি চোখের সামনে তুলে ধ'রে, অনেকক্ষণ ধরে দেখে।

কথা নেই। সব কথা থেমে শুধু দৃষ্টি-সেতুতে দুজনে চলে এক অমৃতলোকের উদ্দেশে।

তারপর অনেক সময় গেলে দুজনে দুজনার সন্ধান পায়। স্বপ্ন ভাঙ্গলে যেমন চমক লাগে তেমনি চমকে উঠে এণ্টনী সৌদামিনীকে বুকের কাছে টানলো আবেগে।

সৌদামিনী বাধা দিলো না, ঘনিষ্ঠ হয়ে এণ্টনীর গালে সোহাগ-স্পর্শ রাখে।

বাইরে থেকে ডাক আসে রামচরণের—মাঠাকৃরুণ, ঠাকুরমশায় এসেছেন।

সৌদামিনী সাড়া দেয় না। ওর সহজ হতে সময় লাগে। ধীরে ধীরে এণ্টনীর গায়ে হাত বুলিয়ে একসময় আস্তে ক'রে জিজ্ঞাসা করে, এবার আমি যাই।

কোন কথা বলে না এণ্টনী। ঘাড় নাড়ল শুধু। তারপর এক সময় নিজেই সৌদামিনীকে বাহুমুক্ত ক'রে দেয়।

—তুমি আর একটু না হয় ঘুমোও না। কত রাতে শুয়েছো তুমি, তা প্রায় ভোর-রাত্তিরে। আরো কিছুক্ষণ শুয়ে থাকো। কাজটাজ যা করার পরে করো। সৌদামিনী দাঁড়িয়ে থেকে বললে।

—না গো, ঘুমোলে চলবে না। নটবর বাইরের ঘরে বসে আছে। দেখি কি দরকার, এই ব'লে এণ্টনী ঘর থেকে বেরিয়ে যায় শান্ত পদক্ষেপ ফেলে।

হঠাৎ কেমন যেন শান্ত ধীর হয়ে গেছে—লক্ষ্য করলো সৌদামিনী।

—মাঠাকৃরুণ, রামচরণ দরজার কাছে এসে ডাকে।

—এখুনি যাচ্ছি রামচরণ। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে স্বরে ব্যস্ততা প্রকাশ ক'রে কর্মমুখর হতে চাইলো সৌদামিনী। কিন্তু কি যেন এক শান্ত সুরের আবেশে দেহমন অবশ। ব্যস্ত হতে চায় না মন।

চেষ্টা ক'রেই আবার কাপড় বদলায় সৌদামিনী। বারে বারে মনকে সজাগ করতে চেষ্টা করে—আজ মায়ের অষ্টমী পুজো, মনকে চঞ্চল করতে নেই।

আবার ডাক আসে—মাঠাকৃরুণ সময় যে বেশী নেই। পুরুত-ঠাকুর তাড়া দিচ্ছেন মা।

—আমার হয়ে গেছে রামচরণ, তুমি বল গিয়ে পুরুতমশায়কে আমি এলাম ব'লে, এই ব'লে সৌদামিনী ব্যস্ত হয়েই ঘোমটা মাথায় তুলে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

:

সন্ধ্যার আগেই ঠাকুরদালান-চত্বর লোকে লোকারণ্য। সারা চুঁচুড়ায় ফিরিঙ্গীর কবি-গাহনার কথা নানান্ রঙে লোকের মুখে মুখে ফিরছে। আশ-পাশের আট-দশ ক্রোশ দূরবর্তী গ্রামাঞ্চল থেকেও লোক আসছে কবিগান শুনতে কোঁচড়ে গুড়-মুড়ি বেঁধে।

এণ্টনী তার দলবল নিয়ে সন্ধ্যার মুখে চুঁচুড়ার ষণ্ডেশ্বরতলায় ঠাকুরবাড়ীতে এসে পৌঁছালো। নটবর, নিতাই, হারু, কালীপদ, সত্তের মুখেচোখে আসন্ন আসরের চিন্তা।

এণ্টনী গাড়ী থেকে নামতেই উপস্থিত ভদ্রাভদ্র বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে থাকল। ভাবটা, এই কুর্ত্তা-পাতলুন-পরা খাস সাহেব কবি-গাহনা করবে কি ক'রে! একি, ইয়ারকি নাকি!—খানিকটা নিরাশা খানিকটা বিদ্রূপী মনে টীকাটিপ্পুনী কাটে। ছেলেরা উঁকিঝুঁকি দেয়। হাততালি হাসিতে পুজোবাড়ীর সং মনে ক'রে আনন্দ পায়।

এণ্টনীর দলকে তাদের জন্য নির্দিষ্ট বিশ্রাম স্থানে নিয়ে গিয়ে খাতির ক'রে বসালেন গৃহস্বামী। হাতমুখ ধোবার জল, তামাক আর জলখাবারের ব্যবস্থাও যথাযথ করলেন।

কিন্তু এণ্টনীর মুখে হাসি নেই। কেমন যেন গম্ভীর, কেমন যেন নিশ্চুপ।

সরকার গোরক্ষনাথ তামাকের ব্যবস্থা করতে করতে বললে, রামসুন্দর তো এসেছে, একবার দেখা ক'রে আসি কি বল সাহেব? কি গাওনা হবে, কি রকম কি করবে; তা তুমিও চল না, ঐ তো পাশের ঘরে তামাক টানছে।

—বেশ তো চল, ধীর স্বরে বলল এণ্টনী।

—বিরহ যদি গায় ভালই হয়, আমরাও জমিয়ে দেবো। আমার বাঁধন আর তোমার হাতযশ—যেতে যেতে বলল গোরক্ষনাথ।

গান বাঁধার ব্যাপারে গোরক্ষনাথ অদ্বিতীয়। নাম-করা বাঁধনদার ব'লে সব কবির দলই ওকে মোটামুটিভাবে জানে।

গান হবার আগে দুই কবিদলের সরকার এবং ওস্তাদরা গানের ধারা, উত্তর-প্রত্যুত্তর সম্পর্কে মোটামুটিভাবে বোঝাপড়া ক'রে নেয়—এণ্টনীও জানে একথা। তবু প্রথম আসর, তাই যেন সঙ্কোচ।

গোরক্ষনাথ ঝানু লোক। কবিগানে সরকারী অনেক দিনই করছে। এণ্টনীর হাবভাব দেখে আশ্বাস দিয়ে বললে,—ভাবছ কেন সাহেব, গান আমাদের ভাল হবেই হবে। এখন দেখি না হাওয়া কি ওদের।

রাম স্বর্ণকারের দলের লোক খানিকটা অবাক হয়েই এণ্টনীর

দিকে চেয়ে থাকলো ঃ খাস সাহেব যে? এই কি কবি করবে নাকি!

—এই যে রামবাবু, আপনার সঙ্গে আমাদের সাহেবের আলাপ করিয়ে দিই।

—আসুন আসুন, কৃতাঞ্জলি সহযোগ অভ্যর্থনা করল রাম স্বর্ণকার।

এণ্টনী সহাস্যে নমস্কারান্তে বলল, আজ আমার অতীব সৌভাগ্য যে আপনার মত কবির সঙ্গে গান করতে পারছি।

—আমারও কি কম সৌভাগ্য আজ, আপনি ত আমাদের রীতিমত বিস্ময়! আপনার কাব্যপ্রীতি আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করে। ঈশ্বর আপনাকে যশে রসে পূর্ণ করুন, রাম স্বর্ণকার বিনয়-রসে সিক্ত ক'রে কথাগুলো বললে।

এণ্টনী করজোড়ে নমনীত স্বরে বললে, আপনাদের মত গুণীজনের সঙ্গ পেয়েই আমি ধন্য হবো।

—তা রামবাবু কী গাইবেন? মালসী না বিরহ? গোরক্ষ জিজ্ঞেস করে।

—শ্রোতাগুণে, বুঝলে গোরক্ষ সরকার শ্রোতাগুণে। রাজ-কিশোরের সঙ্গে পাণ্টা ত তোমার করাই আছে।

—তবু মহাশয়ের ইচ্ছাটি কি অধম জানলে একটু নিশ্চিন্ত হয়ে তামাকু সেবন করতে পারে।

—আপনার ইচ্ছা কি এণ্টনী সাহেব?

—আপনি যেমন ইচ্ছা করবেন। আপনি অগ্রজ, আপনার বিধিই শিরোধার্য। বিনীত সংবেদন থাকে এণ্টনীর স্বরে।

রাম স্বর্ণকার মুগ্ধ হয়। কিছুক্ষণ চুপচাপ চেয়ে থাকে এণ্টনীর দিকে। তারপর বলে, বিরহ হলে জমবে, কি বলেন?

এণ্টনী শান্ত হাসি হেসে বলে, রস বিরহেই, মিলনে রস সাঙ্গ।

—বাহবা! বাহবা! রাম স্বর্ণকার তারিফ ক'রে এণ্টনীর কাঁধে মৃদু চাপ দিয়ে আবার বললে, আপনার মন্তব্যে আমি সত্যিই মুগ্ধ ও প্রীত হলাম।

এণ্টনী হেসে বললে, আমার সৌভাগ্য।

—আসুন, একটু তামাকু ইচ্ছা হোক।

—বিলক্ষণ, দিন। তবে আপনাদের বিশ্রামের কোন বিঘ্ন হবে নাতো ?

—না না, সে কি কথা! ওরে একটা হুঁকো দিয়ে যা।

একটি লোক একটা কড়ি-বাঁধা হুঁকো নিয়ে এলো। রাম স্বর্ণকার তার নিজের হুঁকো থেকে কল্কেটা খুলে এণ্টনীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, আসুন।

এণ্টনী কল্কেটা হাতে নিয়ে দু-একটা ফুৎকার দিয়ে নলচেতে কল্কেটা বসিয়ে দিলে, তারপর মৃদুমন্দ টানে তামাকী মেজাজে চোখ বুজে স্বর্ণকারের কথা শোনার প্রত্যাশায় থাকল।

রাম স্বর্ণকার খানিকটা বিস্ময় খানিকটা কৌতূহলে এণ্টনীর হাবভাব, তামাক টানা ইত্যাদি নজর করতে থাকে দলের অন্য সকলের মত।

গোরক্ষনাথ কথা জোগালে, বললে—সাহেব আমাদের এখন থেকে শুধু কবিগান ক'রেই সময় কাটাবেন। অবশ্য সখের দলই থাকবে আমাদের।

—তাই নাকি! বেশ বেশ, অতীব সুখের কথা। আমাদেরই লাভ দল বাড়লেই। গানের নিত্য নূতন পাল্লা হলে শ্রোতারাও রস পায়, আনন্দ পায়। কি বলেন এণ্টনী সাহেব ?

—তা তো বটেই, পাঁচজন রসে না মজ্‌লে কি গান বলা যায়! শ্রোতা হাসবে, কাঁদবে, জ্বালায় জ্বলবে, আবার রসিক নাগরের কল্পনায় নিজেকে ডুবিয়ে দেবে—তবেই ত গান। কি বলেন স্বর্ণকার মহাশয় ?

—যথার্থই। গান মাত্রই তো আর গান হয় না। সুরে ভাবে ভাষায় এক ক'রে প্রকাশক যেমনধারা প্রকাশ করবে তেমনিভাবে শ্রোতা গ্রহণ করবে। বেশী জ্বাল দিলে দুধ ক্ষীর না হয়ে পোড়া চাঁচিতো হতে পারে! কি বলুন এণ্টনী সাহেব ?

—বিলক্ষণ, যেমন ধরুন অম্লরসের তারতম্যে দুগ্ধ দধি ও ছানা উভয় রূপ পরিগ্রহ করে।

—বলিহারি! আপনি দেখছি ভাবটি ঠিক ধরেছেন।

—যৎসামান্য, তাও আপনাদের মত অগ্রজদের আশীর্বাদেই।

—যাক্, আলাপ যখন হ'ল তখন ভবিষ্যতেও দেখা-সাক্ষাৎ ঘটবে এবং তখন এই রস-চাতককে রস-সলিলে ভাসিয়ে যদি রসাতলে পাঠাতে পারেন তবেই আনন্দ পাবো।

—রসাতলে কে যাবে তা নির্ভর করবে সাহেব রস-বারির আধিক্যে। আমি রস-বর্ষণ যদি না করতে পারি, তা হলে রসবারি বর্ষণ তুমিই করো। আর সেই বর্ষণে তল যদি না পাই তাহলে রসানন্দেই ডুব্‌বো।

—আমার উপর আপনার এই কৃপার কথা চিরকাল স্মরণ করবো, এখন যদি অনুমতি করেন তা হ'লে পোশাক-টোশাকগুলি বদল করি।

—নিশ্চয় নিশ্চয় আপনি আসুন, একটু বিশ্রামও নিন। আসরের দেরীও আছে।

—আসি এখন, নমস্কার। এস গোরক্ষনাথ।

এন্টনী ঘর ছেড়ে নিজের দলের ডেরার দিকে এগিয়ে যায়।

আলোয় আলো ঠিক্‌রচ্ছে। ঝাড়লণ্ঠন, মশাল ইত্যাদির আলোতে চারদিক জ্বল্‌জ্বল্ করছে। ঠাকুরদালান-চত্বর লোকে লোকারণ্য। তিল ধারণের স্থান নেই। এত লোক গত বছর গানের সময় হয়নি। সবাই উৎসুক। সাহেব কবিয়ালের দিকে নজর। এন্টনীর বাচন-ভঙ্গি, সুর ও দেহভঙ্গিমাকে দর্শক অভিনন্দন জানায়—বাহ্‌বা, এই-তো চাই, যোগ্য উত্তর হয়েছে পাল্টিতে।

—খাসা মানিয়েছে কিন্তু ভাই ধুতি-চাদরে এন্টুনী ফিরিঙ্গীকে!

নটবরের ভয় কেটে গেছে। ঢোলে যেন বোলের খই ফুটছে। এন্টনী হাতে তাল দিয়ে হেলেদুলে নেচে বাহবা ব'লে তারিফ করে নটবরকে।

গান বেশ জমে গেছে। শ্রোতারা দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে তা নজর করলো এণ্টনী একটু গোল উঠতেই। ভারী আর একটা গোল উঠে বন্ধ ক'রে দিলে সোরগোলটা—চুপ চুপ, মেরে ঠাণ্ডা ক'রে দেব গোল উঠলে।

এণ্টনী বেশ নিশ্চিন্ত হয়েই তার জবাব দিলে। তারপর রাম স্বর্ণকারকে আহ্বান ক'রে আসর থেকে বেরিয়ে আস্তানার দিকে এলো। নটবর ঢোল নামিয়ে দ্রুত পিছু নিল এণ্টনীর।

—একটু মৌজ-এর দরকার। ওস্তাদ খুব গেয়েছে। এক ছিলিম বানিয়ে দিয়ে আসি—যেতে যেতে হারুকে বলে নটবর।

রাম স্বর্ণকারের ঢুলি বাজনা আরম্ভ করেছে। শ্রোতারা কেউ জল খেতে, কেউ পান খেতে, কেউ বা ধূমপান করতে ওঠে। কথা ভাসে। গুঞ্জন ওঠে পক্ষ-বিপক্ষের সমর্থন-অসমর্থনের।

—কি গাহনাই না করছে আমাদের এণ্টনী ফিরিঙ্গী, কি এলেম! হাঁ, বাপের বেটার মত লড়ছে বটে।

—ওকে লড়া বলে না, ধার নেই ভার আছে। বিদেশী ব'লেই নজর পড়েছে।

—তা তো বল্‌বিই রে লগন চাঁদার ব্যাটা! যারে দেখতে নারি তার চলন তো বাঁকা লাগ্‌বেই রে! অমন সুরেলা গলা—চড়া যেমন খাদও তেমনি। আর গানগুলোর উচ্চারণ, গাইবার ঢঙ্ঃ এ সব কি ভার! ধার নেই নাকি?

—তবু রাম স্যাক্‌রার কাছে ফিরিঙ্গী কবি শিশু বলতে হবে।

—মেলা বাজে কপ্‌চে আর বিদ্যে জাহির করতে হবেনি চাঁদ।

—লগন চাঁদার ব্যাটা বাপের ভাগ্যি নিয়ে সরে পড়, নইলে—

—কি, মার্‌বে নাকি!

—কি হলো হে গুরুচরণ? আর একজন এসে যোগ দেয়। সঙ্গে সঙ্গে আরও পাঁচজন ঘিরে গুলতন্ পাকায়। তারপর হাতাহাতিও হয় রাম স্বর্ণকার আর এণ্টনীর পক্ষ-বিপক্ষের মধ্যে।

নির্ঝঞ্ঝাট নির্বিরোধ রসিকজন বিরক্ত হয়। কেউ কেউ মন্তব্য করে—গান ত শুনবে না, খালি ঝগড়া আর মারামারি—আসরটা মাটি না করে বে-রসিকগুলো!

রাম স্বর্ণকার গান ধরেছে। উচ্চ কণ্ঠ সকলকে সচকিত করে। রসিকজন যে যেখানে পারে আসন সংগ্রহ ক'রে বসে পড়ে। ছুৎমার্গী কুঁদুলেরা আসন নিয়ে নিচু স্বরে কোঁদল করতে থাকে।

রাম স্বর্ণকার গেয়ে চলে—

মহড়া	আশা বাক্যে পদাঙ্ক বাঁচে আর কি শ্রীরাধার প্রাণ;
করে গুন্ গুন্ স্বর মধুকর কোকিলের কুহু স্বর
হানে আবার তায় পঞ্চস্বর, পঞ্চবাণ।

চিতেন	কথাতে প্রবোধ না মানে, হয়েছি অধৈর্য সবাই।

পরচিতেন	এলো ব্রজেতে ঋতুরাজ, এ সময়
ব্রজরাজ, সুখের ব্রজধামে নাই।

ফুকা	তুমি ত সেই শ্যামের শ্রীচরণ-চিহ্ন, জানত সব
গোপীর অনন্য গতি কৃষ্ণ ভিন্ন।

মেলতা (১)	পড়ে গোকুলবাসী অকূলে, ডাকে কৃষ্ণ ব'লে
তাতে নয়নের জলে ভাসিছে বয়ান।

খাদ	এ জ্বালা কৃষ্ণ বিনে কে করে নির্ব্বাণ।

ফুকা (২)	যদি হও রাধার পক্ষে স্বাপক্ষ হে তুমি,
এনে দাও গোকুলে, সাধের গোকুলস্বামী।

মেলতা (২)	গেছে লো অনেকবার, অনেকজন,
আস্তে সেই কৃষ্ণধন সকলে হয়ে এসে অপমান।

ঢোলের বোলের সঙ্গে রামসুন্দরের দোহাররা দ্বিতীয় মেলতা শেষ করলে নটবর আর দেরী করে না, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দ্রুত ও জোরে ঢোলে বোল তুলে এণ্টনী ফিরিঙ্গীর কবি-দলের উপযুক্ত অস্তিত্ব ঘোষণায় তৎপর হল।

এণ্টনী চাদর দিয়ে কপালের ঘাম মুছে তালে তালে ঘাড় দুলিয়ে আসরে এলো।

চত্বরের শ্রোতাদের কাছ থেকে এণ্টনীর সমর্থকরা উল্লাস ক'রে ওঠে—সাহেব এসে গেছে !

—মোক্ষম সুরের জবাব চাই কিন্তু !

এণ্টনী স্মিত হেসে মাথা নুইয়ে শ্রোতাদের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে নটবরকে ইসারা করল ; আরো একটু দ্রুত, একটু মেজাজ দিয়ে ছন্দ কর হে।

গোরক্ষনাথ এগিয়ে এসে এণ্টনীর কানে কানে বললে, সব ঠিক আছে তো ?

—আছে, এণ্টনী ঘাড় নেড়ে জানালে, তারপর দোহারদের দিকে ফিরে ইসারায় সুর ধরতে বললে।

কিছুক্ষণ পর এণ্টনী ললিত ভঙ্গিমায় গানের মহড়া ধরলে—

ভাগ্যে যা আছে তাই হবে সই ; এখন কি হবে ব্যাকুল হলে,
এখন ভ্রান্তি পরিহরি বাঁচাও সই কিশোরী, হরিমন্ত্র শুনাও প্যারীর শ্রবণমূলে।

শ্রোতারা আনন্দে কেউ হাততালি, কেউ উল্লাস-ধ্বনি, কেউ বা মন্তব্য ক'রে ওঠে—রাম স্যাকরার গলা এণ্টনীর গলার এক কড়াও নয়।

কেউ বা বিদ্রূপ ক'রে ব'লে ওঠে—গলাতে কি দুধের শলতে আট্‌কি গিয়েছে নাকি—চোপ্‌সানি স্বর কেন গো সাহেবের পো !

শ্রোতাদের মন্তব্যে শ্রোতারাই রেগে ধমকে ওঠে—চোপরাও বেল্লিক, হালালপনার স্থান এটি নয়।

—বড্ড গোল হচ্ছে, আস্তে আস্তে !

—মহাজ্বালা দেখছি, শুনতে দেবে, না উঠে যাবো, যত সব···হুঁ।

নানান্‌ মন্তব্য, টিকা-টিপ্পনীর মাঝে এণ্টনী মহড়ার শেষ কলি আবার গেয়ে উঠ্‌ল উচ্চ কণ্ঠে—

এখন ভ্রান্তি পরিহরি বাঁচাও সই কিশোরী,
হরিমন্ত্র শোনাও প্যারীর শ্রবণমূলে।

তারপর চিতেন গাইতে থাকে এণ্টনী—

গিয়েছেন মধুপুরে—শ্রীকৃষ্ণ ত্যজিয়া শ্রীবৃন্দারণ্য

দোহাররা সুর রাখে শ্রীবৃন্দারণ্য শব্দের সঙ্গে। এণ্টনী মেজাজে হাত নেড়ে পরচিতেন গেয়ে ওঠে—

কারে বল সই শুনতে রাধার যন্ত্রণা, ও যে শ্যাম চরণ-চিহ্ন।

তারপর ফুকায় সুরের ওঠানামায় গেয়ে চলে এণ্টনী—

সখি, ঐ যার পদচিহ্ন, সেই মাধব যখন দুখ বুঝলে না
অরণ্যে রোদন করিলে এখন, ঘুচবে না মনের বেদনা।

পরে মেলতায় ধরে—

রাধার সুখের ত কপাল নয়, তা হলে কি এমন দশা হয়?
কাঁদে কৃষ্ণহীন হয়ে রাধে, পড়ে ভূতলে।

দোহাররাও এণ্টনীর সঙ্গে মেলতা তেহাই-এর সঙ্গে শেষ করে। এণ্টনী ধীর স্বরে খাদে গান ধরে—

কেন ব্রজধাম ত্যজে যাবেন শ্যাম,
রাধার দুঃখের কপাল না হলে।

এরপর দ্বিতীয় ফুকার সুরে শ্রোতারা মোহিত হয়ে একাগ্রচিত্তে এণ্টনীর গান শোনে—

মনে জ্ঞান হয় জন্মান্তরে, আমরা কৃষ্ণ হরি সখি নিছিলাম কার।
বুঝি সেই পাপে এ মনস্তাপে দহিল প্রাণ গোপিকার।

—বেড়ে ভাই! শ্রোতা উল্লাসে চিৎকার ক'রে ওঠে।

নটবর উৎসাহে ঢোলে ছন্দ খেলায় মত্ত হয়। এণ্টনী ঘাড় দুলিয়ে তালে তালে তালি দেয়। আসরে ঢোলের তাকুড়নাকুড় শব্দ আর এণ্টনীর তালি ছাড়া আর কোন আওয়াজ পাওয়া যায় না। শ্রোতারা নিশ্চুপ হয়ে নটবরের বাজনা শোনে।

নটবর তেহাই শেষ করলে এণ্টনী দ্বিতীয় মেলতা ধরে—

নহিলে যার নামে বিপদ যায়, প্রাণ সঁপে সেই শ্যামের পায়,
রাধার প্রাণ যায়, গোকুল ভাসে দুঃখ সলিলে।

দোহাররা উচ্চস্বরে এণ্টনীর সঙ্গে গলা মেলায়—গোকুল ভাসে দুঃখ সলিলে।

নবমীর ভোর। গানশেষে আনন্দমুখর মন এণ্টনীর। হেসে নটবরকে বললে, চল হে, গৃহিণী পথ চেয়ে, হয়ত বা উপবাস ক'রেই বসে আছে। আর দেরী নয়। তা, তুমি কি চন্দননগরে ফিরবে, না আমার ওখানে যাব?

নটবর মাথা চুলকে বললে, বাড়ীই যাই। কি জানি মাগীটা কি করছে!

এণ্টনী হেসে পিঠ থাবড়ে বললে, হ্যাঁ হ্যাঁ বাড়ীই যাও। বৌকে ঢোলের বাদ্দ্যি না শোনাও মনের তাল যাতে থাকে তার খোরাক দিও বাপু। আর এই নাও এই মুদ্রাগুলি রাখো দেখি। বৌকে কিছু দিও—এণ্টনী নটবরের হাতে টাকাগুলি গুঁজে আবার বললে, আমার গাড়ীতেই জিনিসপত্তরগুলি তুলতে বল। আমি গোরক্ষ সরকারকে বিদেয় দিয়ে আসি, এই ব'লে এণ্টনী গোরক্ষনাথকে খুঁজতে যায়।

রাম স্বর্ণকার যাবার উদ্যোগ আয়োজনের ফাঁকে গোরক্ষনাথের সঙ্গে নতুন গানের বাঁধন প্রসঙ্গে দু'চারটি প্রয়োজনীয় কথা ব'লে নিচ্ছিল; এণ্টনীকে আসতে দেখে রাম স্বর্ণকার উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে, অপূর্ব গান হয়েছে কিন্তু আপনার! বিশেষ ক'রে আপনার কণ্ঠে সুরের বিস্তারগুলি ভারী সুন্দর। কলকাতায় আসুন, কবে আসছেন?

এণ্টনী হেসে বললে, দেখি বায়নার কি হয়।

—আরে বায়নার জন্যে ভাবছেন কেন, কবে আসছেন বলুন। বায়নার কথাই ত বলছিলাম গোরক্ষকে। সামনের রাসে আসুন, অনেক আসর হবে। ঠিকানা নিয়েছি গোরক্ষনাথের কাছ থেকে, খবর জানবো।

—আপনার মোকামটি যদি দয়া ক'রে জানান।

—বিলক্ষণ, জানাবো বই কি। আমি থাকি বৌবাজার হাড়কাটা গলিতে। ওখানে মেয়ে মদ্দা যাকে বলবেন, দেখিয়ে দেবে আমার বাসাটা। বেশ আছি মশায়; কামিনী-কাঞ্চনের বাহার চৌদিকে, তারই মধ্যে আমি ভাবের হেঁসেল খুলেছি। আসুন না, হেসে বললে রাম স্বর্ণকার।

—বেশ তো, সামনের রাসেই যাবো কলকাতায়। এখন যদি অনুমতি করেন তা' হলে বিদায় নিই।

—হাঁ আসুন, আমাকেও নৌকায় উঠতে হবে এখুনি, ভাঁটা থাকতে থাকতে এগোলে তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারবো।

—তা চললাম, নমস্কার। এস গোরক্ষ সরকার, এই ব'লে এণ্টনী রাম স্বর্ণকারের আস্তানা থেকে বেরিয়ে এলো। তারপর গোরক্ষনাথের কাছে এসে বলে, এই পনেরোটি মুদ্রা রাখো।

—আরো কিছু যে দরকার ছিল সাহেব।

—দু'দিন বাদে কিংবা আজ যদি সঙ্গে চল গৌরহাটি, তা হলে দিয়ে দেবো। কাছে তো আর নেই। সকলকে কিছু কিছু দিলাম কিনা, ফুরিয়ে গেছে, হেসে বলে এণ্টনী।

—বেশ, দিন কয়েক বাদে যাবো, অন্য একখানে বরাত আছে দু'দিন। হাঁ ভাল কথা, রাসে কলকাতায় যাচ্ছো তো ঠিক?

এণ্টনী ঘাড় নেড়ে বললে, তা যাচ্ছি। তুমি এস না তোমার বরাত সেরে; গৌরহাটিতেই কথাবার্তা হবে। এখন চল্লুম, গৃহে না ফিরলে গৃহিণী বড় উষ্মা প্রকাশ করবে, পূজো ত...

—হ্যাঁ হ্যাঁ, বিশ্রামেরও তো প্রয়োজন। কম পরিশ্রম তো হয়নি তোমার। তুমি আর দেরী করো না সাহেব। আমি দিন কয়েকের মধ্যেই তোমার ওখানে যাচ্ছি।

—তাই এস, এই ব'লে এণ্টনী গাড়ীর সন্ধানে রাস্তার দিকে এগিয়ে যায়।

গৌরহাটি পৌঁছতে বেশ বেলাই হল। নবমী পূজা সাঙ্গ। সৌদামিনী এণ্টনীর আগমন প্রত্যাশায় অধীর; গাড়ী বাগানে ঢুকতেই উৎসুক হয়েই লাজ-লজ্জা ভুলে ছুটে গেল ও।

এণ্টনীর দেহ শ্রান্ত, কিন্তু মন জীয়ন্ত। হাসি দিয়ে স্বাগত ক'রে সৌদামিনীকে বললে, জয় ক'রেই ফিরছি সখী, তোমার বাসনা পূর্ণ করি, নিজ ভাগ্য ধন্য করি, আসিয়াছি আমি তব প্রেম-প্রিয়াসী।

—রঙ্গ রাখো, কি রকম গান করলে, লোকে কি বললে, কেমন নিলে—এ সব পরে শুনবো। এখন নেমে এস। বেলা অনেক হয়েছে! পোশাক ছেড়ে আগে ঠাণ্ডা হও, মুখে কিছু দাও তারপর শুনবো সব। আর—এই ব'লে সৌদামিনী একটু চুপ ক'রে ঠোঁটে হাসির সরস ঝিলিক দিয়ে বললে, জয়মাল্য আমি গেঁথে রেখেছি তাও দেবো তোমার গলে। এস নেমে এস।

এণ্টনী গাড়ী থেকে নামে, তারপর মৃদু হাসির রেশ রেখে আলতো স্বরে বললে, তোমার মুখ না দেখলে কিছুই ভাল লাগে না সুধামুখী। তোমাকে ছেড়ে কি ক'রে যে কলকাতায় যাবো! এখন ভাবতেও মন খারাপ লাগছে। অথচ কলকাতায় না গেলে দাঁড়াকবি হিসাবে সমঝদাররা মানবে কি, সবাই ত কলকাতায় ছুটছে, সেখানে রাজা-মহারাজারাই দাঁড়াকবিদের ছুটিয়ে নিয়ে চলেছেন। কি যে করি! দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে আয়ত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সৌদামিনীর দিকে এণ্টনী।

—যাবে বইকি, তোমাকে গানের জন্য সব স্থানেই যে যেতে হবে। এই বঙ্গদেশের সকল অঞ্চলের ভদ্রাভদ্র তোমাকে জানবে দাঁড়াকবি ব'লে—ওই তো আমার পরম চাওয়া! ওগো, আমার যে কি আনন্দ হবে কি ক'রে বোঝাবো তোমায়, যখন তোমার কবি-খ্যাতি লোকের মুখে মুখে ফিরবে! এস লক্ষ্মীটি, ভেতরে চল, মায়ের পূজা হয়ে গিয়েছে, পোশাক বদলিয়ে মুখহাত ধুয়ে কিছু খাবে চল—সৌদামিনী দরদ-ঢালা আনন্দ-চঞ্চল স্বরে বললে।

—চল, এই ব'লে এণ্টনী এগোতে এগোতে বললে, একটা কথা, কলকাতায় যদি বেশী দিন থাকতে হয়?

—থাকতে হয় থাকবে, হেসে বল্লে সৌদামিনী।

—তুমি যাবে তো? তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারবো না।

—বেশ তো তাই যাবো গো, আমারই কি ইচ্ছে করে তোমাকে ছেড়ে থাকতে—এই দেখো না, মাত্র একটা রাত বাইরে ছিলে তো, রাত আমার আর কাটতেই চায় না, সারা রাত ভেবে ভেবে কেটে গেছে।

—কি আশ্চর্য দেখ সৌদামিনী, তোমার ভাবনা আমার, আর

আমার ভাবনা তোমার, কি বিচিত্রই না মনের এই লীলা—ভাবতে ভাবতে সময় সময় বিস্ময় লাগে আমার।

—ওগো, এই হচ্ছে সংসারের নিয়ম। ঈশ্বর মানুষকে এই বন্ধন দিয়েই ত তাদের সংসারকে সুন্দর সুখের ক'রে তুলেছেন। তাই দেখ না এত মায়া, এত মমতা, এত আনন্দ। অজ্ঞান শিশুও হাসে দেখ না তাই কেমন মায়ের কোলের মধ্যে!

শিশু! এণ্টনী চকিতে অন্যমনা হয়ে যায়।

সৌদামিনীও কেমন যেন মিইয়ে যায়। হঠাৎ একটা শিশুমুখ!—মনের মধ্যে গুঞ্জন ওঠে—যদি কোল-আলো-করা একটি শিশু থাকতো তা'হলে···দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নীরবে এগিয়ে আসে সৌদামিনী।

এণ্টনীও আর একটি কথাও বললে না বাইরে। ঘরে এসে আরাম কেদারায় বসে বসে কি যেন ভাবে, তারপর পোশাক বদলায়। মুখহাত ধোয়।

ইতিমধ্যে সৌদামিনী এণ্টনীর জন্য মিষ্টান্ন, ফল ইত্যাদি সাজিয়ে পাথরের থালাটি নিয়ে ঘরে এসে বললে, মুখহাত ধুয়েছো তো?

—হ্যাঁ, এই ব'লে এণ্টনী সৌদামিনীর দিকে চেয়ে থাকলো এক-দৃষ্টে। তারপর এক সময় প্রশান্ত হাসি হেসে বললে, আচ্ছা সৌদামিনী, আমাদের যদি একটি সন্তান হয়, তা হলে বেশ হ'ত।

সৌদামিনী হেঁট হয়ে জলচৌকিতে থালাটি রাখছিল, বেশ কয়েকটি মুহূর্ত কেটে গেল মুখ তুলতে ওর।

এণ্টনী আবার জিজ্ঞাসা করে, বল না সুধামুখী, একটি সন্তান হলে বেশ হ'ত না?

এবার চকিতে মুখ তোলে সৌদামিনী, তারপর বললে, কি হলে ভাল হয় না হয় সে সব পরে ভেবো। এখন এস খেতে বস। আমি জল নিয়ে আসছি—কথা শেষে দাঁড়ায় না সৌদামিনী।

এণ্টনী বুঝলো এড়িয়ে গেল সৌদামিনী। কিন্তু কেন, দুঃখ পেয়ে কি? হয়তবা, না ও কথা না বললেই ভাল ছিল—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আহারে মন দেয় এণ্টনী।

সৌদামিনী কথাটা এড়িয়ে যায়নি। রাতে এণ্টনীর মুখে তার কবি-গানের আসরের ঘটনাবলী শুনে আনন্দ-মুখর হয়ে ব'লে উঠল, তুমি কবি, নতুন নতুন ভাবে কত কি বানাবে। ভাবে সুরে দেশের লোকেরা তোমাকে স্মরণ করবে। তোমার সৃষ্টির মধ্যেই তুমি চিরদিন ধরা থাকবে গো—জনশ্রুতি কালের পর কাল তোমাকে বাঁচিয়ে রাখবে। নাই বা হ'ল আমাদের ছেলেপুলে, এই ব'লে সৌদামিনী নিবিড় বাহুবন্ধনে জড়িয়ে ধরে এণ্টনীকে।

এণ্টনী কথা বলে না, সৌদামিনীর বাহুবন্ধনে শিশুর মতই স্থির হয়ে শোনে।

সৌদামিনী উচ্ছল স্বরে বলে, কিছু বলছো না যে ?

এণ্টনী এবার ধীরে ধীরে বলে, জানো দামিনী, চুঁচুড়া থেকে ফেরার পথে দেখলাম এক বাড়ীর দোরে একটি মাকে ! কি নিবিড় স্নেহের বন্ধনেই না তার শিশুপুত্রটিকে বুকে জড়িয়ে আমার গাড়ীটিকে দেখাচ্ছে পরম নির্ভয়ে। কোন ভয় নেই, লজ্জা নেই। আগে তো, আর আগেই বা কেন, এখনও পাতলুন পরে গাড়ী ক'রে রাস্তা দিয়ে গেলে তোমাদের গেরস্থ বৌ-ঝিরা দোরের পাশে লুকিয়ে পড়ে। কিন্তু মাতৃ-স্নেহের দাবী মেটাতে এমন ভয়শূন্য মূর্তি আগে দেখিনি। আমার ঐ সুন্দর দৃশ্য এত ভাল লেগেছিল কি বলবো সৌদামিনী ! সারা পথটায় ঐ মাতৃমূর্তি চোখের সামনে ভেসে উঠেছে, কখনও মা যশোদার কথা মনে হয়েছে, কখনও মেরী মায়ের কথা মনে হয়েছে। তারপর বাড়ীতে ঢুকতেই তোমার আনন্দ-মুখর মুখ দেখে মনে হয়েছিল, তোমার যদি একটি শিশু থাকতো। যদি তুমি তাকে বুকে জড়িয়ে আমার অপেক্ষা করতে—কি অপূর্ব কি মনোহরই না হতো ! জানো দামিনী, পুজোর ক'দিনে যখন তুমি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের প্রসাদ দিতে দিতে হাসতে বোক্‌তে তখন আমার মনে হতো, তুমি যদি সত্যি সত্যি মা হতে—আবেগে কাঁপতে কাঁপতে এণ্টনী মুখ ঢাকে সৌদামিনীর বুকের মধ্যে।

তারপর আবেগ তুফানে কথা হারায়। শুধু অনুভব। সৌদামিনী কিছু যেন বলতে যায়। কিন্তু এণ্টনীর আকুল দেহমন কিছু শোনে না।

শুধু সৃষ্টি-পাগল এক অনুভূতির তীব্রতেজ বিক্ষোভচিহ্ন রাখে সৌদামিনীর দেহের সর্বাঙ্গে।

সে রাতের পর এণ্টনী আর বলেনি সৌদামিনীকে সন্তানকামনার কথা। কোন ইঙ্গিতও না। সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছে নিজের দলের দিকে। মহলার কামাই নেই।

গোরক্ষনাথ যোগীকে প্রায় আসতে হচ্ছে মহলায়। সামনের রাসে কলকাতায় যাবে দল। মাঝে কিছুদিন ঘুরেও এলো গোরক্ষনাথ কলকাতা থেকে।

এবার কলকাতায় পাল্লা দিতে হবে নীলুঠাকুরের দলের সঙ্গে। তারপর একে একে ভোলানাথ মোদক, গুরো, বলরাম বৈষ্ণব, ঠাকুর সিংহ, রাম বসু ইত্যাদির সঙ্গে পাল্লা—এণ্টনী ধীরে ধীরে তৈয়ারী হচ্ছে। নিজেও গান বাঁধবার চেষ্টা করছে। সৌদামিনীকে শুনিয়েছে। নটবর, হারুরাও কিছু কিছু শুনেছে। তারিফও করেছে—খাসা হয়েছে পদটি তোমার ওস্তাদ!

এণ্টনী তারিফে মজে না, বরং উৎসাহ পায়। নতুন নতুন সৃষ্টির নেশা ধরে—ভবানীবিষয়ক, সখীসংবাদ, বিরহ, মাথুর, গোষ্ঠ সঙ্গীতের পাকা ভাণ্ডারী হতে চায়।

আর সৌদামিনী ছায়ার মতই এণ্টনীকে ঢেকে রাখে। আঁচ না লাগে ঘরে-বাইরে। পুষ্ট হোক। তাই ব্যবসা-বাণিজ্যে আলগা দেওয়ার কথা এণ্টনীকে বারে বারে স্মরণ করিয়ে দেয় না আগের মতন। মনপ্রাণ ঢেলেই সৌদামিনী এণ্টনীর কবি-প্রতিভা বিকাশের জন্য ওর দলের খরচের বাবদ উদার হস্তেই চাবি খুলে দিয়েছে অর্থ-ভাণ্ডারের। রাতে মহলা শেষে নেশার ঘোরে এণ্টনী যখন বিছানায় মড়ার মত পড়ে ঘুমে অচেতন থাকে তখনও খেদ থাকে না সৌদামিনীর কণ্ঠলগ্ন হতে পারলো না ব'লে।

শুধু মাঝে মাঝে এণ্টনীর মনে করিয়ে দেওয়া মনের নিভৃত বাসনাটাই একটু আধটু উঁকিঝুঁকি দেয় সৌদামিনীর মনে—যদি একটি

শিশু জন্ম নিতো, যদি তাকে মা ব'লে ডাকতো। মনের কোণে জমা স্নেহরস তখনই উপচিয়ে ওঠে।

কিন্তু স্বপ্নের শেষে স্বপ্ন ব'লেই মনকে যেমন প্রাত্যহিক কর্ম সংযোগ করে তেমনি ক'রেই সৌদামিনী ঝেড়ে ফেলে সন্তান-কামনা—না এলেই ভাল। সমাজ আছে। এদিকে হিন্দু সমাজ, ওদিকে খৃষ্টান সমাজ—কোন সমাজেই সেই সন্তান স্বীকৃতি পাবে না। ঘৃণার মালা পরিয়ে তার জীবনকে বিষময় করতে পারবে না। তাই এ চিন্তা তাড়ায় সৌদামিনী। এণ্টনীর মুখ চেয়েই তাড়ায়। এণ্টনীকে সেই সন্তান পিতা ব'লে স্বীকার করতে পারবে না। ঘৃণা করবে সমাজের অনুশাসনে।

তাই বুদ্ধি দিয়ে এড়িয়ে চলে সৌদামিনী। এণ্টনী ভাবুক মানুষ। ওর ভাবের জ্বালা সইবে, এ জ্বালা সইবে না।

এণ্টনীও বুঝেছে কেন এড়িয়ে গেছে সৌদামিনী—হিন্দু-সমাজে, তাদের সমাজেও কোন স্থানই পাবে না তাদের সন্তান। তাই দীর্ঘ-নিঃশ্বাসের সঙ্গে এ চাওয়া শেষ ক'রে এণ্টনী কবিগানে নতুন ক'রে ডুব দিয়েছে। রসিকজনের সঙ্গ, গাঁজার আড্ডা, কবিগানের আসর, আর সৌদামিনীর সঙ্গই সত্য। আর কিছুই দরকার নেই।

এদিকে কলকাতা যাওয়ার দিন আগত। এণ্টনী থেলো হুঁকোয় তামাক টানতে টানতে সৌদামিনীর সন্ধানে পাকশালের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে বললে, কালই যে আমাদের যেতে হয় গো কলকাতায়। তা রামচরণকে একবার চন্দননগরে পাঠাও না, সেনের গদি থেকে টাকা-কড়ি নিয়ে আসুক। তুমিতো বলছিলে হাতে আর কিছু নেই। ২০০।১০০ হাতে না পেলে যাই কি ক'রে বল দেখি?

—তা বেশ তো। তুমি বলো না রামচরণকে, সৌদামিনী রাঁধতে রাঁধতে জবাব দেয়।

—ও তুমি বল বাপু। টাকাকড়ি তোমার ব্যাপার, এই ব'লে এণ্টনী তামাক টানতে থাকে।

সৌদামিনী এবার কড়াটাকে উনোন থেকে নামিয়ে কনুই দিয়ে জলের ঘটিটা কাত ক'রে হাত ধুতে ধুতে বললে, বেশ যা হোক,

সামান্য একটা কথাও কি তোমার বলতে নেই। সবই কি আমি করবো।
এই ব'লে চুপ ক'রে সৌদামিনী ঘটিটা নামিয়ে রাখে। তারপর হাতের জল পুঁছতে পুঁছতে দোরের কাছে এণ্টনীর সামনে এগিয়ে এসে হেসে বললে, আচ্ছা কলকাতা গিয়ে কি দিয়ে কি করবে গো তুমি!

—তাই ভাবছি। তা তুমি সঙ্গে চল না। যাবে তো বলেছিলে। বৌবাজারের বাসাটি মন্দ নয়। তুমিও চল আমাদের সঙ্গে।

—এবার নয় গো। ফিরের বার যখন যাবে তখন তোমার সঙ্গে গিয়ে কালীঘাটের মা কালীকে দেখে আসবো। আচ্ছা এবার কতদিন থাকবে কলকাতায়? বেশী যেন দেরী করো না ফিরতে।

—না না, বেশী দেরী হবে না। তবে কি জানো, বেশী আসরে গান হলে অবশ্য কিছুদিন দেরী হতে পারে। এও জেন, গান মিটলেই একদিনও থাকছি না। তোমার মুখ না দেখে দিন কাটানো সে কি বিষম লো সখি! সত্যি দামিনী, বেশী দেরী করবো না।

সৌদামিনী নিশ্চুপ আয়ত চোখে এণ্টনীকে দেখে। কিছু বলে না। আসন্ন বিরহ-মেঘ এখুনি যেন ওর মনের আকাশ ছেয়ে ফেলবে।

এণ্টনী লক্ষ্য করে সৌদামিনীর সজল চোখ। হেসে ভরসা দিয়ে বলে, ভয় কি। হারিয়ে যাবো না গো, হারিয়ে যাবো না।

সৌদামিনী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে হেসে বললে, কি জানি বাপু, কলকাতা ব'লে জায়গা! শুনেছি তো সেখানে নাকি সুন্দরীরা পুরুষ মানুষ দেখলেই ডেকে নিয়ে যায়। তেমনটা যদি আমার নাগরকে নিয়ে যায় তাহলে কি ভাবনা হয় না! বল না গো—আবেশ চোখে সরস কণ্ঠে সৌদামিনী ব'লে ওঠে।

এণ্টনী একটান তামাক টেনে হেসে বললে, যদি ধরাই পড়ি কোন সুন্দরীর বাহুবন্ধনে তাহলে তাকে বলবো, রোসো গো মোহিনী, আমার একটি সর্ত আছে : সে হয়ত জিজ্ঞাসা করবে—কি সর্ত তোমার তাড়াতাড়ি ব'লে ফেলো, আমার দেরী সয় না। তখন বলবো, ব্যস্ত হয়ো না, প্রেমমধু সঞ্চয় ব্যস্ত হলে হয় না। তোমার ওই ব্যস্ততা ত্যাগ ক'রে আগে আমার মধুমুখীর মতন মধু সঞ্চয় কর, তবে ভেবে

দেখবো তোমার রঙে রাঙবো কি না, কেমন এই কথাই তো বলব গো?

—যাও, খালি ঐ একটি কথাই শিখেছো আর জেনেছো। কেন বলতে পারো না, ললনে তোমার মতন লোভী নয় আমার বালা। সে ধ'রে বেঁধে রাখে না। চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গেলে অভিমানে সারা হয়। তমাল বনে, যমুনার জলে সে কৃষ্ণসঙ্গ করে। কৃষ্ণ-অন্ত প্রাণ তার—বলতে পারবে না গো এই কথা, আবেশে চোখ চেয়ে বলে সৌদামিনী।

—বলবো গো বলবো। বলবো মধুমুখী আমার বড় অভিমানী। তোমরা আমায় বেঁধে রাখলে সে গঙ্গায় ঝাঁপ দেবে।

—সত্যি বলছো!

—সত্যি বলছি মধুমুখী, প্রশান্ত হাসি হেসে বললে এণ্টনী।

সৌদামিনী তার ঠোঁটে উজ্জ্বল হাসির রেখা টেনে সজল চোখে এণ্টনীর দিকে চেয়ে থাকলো কিছুক্ষণ, তারপর এণ্টনীর একটি হাত নিজের মুঠির মধ্যে চেপে ধরে বললে, আমি জানি গো, তুমি এই কথাই বলবে।

—কই গো মাঠাকরুন, হাটে যেতে হবে যে, রামচরণ ডাক পাড়ে।

এবার সৌদামিনী চোখ পাকিয়ে কপট ভৎ´সনার সুরে এণ্টনীকে মৃদু ধাক্কা দিয়ে বললে, যাও সরে পড় দেখি! তোমাকে কাছে দেখলেই সব যেন ভুলে যাই, যাও সরে পড়।

এণ্টনী হাসে উচ্চ হাসি একচোট, তারপর হাসি থামিয়ে বললে, রামচরণকে তাহলে সেনেদের ওখানে পাঠিও, নৈলে যাওয়া হবে না।

তা পাঠাবোখন, তুমি সরো দেখি এখান থেকে।

এণ্টনী আর কিছু বলে না, তামাক টানতে টানতে সদর বাড়ীর দিকে এগিয়ে যায়।

কার্তিকের ভোর। শিরশিরে ঠাণ্ডা। নিটোল শিশিরকণাগুলি তখনও আবিষ্ট দুর্বাদলে। রোদ এসে ডাকেনি ওপর আকাশে।

এণ্টনীর কলকাতা যাত্রার সময় উপস্থিত। জিনিষপত্তর নৌকায় উঠে গেছে। দলবলও।

সৌদামিনী আসন্ন বিচ্ছেদে সজল চোখে এণ্টনীকে দেখতে থাকে। মুখে কথা নেই।

এণ্টনী পোশাক পরা সাঙ্গ ক'রে সৌদামিনীর কাছে এলো। ধীরে চিবুক স্পর্শ ক'রে সৌদামিনীর শিশির-নিটোল চোখ দুটো লক্ষ্য ক'রে বললে, এ যে দেখছি বর্ষণাসন্ন ভাদ্রের আকাশ। কি ক'রে তাহলে যাই বল দেখি সখি। এ দুর্যোগে কি ঘর ছাড়তে পারি, দেখি দেখি মুখ তোল!

সৌদামিনী থর-থর ক'রে কেঁপে ওঠে। ভাষা আসে না মুখে। তেমনি ঘাড় নিচু ক'রে দাঁড়িয়ে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করে।

—সত্যি সত্থ, আমি যেতে পারবো না। আমার মন মানবে না গো।

এবার সৌদামিনী মুখ তুলে সজল চোখে চেয়ে দেখলো কিছুক্ষণ এণ্টনীকে। তারপর মৃদু হাসির রেশ রেখে বললে, কি যে বল তুমি ছেলেমানুষের মত। যাবে না কি, নিশ্চয় যাবে। এস তোমাকে নৌকোতে তুলে দিয়ে আসি, এই ব'লে সৌদামিনী এণ্টনীর হাত ধরে।

এণ্টনী এবার আবেগে সৌদামিনীকে বুকে জড়ায়, তারপর ঘন চুম্বন আঁকে। সৌদামিনী আবেশে চোখ বোজে।

কেউ কথা বলে না। দুজনে একই অনুভবে বাঁধা থাকে বেশ কিছুক্ষণ।

বাইরে থেকে ডাক আসে। যাত্রার তাড়া। ভাঁটা পড়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ। এ স্রোতে ভাসতে পারলে ঘণ্টা আটেকের মধ্যেই কলকাতা, নৈলে রাতদুপুরে কি পরদিন ভোরে পেঁছতে হবে।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সৌদামিনী নিজেকে এণ্টনীর বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত ক'রে বললে, আর দেরী করো না, এবার এস তুমি। আর দেখ, কলকাতায় সময় ক'রে নাওয়া-খাওয়াটি করো। অবশ্য নটবরকে ব'লে দিয়েছি সব কথা, তোমাকে মনে করিয়ে দিলাম শুধু।

এণ্টনী হেসে বললে, নটবরকে আর কিছু বলনি ?

সৌদামিনী এবার চোখ পাকিয়ে বল্লে, বলেছি গাঁজা যেন কম পোড়ে আর পেটে দানাপানি ঠিকমত পড়ে। যেন গান মজলিস বসে।

এণ্টনী হো হো শব্দে হেসে ওঠে। হাসি থামলে বললে, ও নিজে একটা পাকাপোক্ত গেঁজুড়ে, ও পোড়াবে কম গাঁজা, বলেছো বটেক কথার মত কথা এক।

—দিব্বি করেছে গো, দেখো না কি রকম নিয়ম ক'রে চলবে সে। যা ভাবছো সেটি আর চলবে না। যাক, এখন এস দেখি। কথায় কথা বেড়ে যাবে। এদিকে শুভযোগও বেশী নেই। শুভযোগ থাকতে থাকতে নৌকো ছাড়তে হবে যে। এস এস, জয় মা জগদম্বে, সবদিক রক্ষে করো মা—সৌদামিনী করজোড় কপালে তিনবার ঠেকিয়ে মঙ্গলময়ীর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানায়।

এণ্টনী শান্ত চোখে সৌদামিনীর ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য ক'রে একটি পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

নৌকো না ছাড়া পর্যন্ত সৌদামিনী ঘাটে দাঁড়িয়ে থাকলো ঘোমটা মাথায় দিয়ে। এণ্টনী নৌকোর গোলুই-এ দাঁড়িয়ে স্নিগ্ধ চোখে চেয়ে থাকে সেইদিকে। অন্য কিছু নজর করে না ও। তারপর নৌকো ছাড়লে সৌদামিনীকে শোনাবার জন্যে রামচরণকে উদ্দেশ ক'রে ব'লে ওঠে, সাবধানে থেকো সব রামচরণ। আমি গান সেরেই ফিরবো। কিছু ভেবো না।

সৌদামিনী তেমনিভাবেই দাঁড়িয়ে থাকে এণ্টনীদের নৌকাটা দৃষ্টির অন্তরালে না যাওয়া পর্যন্ত।

কলকাতায় এণ্টনীর নৌকো পৌঁছল ভোরেই। প্রথম ভাঁটা অর্ধেক রাস্তায় আসতেই শেষ। তাই নঙ্গর ক'রে আহারাদি সেরে দ্বিতীয় ভাঁটার টানে কলকাতা পৌঁছলো ফুটফুটে আর এক সকালে। বৌবাজারের একটু উত্তরদিকে, খালে নৌকো বাঁধলো মাঝিরা।

এন্টনী ছইয়ের ওপর বসে থেলো হুঁকোয় তামাক টানতে টানতে নটবরকে বললে, এসে গেলাম হে নটবর। এবার নেমে জনেদের ডাক দাও, জিনিষপত্তরগুলি নামাতে হবে।

—হে বাবু, সেলাম সাহেব, ভাল পাল্কি আছে, যাবোনিকি, উড়িয়া পাল্কি বেহারা হাঁক পাড়ে।

হারু, নটবর তীরে নামে।

জন-মুটেরা ছেঁকে ধরে, জন হবেক বাবু।

—দাঁড়া বাপু দাঁড়া। সাহেব কি করে, কি বলে আগে দেখি।

—ও মহাশয় শুনছেন ?

হারু চোখ তুলে নজর ক'রে ডাক শুনে।

—কোথা থেকে আসা হচ্ছে আপনাদের, বাঙালী কলকাতার বাবুটি জিজ্ঞাসা করেন হারুর কাছে এসে।

হারুর মুখে কথা আসে না। ও একদৃষ্টে চেয়ে থাকে লোকটির দিকে : বাবুটির পরনে চওড়া কালো পাড়ের সরেশ শান্তিপুরী। হাতে ছড়ি। গায়ে পাতলা কাপড়ের বেনিয়ান।

—কি মশায়, কি দেখছেন থ হয়ে, জবাব আসে না নাকি ?

হারু একদৃষ্টে লোকটির মোম-লাঞ্ছিত বাহারী গোঁফের দিকে চেয়ে থাকে, কথা আসে না।

ওদিকে নৌকোর পাটাতন থেকে নিতাই উচ্চস্বরে ডাকে, ওরে ও হারু, এদিকপানে একটিবার আসতে আজ্ঞা হোক, নবাবী পরে দাখাস রে, মালটালগুলি দেখেশুনে নামাতে হবেনি নাকি !

হারু কানে করে না নিতাইয়ের কথা। এবার ও বাবুটিকে বল্লে, আজ্ঞে আমরা গৌরহাটি থেকে আসছি, তা আপনার নিবাস ?

—আমি এই কলকাতারই অধিবাসী, লিউবার্ডের সরকারী করি। আচ্ছা, ঐ সাহেবটি যিনি নৌকোয় বসে তামাকু সেবন করছেন উনি কি আপনাদের প্রভু ?

—আজ্ঞে, প্রভুটভু বুঝি না, তবে উনি আমাদের ওস্তাদ, দলপতি।

—মানে ? আপনারা কি···বাবুর কণ্ঠটি হঠাৎ নিশ্চুপ হয়ে যায়।

—কি হয়েছে হে, এণ্টনী কাছে এসে জিজ্ঞাসা করে।

—এই উনি আমাদের পরিচয় নিচ্ছিলেন আর কি, তা শুনুন মশায়, আমরা হলুম গিয়ে এণ্টনী সাহেবের কবির দল। আর ইনিই হলেন স্বয়ং এণ্টনী সাহেব, আমাদের দলপতি।

—তাই নাকি! কি আশ্চর্য, কি খাসা ব্যাপার! সেলাম সাহেব, এই ব'লে বাবুটি নুব্জ হয়ে সেলাম জানায়। তারপর আবার এণ্টনীকে বল্লে, কোথায় উঠিয়াছেন সাহেব আর কোথায় আপনার দলের গান হইবে? আপনি কি নিজেই সেইখানে গান করিবেন?

এণ্টনী বাবুটিকে প্রত্যভিবাদন ক'রে হেসে বললে, বৌবাজারে একটি বাসা নিয়েছি। বৌবাজার ঠাকুরবাড়ীতে গান হবে আর এই অধমও কিঞ্চিৎ গান আপনাদের শোনাবে। যদি কৃপা ক'রে আসেন তা'হলে নিজগুণে ধন্য হই।

—বিলক্ষণ আসবো বই কি! ভারী সন্তোষলাভ হইল আপনার সঙ্গে পরিচয়ে। যদি এই অধম দীনের আস্তানায় আপনার পদরজ পড়ে তাহা হইলে নিজেকে ধন্য করি।

—আপনার বাসা কোথায়?

—আজ্ঞে, ঐ বৌবাজারের হাড়কাটা গলিতেই নিবাস। এখানে একটুকু প্রাতঃভ্রমণে, বুঝিলেন কিনা···হেঁ হেঁ—খুসখুসে হাসি কাশি মিলিয়ে একটু দম নিয়ে আবার লোকটি বললে, আজ্ঞে ঐ গলিতে এই বদন সাহার নামে ডাক দিলেই আপনাকে অধমের কাছে নিয়া যাইবে।

—তাহলে আপনি কবি-গায়ক রাম স্বর্ণকারকে বিলক্ষণ চিনেন? উনি তো ঐ গলিতেই থাকেন।

—চিনি বৈ কি! কিছু বলিব নাকি?

—বলবেন, সময়মত তার সঙ্গে দেখা করবো।

—বলিব বটেই, কিন্তু ওইখানে যখন যাইবেন সাহেব তখন অধমের বাটিতেও একপল মানে···যদি কৃপা···।

—নিশ্চয় যাবো ওদিকে গেলেই, এই ব'লে এণ্টনী হারুর উদ্দেশ্যে বলে, ওহে পাল্কি নাও দু-চারটি, যেতে হবে না?

সাহা মহাশয় ব্যস্ত হয়ে ব'লে ওঠে, পাল্কির দরকার কি, আমার জুড়ি যখন আছে তখন পৌঁছাইতে কোন কষ্ট হইবে না আপনাদের।

—ধন্যবাদ, ভালোই হল, কোথায় গাড়ী আপনার ?

—ঐ যে সামনের গাছতলায়, আসুন আসুন, বদন সাহা সাগ্রহে বললেন।

এণ্টনী হারুকে বললে, ওদের সকলকে আসতে বল। তারপর সাহা মহাশয়ের দিকে ফিরে বলল, চলুন সাহাবাবু এবার কলকাতায় আপনিই প্রথম বন্ধু হলেন। একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, যদি অবশ্য মনে কিছু না করেন।

—নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করিবেন সাহেব, একশত বার করিবেন। আপনারা হইলেন গিয়া আমাদের বর্তমান প্রভুদের জাতের লোক। আপনাদের গালাগালি লাথিঝাঁটা আমাদের কাছে দয়া আর আশীর্বাদ —বলুন বলুন।

—দেখুন মহাশয়, আমি আপনাদের মনিব জাতির লোক নই। জাতে আমি পর্তুগীজ। স্ত্রী আমার বাঙালী। বাঙলায় আমি কবি-গান করি—বুঝলেন সাহা মহাশয়। প্রভু হলে স্বর আমার একটু কর্কশ শুনতেন, শুনছেন কি তাই ? কেমন লাগছে আমার কথা-বার্তা, আপনার মনিবদের মতন কি ?

—না না, তবে একটুকু মোগলাই মানে বাদশাহী, আবার একটুকু জবরদোস্ত অথচ দিলদার বাঙালী জমিদারের মেজাজও আমি পাইতেছি সাহেব আপনার কথাবার্তায়! তাইত মনে বড় সন্তোষ, মানে নিজেরও কিঞ্চিৎ জমিদারী আছে। করি বটে কলকাতায় ইংরেজ প্রভুর সরকারী, তবে বলিতে কি এই অধীনের জমিদারের মেজাজটি আসল…হেঁ হেঁ। তা আপনার কি কোন কুঠি আছে, নিশ্চয় আছে। এত দাস নিয়া যখন চলাফেরা।

—না সাহামশায়, কুঠিও নেই আর এরা আমার দাসও নয়। করতাম লবণ ব্যবসা কিছু কিছু, এখন যা' নেশা ধরেছি হয়ত এটাই পেশা হয়ে দাঁড়াবে।

—এই কি কম কথা না কি! আপনার মতন একটি বিদেশী বঙ্গ ভাষায় কবি-গান করিতেছেন, এটি শুনাই যে মানে, একটি, মানে…একটি বিস্ময়। কিন্তু গলাটি যে বড্ড মানে…এখুনি আসিতেছি সাহেব, একটুখানি যাইব আর আসিব, এই ব'লে সাহা-বাবু আর দাঁড়ালেন না। বেশ দ্রুত এগিয়ে গেলেন পুবের দিকে।

—লোকটা পাগল না কি, বকতে বকতে কোথা গেল। দেখদিকি কাণ্ডখানা ওস্তাদ, আমরা জিনিষপত্তর নিয়ে হাপিত্যেশ ক'রে বসে থাকবো না কি? হারু বিকৃত মুখভঙ্গি ক'রে বললে।

—একটু বস না, এখুনি আসবে। বোধ হয় নেশা করতে গেল, আমাদেরই দলের হে হারু, হাবেভাবে যা বুঝলাম।

—তা বল্লে তো পারতো। বের ক'রে দিতাম না হয় কল্কেটা।

—কি যে বল, জানা নেই শোনা নেই, হুট ক'রে কি বলতে পারে। নাও নাও তুটো পাল্কি তো করো। আমাদের সব লোকজন তো আর ঐ জুড়িগাড়ীতে ধরবে না।

—তাই করি, কলকাতা-বাবুর খেয়ালে থাকলে আর আজ বাসায় পৌঁছতে হবে না, এই ব'লে হারু বিরক্তি নিয়েই এগিয়ে যায় পাল্কী-বাহকদের আড্ডার দিকে।

বেশ কিছুক্ষণ পর বদন সাহা রাঙ্গা চোখে এণ্টনীর কাছে ব্যস্ত ভঙ্গিমায় এসে বললে, চলুন সাহেব, আপনাদিগকে যথাস্থানে পৌঁছে দিয়াই আমাকে আবার বাটী ফিরিয়া পালেদের ঘাটে রওনা দিতে হইবে। জাহাজ-খালাসী আছে আজ সেইখানে। উঠিয়া পড়ুন সাহেব, খামাখা দেরী করিবেন না।

সাহাবাবুর ব্যস্ততার ভঙ্গি লক্ষ্য ক'রে এণ্টনী হাসতে হাসতে গাড়ীতে ওঠে।

তুপুরে আহারান্তে জোর মহলা শেষে এণ্টনী গোরক্ষনাথকে হেসে বললে, কি রকম বলছে বল দেখি সরকার। আসর কি বলবে, বল দেখি?

—বলবে সাহেব ঠিকই বলবে, একেবারে যাকে বলে বোল-বোলাও, গোরক্ষনাথ একটু মেজাজ দিলে স্বরে।

এণ্টনী খুসী হয়ে ওঠে। গোরক্ষনাথকে বললে, অনেকক্ষণ নেশা করা হয়নি কি বল সরকার, এবার একটু মৌজের দরকার।

গোরক্ষনাথ ঘাড় নাড়ে।

এণ্টনী হারুর উদ্দেশ্যে হাঁক পাড়ে, ওহে হারু গেলে কোথায় হে, এক ছিলিম তৈয়ার কর।

নিতাই মিচকি হেসে বারান্দার দিকে হাত দেখিয়ে ইসারা ক'রে ব'লে ওঠে, হারু কি এখন আর ইহ-জগতে আছে ওস্তাদ, দেখোগে না বারান্দায় হারুর অবস্থাটা।

—কি ব্যাপার হে, এণ্টনী উঠে বারান্দার দিকে যায়।

হারু রাস্তা নজর করছিল। আর আশপাশের বাইজীবাড়ীর বারান্দায় দু'একটি সুন্দরীর মুখ দেখে চনমন করছিল।

এণ্টনী হারুর কাছে এসে কানের কাছে মুখ এগিয়ে বললে, বে-সামাল হয়োনা হারুবাবু। পাত্তা পাবে না। এ হলো কলকাত্তা সহর—অনেক কিস্মত ঐ বিবিদের! এসো দেখি, এক ছিলিম সাজো দেখি।

—বড় খাসা গলা কিন্তু ওস্তাদ। মাঝে মধ্যে সুর যা আসছে, হারু ঘাড় ফিরে যেতে যেতে বললে।

কথাটা নিতাই শোনে, ও পা নাচাতে নাচাতে বললে, নিজের সুর ঠিক রাখ ব্যাটা।

—চুপ কর্ নিতে। এ তোর চন্দননগরের খেঁদুমণি নয়। এ হলো গিয়ে বৌবাজারের বাইজী। দেখলে ভিরমি যাবিনি, একেবারে অক্কা পাবি।

—যা যা ঝোটন কোলাসনে, অক্কা এ সম্মা যাবে না। যাবি তুই। হাঁ ক'রে তো ঐ মাগীগুলোর থুতু গিলতে পেলেও তুই ধন্নি হোস—গোলা পায়রা ব্যাটা, ঝোটন নেই কিন্তু ফোলাবার চেষ্টা আছে।

—দেখছো ওস্তাদ, কথাবার্তার ছিরি দেখছোত নিত্তেটার। এমনি করলে কিন্তু একটা কেলেঙ্কারী হয়ে যাবে, তখন কিন্তু দোষ দিতে পারবে না।

—দোহাই হারু, রাগ ক'রে কিছু যেন ক'রে ফেলিসনে ভাই এই বিদেশে, বরং রাগ ক'রে তু'এক ছিলিম তুই একাই বসে বসে খা, নটবরও হেসে ফোঁড়ন কাটে।

এণ্টনী মধ্যস্থতা করার জন্য বলে, কি হচ্ছে নিতাই, রাতে গান আজ, সেদিকে খেয়াল কর। মিছে চটাচটি করছো কেন। হারু তুমি ছিলিম সাজো, আমি কথা দিচ্ছি তোমাকে ঐ সামনের বাড়ীর বাইজীর গান শোনাবো।

—ওস্তাদের একি সুবিচার, আমরা সব বানের জলে ভেসে এসেছি বোধ হয়।

এণ্টনী হেসে বলে, হারুর ইচ্ছে হলে তোমাদের নিয়ে যেতে পারে, হারুবাবুর আসর হবে সেটা, কি বল হারু?

হারু কিছু বলে না। মুখ গুঁজে গাঁজার সাজ তৈরী করে।

নিতাই হারুর কাছে এগিয়ে গিয়ে আবদারের সুরে বলে, নিয়ে যাবিতো রে। যদি বলিস্ তো তোর থুতু আমি খেতে পারি, বাইজীর থুতু তুই খাস।

হাসির রোল ওঠে। হাসি থামলে গোরক্ষনাথ এণ্টনীর দিকে ফিরে বলে, আমি একটু ঘুরে আসি, তুমিতো কোথাও বেরুবে না?

—বেরুবো আর কোথায়, কিন্তু তুমি তাড়াতাড়ি ফিরো।

—নিশ্চয় ফিরবো, আসি তা' হলে এখন।

—এস, কিন্তু একটান টেনে যাও, হারু আমাদের বানাই চমৎকার। কৈ হে হারু, গোরক্ষনাথের যে তাড়া আছে।

—এই যে হয়ে গেছে, এই ব'লে হারু কল্কে নিয়ে আসে উবু হেঁটে।

গোরক্ষনাথ হাত বাড়িয়ে কল্কেটা নেয়। তারপর মুখে তুললে নিতাই আগুন দেয়। টান দিয়ে এণ্টনীর হাতে কল্কেটা দিয়ে গোরক্ষনাথ বললে, ঘুরে আসি।

এণ্টনী ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে কল্কেতে মনঃসংযোগ করে।

আর সব কল্কে পাবার অপেক্ষায় থাকে।

একটি সুখটান শেষে অন্যজনকে কল্কে দিয়ে এণ্টনী কিছুক্ষণ ঝিম মেরে হঠাৎ নটবরকে বললে, গোরক্ষ যা খবর দিলে তাতে আজ গান জমবে। নীলুঠাকুরের দলের বাঁধনদার এখন রাম বসু। রামবাবুর গানের বাঁধনের তুলনা হয় না হে। উনি কবি-গানের ধারাই হয়ত পালটে ফেলবেন, খুবই ক্ষমতাবান কবি। শুনছি নাকি উনি আসরে সামনাসামনি গান বেঁধে উত্তর পাণ্টা করবেন। না হে নটবর, বেশ একটু কোশে এবার লাগতে হবে আমাদের।

—তুমি তো খুব পড়ছো, তোমার গানও শুনছি ওস্তাদ, তাতে ভাবনার কি আছে! গোরক্ষ সরকার তো বলে, সাহেব বেশ এলেমদার।

এণ্টনী খুসী হয়, বলে, বলছিল না কি এ কথা ?

—হ্যাঁ গো ওস্তাদ, তা একটা কথা বলি বাপু, ও তোমার ভয় করলেই ভয়, না করলেই জয়। তাছাড়া মাঠাকৃরুণ হচ্ছেন গিয়ে একাধারে লক্ষ্মী-সরস্বতী। তিনি যখন তোমার পাশে তখন তোমার ভাবনা করার কিছু নেই ওস্তাদ।

এণ্টনী এবার একগাল হেসে ভুঁড়িতে হাত বুলতে বুলতে বলে, তোমার ঠাক্‌রুণ আছেন ব'লেই আমি আছি, আমার সব আছে। হ্যাঁ নটবর, মনে ক'রে দিয়েছো তো চিঠিটা ডাকে ?

—সে আর দেইনি, আগেই দিয়েছি। ঠাক্‌রুণ যা ভাবছেন।

—সে খুব ভাবছে না নটবর, এণ্টনী উদাসস্বরে ব'লে ওঠে।

—তা ভাবছে বই কি। তোমা অন্ত প্রাণ তেনার, নিয়ে এলেই পারতে ওস্তাদ। বাসাটি নেহাত ছোট নয়। এই দোতলায় থাকতেন, আমরা সব নীচে থাকতাম।

এণ্টনী কোন জবাব দিলে না। চোখ'বুজে বসে থাকে : গৌরহাটির গঙ্গা-ঘেঁসা বাগান-ঘেরা বাড়ীতে সেই শান্ত দামিনী হয়ত নীল আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে, কি সবুজ ঘাসে মৃদু চরণে গঙ্গার তীরে

একা একা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, আবার হয়ত কাজ করে গৃহস্থালীর—এণ্টনী যেন স্পষ্ট দেখতে পায়।

নটবর ওস্তাদকে বোঝে। তাই আর কথায় বিরক্ত করে না। চুপচাপ নিতাইদের গাঁজার চক্রে এসে বসে।

বৌবাজারের ঠাকুরবাড়ীর নাটবাংলা। রাস উৎসবের সন্ধ্যা রাত্রি। বড় বড় ঝাড়লণ্ঠনের আর মশালের উজ্জ্বল আলোতেও লোকের মাথা গোনা যায় না।

ভীড়। কবিগান শুনতে লোকে একটু স্থান পাবার জন্য হাঁকপাঁক করে। কেউ কেউ ফিরিঙ্গী কবিকে দেখার জন্যে সন্ধ্যে থেকেই ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করে।

সারা ঠাকুরদালানে নাটমন্দিরে লোকের মাথা আর ঝুলোনো রাস পরিবেশের প্রতীকগুলি ছাড়া আর কিছু নজর করা দুষ্কর। শুধু নাটবাংলার মাঝখানে শুভ্র চাদর বিছানো গোল খালি জায়গাটি নজরের একটু স্বোয়াস্তি আনে।

হেমন্তের সন্ধ্যে-শীতেও মানুষ গলদঘর্ম হয়। আসরে এখনও কবিয়াল দল আসেনি। রাত ন'টার আগে গান জোড়া হবে কি না সন্দেহ, মাতব্বরদের কাছে খোঁজ করলে তাঁরা বিরক্তির সঙ্গে এ কথা জানাতেও গড়িমসি করছেন। শ্রোতাদের গুঞ্জন তাই হট্টগোল।

মাতব্বররা বিরক্তিতে মেছোহাটার তুলনা ক'রে ব্যস্ত হওয়ার সুযোগ খোঁজেন।

বাইরে মেলার মত চারদিকে দোকান-পসার জমে উঠেছে। লোকে ধৈর্য রক্ষার জন্যে জিনিস দেখে কিনে সময় কাটায়।

—ওরে রীতিমত লাল গোরা, এলো দেখলুম এণ্টনী কবিয়াল। কি লম্বা, বড় বড় চোখ, কুর্তা-পাতলুন পরে এসেছে মাইরি। কি ক'রে কবি করবে রে! শ্রোতাটি বিস্ময় চোখে দ্রুত আসরে এসে বসে পড়ে পাশের বন্ধুটিকে বলল।

—গাইবে রে ঠিকই গাইবে, নৈলে কি আসরে বাঁদর নাচবে নাকি ইড়িং বিড়িং কটার মটার ফটাস্ ইংরেজী ফলিয়ে।

—বাংলায় কবি গাইবে তো হে?

—নিশ্চয়।

—তাজ্জব কি বাত!

—আরে এ হলো আজব কলকাতা, এখানে আজবই সাজব। এখানকার বাবুরা রাস্তায় পিপে পিপে এসেন্সো ঢেলে বাইজীকে খুস করে। একি তোর দখনের বাদা। ইয়ে হ্যায় কলকাত্তা সহর। এখানে সন্ধ্যে হলো তো বাইজী বাড়ীর ঘুঙুর বাজলো। ওরে বৌবাজারের বৌ নিবি তো রাস্তায় উড়ে বেয়ারাদের পাল্কীর দিকে নজর কর, ঠিক পৌঁছে যাবি। রেস্ত বুঝে তোকে টগর থেকে আরম্ভ ক'রে বেলী চামেলির সুবাসে তর্ ক'রে দিতে ঐ উড়ে পাল্কি-বেয়ারা-গুলোও ওস্তাদ এখানে।

—আর জমিদারবাবুদের দলে যদি ভিড়ে পড়তে পারি?

—তা'হলে রক্ষে নেই রে—নাচা-গানায় দিলখুস্ থাকবি সব সময়। দিনে চব্বচোষ্য, রাতে জল তস্য—মদের নেশা থাকে, মিটবে। গেঁজা, তাও—যেটি চাও সেটি পাবে। তবে নাচতে হবে আবার নাচাতে হবে রূপসী বাইজীর মতন। দেখেছিস্ বাইজী? না রাস্তা থেকে ঘুঙুরের রিণিকি ঝিনিকি শব্দ শুনেছিস্।

—বারাত ভাই, বারাত করেছি তেমন যে, বাবু হবার এত ইচ্ছে তবু রাঁড় করার ক্ষমতা নেই। বাপ না মরলে উপায় নেই।

—তাই না কি, তা' বাপ মরবে কবে?

—সে বলা মুশকিল, এখনও বুড়ো রাতে বাড়ী ফেরে না।

—তা হলে আর কি করবি, এই দাঁড়-কবি আসরে ঘুরে ঘুরে রাত্ত জাগ। ওরে ঐ যে ঢোল আসছে, গুছিয়ে বস, এবার ঠেলাটা বুঝবি।

—এই সবে ঢোল এল, এরপর কাঁসি আসবে ঘণ্টাখানেক পরে। তা কি রকম বুঝছো হরিচরণ? আর এক মাঝ-বয়সী শ্রোতা তার পাশের লোকটিকে জিজ্ঞাসা করে।

—আমার মনে হয় জমে যাবে আসর।

—সেবার গুরোর সখী-সংবাদের মত গান হবে নাকি?

—আরে, রাখো তোমার গুরো দুম্বোর গানের কথা, এখন গানের মত গান করতে নীলঠাকুরের দল। রাম বসু যে দলের বাঁধনদার, সে দলের তুলনা নেই। এই দেখ না কি হয়; ফিরিঙ্গী বাছাধনকে জাহাজে না পালাতে হয়। হ্যাঁ হে, ফিরিঙ্গীটি জুটলো কোথা থেকে? বাঁড়ুজ্জেরা কি লেনদেন করছে নাকি!

—তোরা বাপু আজকাল বড্ড তলিয়ে তলিয়ে চিংড়ি খুঁজিস্, ভাসা তারুই-এ নজর রাখিস্ না।

—দেখেছি বাবা তোমার ভাসা তারুইয়ের চোখ। আর ওতে রুচি নেই। তার চেয়ে চল বাইজীবাড়ীর নিচে দাঁড়াই। মনটা ঠাণ্ডা হবে।

ট্যাকে নেই—টাক্, গুঁজছেন উনি …যাক কাঁচা কথা নাই শুনলে ঠাকুরদালানে বসে, চুপ ক'রে বসো দেখি।

—ধৈর্য থাকছে না যে।

—মেজাজ করেছো জমিদারের। তা যাবে যাও না। আমি নড়ছি না। ফিরিঙ্গীর গান শুনিনি, শুনবো। তোমাদের দেখেছি নতুন কিছু হলেই গা জ্বলে। কি যে গোঁড়া মন তোমাদের। এই কিছুদিন আগে রামমোহন হরনাথ মল্লিকের বাড়ীতে স্কুল করতে তুমিই তো ছেলেদের নিয়ে ছড়া কেটে কেটে কেচ্ছা ক'রে বেড়াতে। কি যেন ছড়াটা হাতে তালি দিয়ে গাইতিস্? ও, হাঁ মনে পড়েছে—

খানাকুলের বামুন একটা করেছে স্কুল।
জাতের দফা রফা, থাকবে না আর কুল॥

—আর তুই দুটো বিদেশী বুলি কোপচে সাহেবের তামাক সেজে দু'পয়সা রোজগার করিস্ ব'লে কি মনে করেছিস্ জেণ্টু দলে গিয়েছিস্! অত বারফাট্টাই করিস্‌নে। রস শালা আমাদের মতন সমজদারদের দলেই পাবি। আর গুণীর কদর আমাদের মতন গোঁড়া জমিদারদের কাছেই পাবি রে।

—ওসব কথা থাক। দেখ, নীলুঠাকুরের দল এসে গেল আসরে।

—তাই নাকি! তা শুনেই যাই কিছুক্ষণ। শ্রোতাটি ভালো ক'রে জায়গা নিয়ে বসে।

—হ্যাঁ, সেই ভাল। এখন আর মরদ মারুকে সতী হসূনে। বার-বিলাসিনীই হয়ে পড় রসের খাতিরে। অপর শ্রোতাটি হেসে বলে।

নীলুঠাকুরের ঢুলি ঢোলে চাঁটি দিয়ে আসরে উপস্থিত দর্শক-শ্রোতাদের মন-দৃষ্টি এক জায়গায় আনার চেষ্টা করে।

কিন্তু লোকের ভিড়ে গোলমাল বাড়তেই থাকে। ঠেলাঠেলি, মারামারি চলতে থাকে আসরে জায়গা নিয়ে। মাতব্বরদের চোখ-রাঙানিতে আরো চিৎকার বাড়ে।

ধীরে ধীরে নীলুঠাকুরের দলের দোহাররা, সরকার রাম বসু, নীলু-ঠাকুর আসরে উপস্থিত হয়। শ্রোতাদের উদ্দেশে নমস্কার জানিয়ে নিজের গানের সুরু করার তোড়জোড় করে। ঢুলি দ্রুত তালে বাজনা বাজিয়ে শ্রোতাদের সজাগ ক'রে তোলে।

—বেড়ে হাতটি কিন্তু বাজনদারের।

—দীনু ঢুলির কাছে কিছু নয়। ভোলা ময়রার গান খুলিয়ে দেয় দীনু ঢুলি।

—তা বটে, তবে এর হাতও নিরেশ নয় হে।

—ও কি মশায়, ঘাড়ের উপর বসছেন যে, চোখ নেই আপনার, দেখ দেখি বিশ্বম্ভর কাণ্ডখানা।

—যেতে দাও, আসরে গান শুনতে গেলে একটু আধটু অমন সয়ে নিতে হয়। বসুন বসুন, কিন্তু একটু দেখেশুনে বসবেন তো।

লোকটি কিছু বলে না। চুপ ক'রে আসরের দিকে চেয়ে বসে থাকে।

বাদ্যি থামলে নীলুঠাকুর করজোড়ে উচ্চস্বরে ব'লে ওঠে, আমার প্রতিপক্ষ এবং আমার ইচ্ছা এই পুণ্য দিনে মাথুর গান করি। আপনাদিগের অনুমতি পাইলে গান আরম্ভ করিতে পারি।

—অতি সাধু প্রস্তাব, গান আরম্ভ হোক।

—ঠাকুরমশায় আর দেরী নয়।

—সাহেব ব'লে কি ভয় করছে না কি।

—ধরতাতে কাত হবে তো? শ্রোতারা নানান্ টীকা-টিপ্পনী করতে থাকে বিভিন্ন স্থান থেকে।

—মহাশয়গণ দয়া ক'রে নিজগুণে ধৈর্য ধরুন। গান আরম্ভ করিতেছি। এই ব'লে নীলুঠাকুর দোহারদের সুর ধরতে ইসারা করে।

সুর ওঠে, ছড়ায় চত্বরে। ধীরে ধীরে নীলুঠাকুরও গলা মেলায়। তারপর এক সময় বাঁধনদার রাম বসু দোহারদের চুপ করেতে ইসারা ক'রে নীলুঠাকুরকে গানের কলি ধরিয়ে দেয়—

নিরখি মধুপুরে একি আজি অপরূপ।

নীলুঠাকুর কোমরে চাদরটি বেঁধে পরচিতেন ধরে—

মধু রাজ্যেশ্বর হয়ে বসেছেন ব্রজের নটভূপ।

দোহাররা নটভূপ শব্দের সঙ্গে সুর রাখে। নীলুঠাকুরের ফুকায় সুরকে বিস্তার দেয়—

খেদে বিষাদে অঙ্গ দয়,
কোটালের রাজত্ব দেখে চিত্ত ব্যাকুলিত হয়।

তারপর তালে তালে হেলেদুলে নীলুঠাকুর মেলতা ধরলেন—

ব্রজের মনচোরা যে হরি, রাজা সে আমারি,
বিধির বিচারে পায়ে নমস্কার।

দোহাররা দ্রুত লয়ে প্রথম মেলতা মাথা দুলিয়ে গাইতে থাকে নীলুঠাকুর কলি শেষ করায়।

প্রথম মেলতার সুর থাকতেই নীলুঠাকুরের ঢুলি বাজনায় তিওটের বোলে মুখর করলে আসর—

ঝাঁ ঝাঁ কিটিতা ঝাঁ ঝাঁ ধেত্তা কিটিতা কিতা, ধা ধা ধা,
গুড় গুড় গুড় তেত্তা ধা ধা ধেত্তা ঝাঁ ঝাঁ তেত্তা কিটিতা।

—বহুত আচ্ছা বেটা, জিতা রহ—সমজদার শ্রোতা ঘাড় দুলিয়ে তারিফ ক'রে ওঠে।

বাজনার তালে তালেই নীলুঠাকুর আবার গান ধরলে—

ছি ছি এই কি দশা এখন দেখতে হল মথুরায়
যে নাগর গোপীর বসনচোর, চোরে মহারাজ হল একি চমৎকার।

ধুয়া ওঠে—আহা, একি চমৎকার! রসিক শ্রোতারা উল্লাসধ্বনি ক'রে ওঠে।

নীলুঠাকুর খাদে গান ধরে—

ভাগ্য এমন আর দেখি নাই কাহার।
(ঝুকা) ছিল কোটালি ব্রজে যার, ঘেটেলি ঘুচিয়ে দেখি রাজ্যলাভ হল তার;
(মেলতা—২) যদি হলে হে ভূপতি, তুমি যদুপতি
গোষ্ঠেতে ধেনু চরাবে কে আর—

নীলুঠাকুরের সুরের সঙ্গে দোহাররা উচ্চকণ্ঠে সুর ধরে দ্বিতীয় মেলতা দ্রুত থেকে দ্রুততর গেয়ে গানটি শেষ করে।

আসরে সরগোল ওঠে গান শেষে।

—ফিরিঙ্গী কবি গেল কোথায় হে!

—আসছে না কেন?

—বোধ হয় হাগা পেয়েছে রে!

—তা' হলেই সেরেছে—গান তাইলে হলোনি।

—ওরে রঘু, ঐ যে রে, বন থেকে বেরুলো টিয়ে টোপর মাথায় দিয়ে রে!

—কোথায় বাবা, ও যে আমাদের মিত্তির বাড়ীর গণেশ দাদা। সাহেব বোধ হয় বেপাত্তা রে! ভয় পেয়েছে নীলুরামে।

—দেখ গে হয়ত কাস্তাপেড়ে সাড়ীর মধ্যে মুখ ঢেকেছে—শ্রোতারা নানান্ বুকনি-দানা ছড়াতে থাকে।

হট্টগোলের মধ্যেই নটবর ঢোল কাঁধে ঝুলিয়ে আসরে এলো। পেছনে হারু, নিতাই, রাইচরণ, জগন্নাথ ইত্যাদির সঙ্গে গোরক্ষনাথ সরকার আসরে আসে। এণ্টনীর দেখা নাই।

—কোথায় গেল রে সাহেব! এদের মধ্যে তো কাউকে সাহেব ব'লে মনে হয় না। এ যে সব দেশী মাল, তবে কি দেশী নাকি!

—না হে না, ঐ যে আসছে; নদের চাঁদটি যেন, দেখ্ দেখ্।

এণ্টনী ধীরে ধীরে আসরে ঢোকে খালি গায়ে। গলায় ঝোলানো উড়ুনীর মুখদুটি দু'কাঁধে দুলিয়ে উপস্থিত শ্রোতাদের করজোড়ে প্রীতি-নমস্কার জ্ঞাপন করে।

শ্রোতারাও হর্ষধ্বনি ক'রে এণ্টনীকে অভিনন্দন জানায়।

এণ্টনী স্মিত হাস্যে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে উচ্চকণ্ঠে শ্রোতৃবর্গের উদ্দেশে ব'লে ওঠে, সমবেত রসিকবর্গ, বঙ্গের কবি রঙ্গের প্রতি আপনাদের সবিশেষ আন্তরিকতার ভাব উপস্থিত বুঝিয়াই এই দীন সামান্যও গাহনা করিতে সাহস বর্ত্তাইছেক। কিঞ্চিদপিও মনোরঞ্জনে সক্ষমে থাকি তাহাতেই নিজ ভাগ্য ধন্য করিব। এই আসরে পূর্বপক্ষ শ্রদ্ধেয় নীলুঠাকুর মহোদয় শ্রীরাধারূপে শ্রীকৃষ্ণের গুণপনাই গান করিলেন। যদি অনুমতি হয় আমি শ্রীকৃষ্ণরূপে আপনাদিগের চিত্তবিনোদনে তৎপর হই।

—নিশ্চয় নিশ্চয়···বিলক্ষণ। শ্রীকৃষ্ণই হউন—শ্রোতারা কলমুখর হয়ে ওঠে এণ্টনী চুপ করলে।

—বেশ বললে কিন্তু মোশায়, আর গলাটিও খাসা! ঠিক যেন ডাঁসা প্যেয়রা!

—চুপ কর্ বেল্লিক! মাতব্বরদের কেউ একজন ধমক পাড়ে।

ওদিকে এণ্টনী নটবরকে বাজনা ধরতে বললে, বাজাও নটবর, মেজাজ দিয়ে।

নটবর হেসে ঘাড় নেড়ে ঢোলে চাঁটি দিয়ে বোল তোলে ধরতার।

গোরক্ষনাথ এণ্টনীর কাছে এসে চুপিস্বরে বললে, আমি অনন্ত, আমার অনন্ত কেবা পায়—এই মহড়ায় গান ধরো সাহেব।

—তাই ধরছি হে গোরক্ষনাথ, এণ্টনী বাজনার তালে তাল রেখে হাতে তালি বাজাতে বাজাতে বললে, তারপর ধীরে মহড়া সুরু করে—

আমি অনন্ত, আমার অন্ত কেবা পায়, কভু কুবজায়
সুন্দরী, করি হে সুন্দরী, কখন ধরি রাধার রাঙা পায়।
সকলে জানে সই রসময়ী আমি ইচ্ছাময়—

দোহাররা ধুয়ো রাখে—আমি ইচ্ছাময়।

এণ্টনী পরচিতেন গায় হেলে দুলে—

জগৎ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি স্থিতি লয়, সই রে আমা হতে হয়।
(ফুকা) কভু ইচ্ছা করে করি রাজত্ব, করি কখন ঘাটেলি,
কখনও রাধার দাসত্ব।
কভু গোষ্ঠে চরাই গোধন, কভু গোপের উচ্ছিষ্ট করি হে ভোজন,
কভু বাঁশীর গানে ভুলাই গোপীকায়।

এণ্টনীর গায়কী ঢং আর নৃত্যভঙ্গিমায় সরস হয়ে ওঠে দর্শক-শ্রোতারা। উচ্ছ্বাসের বিক্ষিপ্ত টুক্‌রো আসর-চত্বরে মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে—বাহবা, মরে যাই! অতীব মনোহর, ঘুরে ফিরে, ঘুরে ফিরে—সাবাস!

এণ্টনী মেজাজ পায়, ঠোঁটে হাসির রেখা টেনে মাথা নুইয়ে দর্শকদের কৃতজ্ঞতা জানায়।

নটবর হেলেদুলে ঢোলে একতালা বোল বাজায়—ধা ধা ঘিনিতা, ধা ধা ঘিনিতা, তাকুড় তা তাকুড় তা তাকুড় তা, তিনিকিটি তা, তিনিকিটি তা।

এণ্টনী মধুর স্বরে ধীরে একতালা বোলের সঙ্গে খাদে গাইতে থাকে—

কভু ভিক্ষা করি মান, মানিনী রাধার মানের দায়।
(ফুকা—২) কভু করে ধরি গিরি গোবর্দ্ধন, ইন্দ্রদেবের ভয়েতে
রক্ষা করি গোপীগণ
(মেলতা—২) কভু পুতনা করি নিধন, কভু করি গো সখি
কালীয় দমন, কভু উদখলে বাঁধেন যশোদা আমায়।

এণ্টনীর সঙ্গে সঙ্গে দোহাররা দ্বিতীয় মেলতাটি দ্রুত গেয়ে গান শেষ করে।

আবার গুঞ্জন শুরু হয়—একটু সরে, ও মশায় শুনতে পান না না-কি!

—তা গাইলে মন্দ না। তবে বাঁধুনি কি আছে এমন!

—না না, নীলুঠাকুরের থেকে গলার জোর বেশী।

—আমার বাপু ওর মাজা দোলানিটা ভাল লাগছেনি, ওকে লাচ্ বলে! ছো ছো!

তা চাঁদ, লেচে একবার দেখিয়ে দিয়ে আয় না, জন্মের মধ্যে কম্ম একবার বাইজীবাড়ী লাচ্ দেখেছিস্ তায় আবার লাচ সম্বন্ধি ওস্তাদী দেখাচ্ছিস্—নে নে চুপ ক'রে বস—ওহে হাঁটুটা একটু···মানে··· আলতো করো না ভাই।

—লাগছে বুঝি, এই যে, এখন কেমন ঠিক হয়েছে তো!

—একটু সরে।

—ঐ নাও, সুরু হলো এবার ওঠাউঠি! যেখানেই যাবে সেখানেই ঘন ঘন জল চাই আর পেচ্ছাব ফেরা চাই—গানটা শুনবি কখন, নে নে যা, হাঁ তারপর কি যেন বলছিলে হরিহর—ও মশায়, ওইখানে জায়গা আছে যে।

—বলছিলাম কলকাতায় এবার জমলো দাঁড়-কবির গান। ভোলা ময়রার সঙ্গে ফিরিঙ্গী কবির পাল্লা হলে যা জমবে।

—তা যা বলেছো, ভোলা এখন একাই একশো, ভোলার সঙ্গে ফিরিঙ্গী এণ্টুনীর পাল্লা একটা শোনার এবং দেখার জিনিষ হবে—খবর-টবর রেখো।

—নিশ্চয়, ও আর বলতে। আচ্ছা, একটা কথা শুধোই। রাম বসু দল করছে না কেন? ওমন গানের বাঁধন নিধুবাবুর পর আর দ্বিতীয় নেই। যে যাই বলুক বাপু, রাম বসুর বিরহের তুলনা নেই হে। নীলুঠাকুরের দলের নাম এখন রাম বসুর জন্যেই।

—তা বটে। দল করতে ঝামেলা অনেক তাই করছে না বোধ হয়। যাই বল বাপু, এণ্টুনীর কবি গাহনা একটা আলাদা জিনিষ, এ তো আজ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলাম। এই বিদেশী লোকটির এলেমের জোরটা দেখ। বঙ্গভূমিতে বঙ্গভাষায় কবি করছে এক বিদেশী! এ শুনতে দেখতে ভাবতে লোক দেখ না এখন কি ছুটোছুটিই না করে।

—না, আমাকেও একবার বাইরে যেতে হয়, সেরেসুরে বসি। নীলুঠাকুরের বাজানদার এসে গেছে, শ্রোতাটি উঠে দাঁড়ায়।

নীলুঠাকুরের ঢুলি বাজনা ধরে। আসর আবার গান শোনার মত আর শোনাবার মতন হয়ে ওঠে। নীলুঠাকুর যথাসময়ে দর্শক-শ্রোতাদের স্তব্ধ ক'রে গান ধরে।

আসর জমে গেছে, রাতও গভীর হয়। রাত দুপুরে গানের প্রতিটি কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শ্রোতারা এণ্টনী আর নীলুঠাকুরের গান একের পর এক আগ্রহ নিয়ে শোনে ভোর না হওয়া পর্যন্ত।

প্রায় ছ'টা নাগাদ গান শেষ হলো।

এণ্টনী যাবার আয়োজন করতে গোরক্ষনাথ হেসে বললে, আর কি সাহেব, এবার তোমায় পায় কে—কলকাতার একটা বড় আসরে বেশ সুনাম করলে। সবাই তো তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। হাঁ, ভাল কথা, রাম বোস কি বললে তোমায়?

এণ্টনী বেশ খুসীর স্বরে বললে, ভারী সুন্দর লোক কিন্তু রামবাবু, বললাম, নিজের দলটল করুন, বলেন, শীঘ্রই দল করবেন। ওনার গানের তুলনা হয় না হে গোরক্ষ।

গোরক্ষনাথ তাচ্ছিল স্বরে বলে, ও কথা তো সবাই বলে, আচ্ছা একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো তোমাকে সাহেব?

এণ্টনী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে থাকলো গোরক্ষনাথের দিকে কিছুক্ষণ, তারপর হেসে বললে, সঙ্কোচ কি, ব'লে ফেলো। কত টাকা চাই?

—টাকা তো চাই, আর একটা কথা, সেটা হলো ঠাকুরদাসকে আসতে বললে কেন?

—বললাম এই কারণে যে ওর গান কিছু আমার দলে নেবো। এতে দলের গানের রকমফের হয়, গান জমে।

—এই ব্যাপার, মুখটা বিকৃত ক'রে ব'লে ওঠে গোরক্ষনাথ।

—চল, বাসায় যাই।

—টাকা দাও, আমি শালকে যাব, ওখানেই থাকবো ক'দিন এখন।

—সঙ্গে তো কিছু নেই, বাসায় চল সেখান থেকে নিয়ে যাবে না হয়। এস, হারুদের নিয়ে আবার কালীঘাট যেতে হবে। নটবর কোথায় গেল আবার, জিনিসপত্তরগুলি ঠিক ক'রে নিতে হবে তো, এণ্টনী ব্যস্ত হয়ে ওঠে বাসায় যাওয়ার জন্য।

এণ্টনীর গান কলকাতার বাবুমহলে, জমিদার মহলে, বেশ কিছু-দিনের মধ্যেই সমাদর লাভ করে। কয়েকটি আসরে গানও হয়ে গিয়েছে মাসখানেকের মধ্যে।

কলকাতার কবি-ওস্তাদের অন্তরঙ্গও হয়ে উঠছে এণ্টনী। নিত্য নতুন কবি-ওস্তাদ আসে বৌবাজারের বাড়ীতে। বিশেষ ক'রে ভোলানাথ মোদকের সঙ্গে এণ্টনীর আলাপ জমে উঠেছে।

আজকাল প্রায়ই সকালের দিকে এণ্টনী বৌবাজার থেকে বাগ-বাজারে ভোলানাথের মিষ্টির দোকানে আড্ডা জমাতে যায়। সম্বন্ধটি সহজ বন্ধুত্বে উপনীত হয়েছে।

সেদিন সকালে ভোলার দোকানে যেতেই ভোলানাথ বললে, কি বাবা মিষ্টি গিলতে এলে নাকি মিনি পয়সায়। মিনি পয়সায় মিষ্টি এখানে মিলবে না হে। মিনি পয়সায় মিষ্টি খেতে চাও তো মাগের কাছে, থুড়ি ব্রাহ্মণীর কাছে যাও।

এণ্টনী হেসে বল্লে, সে মিষ্টির তুলনা নেই ভাই। একমাত্র প্রাণ ছাড়া কি তুলনা করা যায় সে মিষ্টির ?

—কবে থেকে আবার নিধুবাবুর তালিম নিলে হে ?

—তালিম কে আর দিলে ভাই। ভোলানাথের দু'একটি মিষ্টি পেটে পড়লেই তালিম আমি আজকাল দিব্বি পাই। খাসা বানাও তুমি কিন্তু ভাই।

—তাই নাকি হে পেটুক ফিরিঙ্গীনন্দন।

—গাল দেবে দাও—কিন্তু মিষ্টি খাইয়ে, একগাল হেসে বললে এণ্টনী।

—নাও খেয়ে নাও আজ, কাল আর পাচ্ছো না, কাল চললাম

কাসিমবাজারে। গাইবে নাকি কাসিমবাজারের রাজবাড়ীতে? গাও তো ব'লে রাখবোখন মহারাজকে। তবে কি জান খেউড় টেউড় একটু আধটু অভ্যেস ক'রে নাও। কবি গাহনায় আজকাল আমার ওস্তাদের মধুর ভাবটি নেই। সেই মনোরম মেজাজটি রাখতে দিচ্ছে না। শ্রোতাগুণে গান। আজকালের ঐ কেঁদো জমিদার আর কলকাতার নব্য বাবুরা কবিগানের আসর ডাকেন খিস্তিখেউড় শোনার জন্যে।

—সত্যি, আমাদের গানের পূর্বের সুন্দর মেজাজটি চলে গেলে আর কি থাকবে!

—থাকবে শুধু ছিবড়ে গো ফিরিঙ্গীনন্দন ছিবড়ে! কলকাতার সমাজ তো দেখছো: বাবুরা কেউ বেশ্যাবাড়িতে সারারাত কাটিয়ে সেখান থেকেই সোজা যান গঙ্গায়, সেখানে স্নান সেরে ফোঁটা-তিলক কেটে, হরি হরি ব'লে সেরেস্তায় বিনয়ী মার্জারটি সেজে বসেন। কেউ সারা রাত ধরে খেমটা আসরে সস্তা খিস্তিখেউড় শুনে হৈ-হল্লা ক'রে সমাজে সব বদরসের রসিকচূড়ামণি সেজে বসেন। আর এনাদের এই বদরসের চাহিদার জন্যে তো আমাদের খিস্তি করতে হয়। এনারাই যে আমাদের অন্নদাতা, নৈলে কৃষ্ণনামের সেবক আমি, কি দুঃখে ঐ নামের সঙ্গে খিস্তি করি তা কি ক'রে বোঝাবো তোমায় ভাই।

—রস বিচারের জ্ঞান এই বাবুদের বড্ড নিম্ন হয়ে যাচ্ছে।

—যাচ্ছে না, রসাতলে পেঁ ীছে মরা ব্যাঙের মতন ছেরকুটে পড়ে আছে।

—তা যা বলেছো ভোলানাথ। সেদিন রুচির বাহারটা দেখলাম এক বাঙালী জমিদারবাবুর সামনা-সামনি। ও তোমার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাহেবগুলোর মতন নিম্ন রুচির। দেখলাম কি জান ভাই ভোলানাথ, কয়েকজন জোয়ান দাস মিলে প্রায়-উলঙ্গ বাবুটিকে তেল মালিশ করছে, বাবুটি দিব্বি অন্য পাঁচজন লোকের সঙ্গে মাঝে মাঝে কাজের কথা বলছেন। ঐ লজ্জাহীনতাই জমিদারী বিলাস। তিনি জমিদার, লজ্জা ব'লে কিছুই থাকা উচিত নয়।

—জমিদারবাবুদের কথাই বল আর নব্য বাবুদের কথাই বল, ও দুই-ই সমান। জমিদাররা কেউ কেউ মোগলাই খোঁসায় ন্যাংটো হয়ে বিলাস করছে আর নব্যরা তোমাদের ফিরিঙ্গী কায়দায় বে-সামাল হয়ে মদ-বাইনাচ-মেমনাচের ঘেঁচুগিরি ক'রে আমাদের জাত মারছেন।

এণ্টনী কিছু বলে না, চুপ ক'রে শোনে ভোলানাথের কথা।

ভোলানাথ বলে, আমার গুরু হরুঠাকুর আর তেঁনার গুরু রঘুদাসের গান শুনে আসরে লোকেরা ভাবে কেঁদে ভাসিয়েছে। আহা, সেই গান শুনলে মনে কি ভাবের উদয় না হয়! আজকাল এসব গান গাইলে আসরে হট্টগোল হয়, বাবুদের ভাল লাগে না। খিস্তি দাও ঐ বাবুদের তা শুনবে।

—সত্যি ভোলানাথ তুমি যা বলছো তা একেবারে খাঁটি কথা। এই ক'বছর কবি ক'রে বেশ বুঝেছি এখনকার হাওয়া বড় নিম্নগামী।

—দেখেছো কি, আরো দেখবে! সে যুগ নেই। সেদিন তুমিই তো তোমার ব্রাহ্মণীর সেবাযত্নের কথা বলছিলে; পাবে আজকাল অমনটা। এখন বাবুরা বিবি বানানোর চেষ্টায় ঘরে বাইরে অশান্তি জুটিয়ে আনছে। ঘরের বৌদের বাবুরা পটের বিবি ক'রে রাখতে চান। গোবরে হাত লাগালে হেঁ হেঁ ক'রে উঠবেন! খানা খেতে নে যাবেন মেম-সাহেবের মতন। রাতে নিজে তো মদ গিলে রাঁড়ের মুখে খিস্তি শুনে আসবেন একচোট, আবার বাড়ীতে মাগকে খিস্তি ক'রে বলবেন খিস্তি শোনাতে। মদও ধরাবেন। তারপর বাগান-বাড়ীতে বাইজী নাচ দেখাতে নিয়ে যাবেন। ঘরের মাগের ইজ্জৎ তো ফুৎকারে উড়াচ্ছেন বাবুদের অনেকেই—সমাজটা গোল্লায় গেল! ইদানীং এক দেওয়ান রায় কিছু কিছু সত্যকথা ব'লে সংস্কারের চেষ্টা করছেন। আর এখনও নজরে পড়েনি। আমাদের হয়েছে বিপদ। অন্নদাতা ঐ সব জমিদারবাবুরাই। তাঁদের মনতুষ্টি না করলে ভাত জুটবে না। সমাজে পয়সা যার, সেই সার। তারই পোয়া বারো। ছিবড়েতেই রস চাই, তাই দিতে হবে তোমাকে। জোর ক'রে অস্থিকেই প্রমাণ করতে হবে মসৃণ ত্বক ব'লে বাবুদের হুকুমে। বদরসের রসিক যত সব!

আমার ভিয়েনের বদরস দেখেছো তো ? না দেখে থাকো, ঐ পাত্রে আছে দেখে নাও। ওতে মিষ্টির কোন কাজ হয় না। ঐ বদরস দিয়ে তোমায় নাম কিনতে হবে ফিরিঙ্গী-নন্দন দাঁড়-কবি আসরে. আজকাল, বুঝেছো।

—বুঝি ভোলানাথ, সবই বুঝি। কিন্তু এ তো সত্যপথ নয়।

—তা নয়। তবে কি জান, কাঁটায় কাঁটা সরে। খেউড়-খিস্তিতেই শালাদের চৈতন্য দিতে হবে।

—বেশ তো তাই দেবে ভোলানাথ, স্নিগ্ধ হাসি হেসে বলে এণ্টনী। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললে, কাল তাহলে তুমি সত্যিই কাসিমবাজার যাচ্ছো ?

—হ্যাঁ ভাই, তা তুমি কি উঠছো নাকি হে ?

—হ্যাঁ, বেলা হলো। আর আমিও ফিরবো বাড়ী বলরাম বৈষ্ণবের সঙ্গে গানের পাল্লা সেরে। এসেছি অনেক দিন।

—মন কাঁদছে বুঝি ? চোখ ঠেরে বললে ভোলানাথ।

—তা মন কাঁদবে না। তোমার কাঁদে না ?

—না হে হেস্নুম, আমার অবসরই নেই। ভিয়েন আর আসর, আসর আর ভিয়েন। গিন্নীর কথা ভাববো কখন। আর না ভাবলে কাঁদি কখন, হাসতে হাসতে বলে ভোলানাথ।

—কিন্তু ভাই নামটি আমার সেই অবধিই বিকৃত ক'রেই সত্যি করলে না কি ?

—আদর ক'রে ভাই, আদর ক'রে ডাকি তোমায় হেস্নুম ব'লে হে। তা তোমার ব্রাহ্মণী কি ব'লে ডাকে হে ?

—কেন—ওগো, হ্যাঁগো, শুনছো ! তোমাকে কি ময়রা ব'লে ডাকে নাকি গিন্নী ?

—ময়রা ! ওতো গালের কথা, প্রেয়সী কি ডাকে ও ডাকে। তবে বললুমতো আগে হে তোমায়, কাছে পেলে তো ডাকবে গিন্নী। এই ব'লে হাসে ভোলানাথ।

—তা বটে। চলি আজ, অনেক বেলা হলো। আবার

কলকাতা এলে দেখা হবে। পত্র দিও ভাই ভোলানাথ, এণ্টনী ভোলানাথের হাতে ধরে আন্তরিক স্বরে বলে।

—দেবো, নিশ্চয় দেবো। তুমি অন্য জাতের অন্য ধর্মের লোক হয়ে আমাদের দেশের ভাব নিয়েছো। কবিগানকে ভালবেসেছো। কবিয়াল হয়েছো—তুমি উদার মহৎ লোক ভাই। তোমার মত লোকের সঙ্গে ভাব হয়েছে এ তো আমার পরম সৌভাগ্য ! যোগাযোগ রাখবো বইকি। নিশ্চয় পত্র দেবো।

—আজ আসি ভাই।

—এস, ভোলানাথ তৃপ্ত স্বরে ব'লে উঠে।

এণ্টনী ভোলানাথের সঙ্গে করমর্দন ক'রে বিদায় নেয়।

দত্তবাবুদের বাড়ীতে কবিগানের আসর। এণ্টনীর দলের সঙ্গে বলরাম বৈষ্ণবের দলের গান।

ভীড়ে ভীড়। স্থান নেই। রাস্তায় লোক জমে।

—কি ব্যাপার, এত লোকের সমাগম কেন মহাশয় এখানে ? জনৈক পথচারী জিজ্ঞাসা করে উপস্থিত মাতব্বরকে।

—কলিকাতায় থাকা হয়, না মফঃস্বলে ?

—আজ্ঞে, উপস্থিত এই কলিকাতায়ই থাকি।

—থাকবেন না, চলে যান। সহরে হৈ-হৈ এই সব নূতন নূতন ব্যাপারে, লোকের মুখে মুখে ছুটছে কথা, আর জিজ্ঞাসা করছেন এস্থানে কি ব্যাপার !

—জানি না কি না, তাই শুধালাম।

—এখানে আজ এণ্টনী ফিরিঙ্গীর কবি-গান। এ এক দেখার মত শোনার মত জিনিস। শুনে যান মহাশয়, বলতে পারবেন দেশে গিয়ে।

—তাই নাকি ! তা একটু ভেতরে যাবার উপায় ক'রে দিন না।

—উপায় করতে পারলে কি এই সড়কে দাঁড়িয়ে থাকি। নিজ-গুণে গতরে দেখেশুনে ক'রে নিন, লোকটি এই ব'লে ভিড়ে মিশে

যায়। পথচারীও ভেতরে যাওয়ার জন্য বড় দেউড়ীর সামনে হা-পিত্যেশ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে।

ঢোলের বাজনা বেজে উঠেছে। এণ্টনী প্রথম আসরে এসেছে আজ। নটবরের ধরতা বাজনায় আসর নিশ্চুপ। এণ্টনীর দলের গানের বাঁধনদার আজ ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী।

ঠাকুরদাস সখীসংবাদের গানের কলি ধরিয়ে দেয়। বাজনা মৃদু করতে ইসারা ক'রে এণ্টনী মহড়া সুরু করে—

একবার বলিস্ ত আস্‌তে বলি মাধবকে,
প্যারী তোর সম্মুখে,
ঐ দেখ কালিয়ে কুঞ্জের বাহিরে দাঁড়িয়ে,
কেঁদে বলতেছে দয়া কর রাধিকে।

—বাঃ বেশ বেশ, একটু ঘুরেফিরে, আমরা মুখ দেখতে পাচ্ছি না —শ্রোতা উচ্চস্বরে ব'লে ওঠে।

চিকের আড়ালে মেয়েমহলে গুঞ্জন ওঠে—কি সুন্দরই না গাইছে বাঙ্‌লায় ভাই!

—হ্যাঁ, গলাটি বেশ সুরেলা, এমন ক'রে গান শিখলো কি ক'রে মাসি!

—ও গোবিন্দের ইচ্ছেয় সুরবালা!

—ও তো ক্রেশটান্, আমাদের শাস্ত্র বলবে নাকি মাসি?

—শোন শোন ওই গাচ্ছে, গাইলেই তো বুঝতে পারবি।

এণ্টনী চিতেন ধরে উচ্চকণ্ঠে—

প্রভাতে শ্রীকৃষ্ণে নিকুঞ্জের নিকটে হেরিয়ে বৃন্দে
শ্রীমতিরে কয়—

দোহাররা সুর রাখে। এণ্টনী হেলেদুলে নেচে নেচে পরচিতেন গেয়ে ওঠে—

রাধে কেঁদেছে যার আশাতে, নিশিতে,
সেই শ্যাম প্রভাতে উদয়।

এরপর এণ্টনী বিস্তার করে সুরকে। সমস্ত মানুষের অন্তর ছুঁয়ে যায় সেই সুর, ভাব-বিভোর হয়ে শোনে সবাই।

এণ্টনী গায়—

(ফুকা) কৃষ্ণ অতি ম্রিয়মান তাহে লজ্জাভয়,
মুখে আধ আধ ভাষা, গললগ্নবাসা, কাতর মাধব অতিশয়।

(মেলতা) দেখে রূপের ছাঁদ পাছে রাগ হয় উন্মাদ
কৃষ্ণ আগে তাই পাঠিয়ে দিলেন আমাকে—

এণ্টনীর সঙ্গে সঙ্গে মেলতার কলি দ্রুত থেকে দ্রুততর ক'রে গাইতে থাকে দোহাররা।

নটবর সমতালে বাজনায় লয় বাড়িয়ে তেহাই দেয়।

নটবরের তেহাই শেষে এণ্টনী গান ধরে—

খাদ যদি স্বেচ্ছা হয় বল্ গো প্রধানা গোপিকে।

ফুকা (২) কৃষ্ণ সেজেছেন অতি বিপরীত, যেন গ্রহণান্তে
শশী, উদয় হল আসি, সর্বাঙ্গে কলঙ্ক অঙ্কিতে।

মেলতা (২) নাহি সর্বাঙ্গে সুরাগ, হৃদে কলঙ্কেরি দাগ,
নাহি লাবণ্য কালাচাঁদের চাঁদ মুখে।

এণ্টনী দ্বিতীয় মেলতায় গানটি শেষ করলে শ্রোতারা উচ্চরবে সাধুবাদ দেয়।

—ভারি ভাল লাগলো হে।

—খাসা উচ্চারণ।

—বলরাম বোষ্টুম কোথায় গো, বড্ড দেরী হয় বাপু। একটু জল খেতে পারলে······

—বস বস, উঠলে জায়গা রাখতে পারবোনি বাপু।

—নে নে ভারী জায়গা তো, না হয় দাঁড়িয়ে শুনবো।

—ঐ বলরাম এসে গেছে।

—এর পাল্টাটা শুনেই যাই।

বলরাম বৈষ্ণবের দল আসরে এলো। ধরতা বাজনা সুরু করলে ঢুলি। বাঁধনদার রামসুন্দর রায় উড়ুনি তুলিয়ে বলরামকে কানে কানে কি যেন বললে।

বলরাম মিচ্‌কি হেসে ঘাড় নাড়লেন। তারপর ঢুলি বাজনা সুরু করলে দোহাররা সুর ধরলো।

বলরাম গান ধরলেন—

(মহড়া)　　কৃষ্ণ যার প্রেমের অনুরাগী এখন গো,
সেইখানে যাইতে বল
যদি আমারি হতেন শ্যাম, হতেন না আমায় বাম,
জুড়াতাম লয়ে চিকন কাল।

বলরাম আসরটা একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন দোহারদের সুর ছেড়ে দিয়ে। ঢুলি মহড়ার তেহাই দিলে বলরাম কোমরে কোষে বেঁধে নিলেন চাদরটি। তারপর কানে হাত দিয়ে চিতেন ধরলেন—

সখি আর কৃষ্ণের কথা শুনাস্‌নে,
জ্বালাস্‌নে প্রাণ গো আমার।
(পরচিতেন)　　কালরূপ চক্ষে হেরিব না আর।—

দোহাররা সুর ধরে। বলরাম ফুকা গেয়ে উঠেন—

কুল শীল লাজ পরিহরি
যার বাঁশী শুনে দাসী হলাম চরণে, করলে সেই
হরি চাতুরী।

তারপর জলদে প্রথম মেলতা ধরলেন বলরাম—

আর কালরূপ হেরব না, হেরিতে বল না,
কালার প্রেম কাল আমার হইল।

প্রথম মেলতা শেষ হলে ঢুলি বাজনা ধরল একতালে। বলরাম ধীরে খাদ গাইতে থাকেন—

মাধব আমার আশা, করি নিরাশা,
চন্দ্রাবলীর আশা পুরাইল।
(ফুকা)　　সখি জাগ্‌লেন নিশি যার আশাতে,
সেই প্রতিকূল যদি আশায় হইল,
কাজ কি এ ছার প্রাণেতে।

সুরের বিস্তার শেষে বলরাম মেলতায় ধরলেন—

কৃষ্ণ যার এখন তারই হোক, আমারই
প্রাণে শোক, কৃষ্ণ বিচ্ছেদে আমার না হয় প্রাণ গেল।

দোহাররা দ্রুততালে উচ্চরবে মেলতা গেয়ে গানটি শেষ করে।

আসরে শ্রোতারা আবার কলমুখর হয়ে ওঠে। কেউ এণ্টনীর, কেউ বলরামের প্রশংসায়, কেউবা নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে।

বয়োবৃদ্ধ সৌখীন বাবুদের কেউ আবার নাক কুঁচকে ব'লেও ওঠে, আমাদের আখড়াই গানের কাছে পেশাদার দাঁড়-কবিওয়ালাদের গান কি লাগে! আমাদের শোভাবাজারের আটচালায় নিধুবাবুর কোকিল-কণ্ঠ কি ভোলা যায়! আর নিধুবাবুর সাকরেদ বাগবাজারের মোহন-চাঁদ এখন নিজেই বাগবাজারের সখের আখড়াই দল চালাচ্ছে।

—তা চালাচ্ছে বটে, তবে তেমনটা নয়। তবে পেশাদার দাঁড়-কবিগানের থেকে অনেক মেজাজী।

—হ্যাঁ, তা যা বলেছো, এলাম শুধু এণ্টুনী ফিরিঙ্গী গাইবে শুনে। তা ভূপেন, এই ফিরিঙ্গী সাহেব বেশ আয়ত্ত করেছে ধাঁচ-ধরণ। গানের সুরে কোন খুঁত পাবে না তুমি।

—তবে উচ্চারণে একটু যেন জড়তা রয়েছে।

—না না, তেমনটা কিছুই নেই, ও তোমার মনের ভুল। ওহে এণ্টুনী ফিরিঙ্গী আসরে এলো হে। শোন না কান ক'রে, উচ্চারণে দোষ পাবে না তেমন।

এণ্টনীর দল আবার আসরে আসে। নটবর ঢোলে নতুন ধরতা নেয়। দর্শকরা শান্ত হয় আবার। এণ্টনীর সখীসংবাদ গানের নতুন মহড়ার সুর ভাসে বাতাসে।

দীর্ঘদিন বাদে সৌদামিনীকে কাছে পেয়ে কি করবে ভেবে পায় না এণ্টনী। গৌরহাটিতে ফিরে অবধি সৌদামিনীর সঙ্গে সারাদিন এ-গল্প সে-গল্প ক'রে কাছে আটকে রাখে।

আজ সৌদামিনী তাড়া দিয়ে বল্লে, কাজ আছে যাই।

এণ্টনী হাত চেপে ধরে বলে, বস বস, তুমি ছাড়া অন্য অনেকজন আছে কাজ করার। তোমার যাবার দরকার নেই।

—তা কি হয়, দেখ ঘরে ছানা কাটিয়েছি। তোমার জন্যে রসগোল্লা বানাবো যে।

—লোভ দেখাচ্ছো তো মিষ্টান্নের, হেসে ব'লে ওঠে এণ্টনী।

—লোভ দেখানোর কথা নয় গো, তুমি খেতে ভালবাস তাই। কি চেহারা হয়েছে তোমার বল দেখি, ভাল খাও-দাও দিনকতক। আচ্ছা, কলকাতায় খেতে না বুঝি সময় ক'রে?

—কেন খাবো না। তা না হলে এই নাতুসনুতুস ভুঁড়িটি কি থাকতো, এণ্টনী ভুঁড়িতে হাত বুলতে বুলতে মুচকি হাসল।

—আবার শরীর খুঁড়ছো! বারণ করেছি না তোমাকে। শরীর নিয়ে রসিকতা আমার ভাল ঠেকে না। ওতে আয়ু ক্ষয় হয়, সৌদামিনী মুখ গম্ভীর ক'রে এবার উঠে দাঁড়ায়।

—যাচ্ছো কি, বস। জোর ক'রে পালঙ্কে বসিয়ে সৌদামিনীকে এণ্টনী বলে, একটি পদ শোনাও যদি তবে ছেড়ে দিতে পারি। গাও না বৈষ্ণব মহাজনদের একটি পদ। তোমার কণ্ঠে কি অপূর্বই না শোনায়! আমি কলকাতায় থাকতে কি অভাবই না বোধ করতাম তোমার। রাতে শুয়ে মনে হতো এই বোধ হয় তুমি এলে গুন্ গুন্ সুরে পদ গাইতে গাইতে—ওঃ, কতদিন তোমার মধুর কণ্ঠে গান শুনতে পাইনি। গাও না সত্থ একটি পদ।

—দিনের বেলায় চিৎকার করলে অন্য লোকজন কি ভাববে বলতো, সৌদামিনী কপট লজ্জায় মুখ কুঁচকে বললে। কিন্তু মন ওর গরবে আহ্লাদ ক'রে ওঠে। মুখমণ্ডলে রং লাগে।

এণ্টনী এবার সৌদামিনীকে কাছে টানে, তারপর সোহাগ স্বরে বললে, যা ভাবে ভাবুক। তুমি গাও, অনেকদিন শুনিনিগো মধুমুখী তোমার গান।

সৌদামিনী কটাক্ষ হেনে বললে, কেন কলকাতায় শুনি তো গানের রাজ্যি, সেখানে কত সুন্দরীর গান শুনলে আগে বল দেখি?

—ওগো মধুমুখী তোমাকে ছাড়া আর কিছু জানি না—নিবীড় বন্ধনে বাঁধে এণ্টনী।

—ছাড়ো ছাড়ো গাইছি আমি, সৌদামিনী ব্যস্ত হয়ে বলে নিজেকে মুক্ত ক'রে।

এণ্টনী সৌদামিনীকে ছেড়ে দিয়ে হেসে বল্লে, লজ্জায় যে রেঙে উঠেছো।

—উঠবো না, বয়স বাড়ছে না বুঝি!

—তা যা বলেছো, বয়স ত হচ্ছে। কিন্তু কথা দিয়ে ভুলিয়ে কি পালাতে চাও, গান গাইবে না?

—পালাবো না গো, একবার যখন ধরা পড়েছি তখন আর কি পালাতে পারি। গাইছি, এই ব'লে সৌদামিনী হেসে গুন্ গুন্ ক'রে সুর ভাঁজে। তারপর এক সময় গুন্‌গুনানি থামিয়ে বলে, শোন এ পদের একটু ভনিতা ক'রে নিই, এই পদটি নরোত্তম ঠাকুরের মানভঞ্জন পালার, ছোট বেলায় শোনা, মনে পড়ল তাই শোন।

—বল, এণ্টনী গালে হাত দিয়ে সৌদামিনীর মুখের দিকে চেয়ে বললে।

সৌদামিনী সুললিত কণ্ঠে রসসিঞ্চন ক'রে বলে, রাধারাণীর আমার দুর্জয় মান। সখা কৃষ্ণ অনেক চেষ্টা ক'রেও যখন সেই মানিনীর মানভঞ্জন করতে পারলেন না, তখন চতুর চোর চাতুরালীই ক'রে রাধারাণীর মান ভিক্ষার ইচ্ছা করলেন। মহাদেবের কাছ থেকে আনলেন যোগীবস্ত্র। ভিক্ষুক সাজলেন। সেই ব্রজের কালা মানিনীর মান ভিক্ষার জন্য ভিক্ষুক সাজলেন। রাধারাণীর কাছে এসে ভিক্ষা চাইলেন—ভিক্ষা দাও গো সুবদনী। চতুর কৃষ্ণ মান ভিক্ষা ক'রে নিলেন রাধারাণীর কাছ থেকে। সখিগণের আনন্দের সীমা নেই। বৃন্দাবন আনন্দে মুখরিত হয়ে উঠল মানাবসানে। সেই আনন্দে ললিতা সখি রাধিকাকে বলছেন—এই ব'লে সৌদামিনী মুদিত নয়নে সুর ক'রে ব'লে 'ওঠে—আজ বৃন্দাবনে চন্দ্রগ্রহণ, পুণ্য দিনে কিছু দান কর—ও রাই বিনোদিনী এই পুণ্য দিনে কিছু দান কর; মুখবন্ধ শেষে সৌদামিনী গান ধরে—

আমি হব পুরোহিত কৃষ্ণ হবে দানি।
তুমি বসি কর দান শুন বিনোদিনী॥
শুনিয়া ললিতার বাণী, দানে বসি সুবদনী॥
তিল তুলসী জল লইয়া নিজ করে।
ভাগ্যবতী রাধিকা যৌবন দান করে॥

—সুরে ডুবে যায় সৌদামিনী। দু'গণ্ড বেয়ে অশ্রু ঝরে।

এণ্টনীও নয়ন মুদে নিথর হয়ে শোনে সৌদামিনীর গান—

কৃষ্ণ-প্রীতি-অঙ্গ রাই সমাপন কইল। সখী সব আনন্দে জয়ধ্বনি কইল॥
তবে পুন ললিতা যে বলিল বচন। কি দক্ষিণা দিব্যা মোরে আনহ এখন॥
রাই বলে কৃষ্ণ বিন্যা যাহা চাহ তুমি। সর্ব্বস্ব দিব্যার শক্তি ধরি জেন আমি॥
কৃষ্ণা বিন্যা চাহ সেই ধন। দেই আমি এইখন॥···

গানটি শেষ হলে এণ্টনী সৌদামিনীকে কাছে টেনে দরদ-মাখা স্বরে বললে, তোমার মুখে রাধাকৃষ্ণের লীলা কীর্তন ভারী মধুর। ইচ্ছে হয় দিনরাত বসে বসে তোমার গান শুনি!

সৌদামিনী হেসে বলে, শুধু গান শুনলে তো আর পেট ভরবে না। রান্নাবান্না করতে হবে। গেরস্থালীর কাজও যে আছে গো। এবার ছাড়ো। হ্যাঁ, ভাল কথা, একটি কাজের কথা জিজ্ঞাসা করি তোমাকে।

—কি বল।

—বলছি ব্যবসা-বাণিজ্যির পাট কি তুলেই দিলে?

এণ্টনী চুপচাপ সৌদামিনীর দিকে চেয়ে রইল। কিছু বললে না।

—যদি না কর, না কর; কিন্তু তোমায় বলে রাখি, তোমার দলের মাইনে গুণতে গুণতে হাত আমার প্রায় খালি।

এণ্টনী এবারও কিছু বললে না। কি যেন ভাবছে ও।

সৌদামিনী ভাবলে, ও বোধ হয় তার কথায় দুঃখ পেয়েছে। তাই সান্ত্বনার সুরে বললে, ভাববার কি আছে। কবিগানে তোমার দিনে দিনে সুনাম বাড়ছে। তুমি কবি গেয়ে আনন্দও পাও; এটিই তোমার আসল জীবিকা। কবিগানই পেশা কর না তোমার। নিজেকে সেইভাবে তৈরী ক'রে নাও।

এণ্টনী একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মৃদু হেসে বললে, আমি ওসব কথা ভাবছি না দামিনী। আমি তোমাদের রাধাকৃষ্ণের প্রেমের কথা ভাবছিলাম। ভাবছিলাম, যেসব মহাজনরা এই প্রেমের পথে ঈশ্বর

পাওয়ার কথা বলেছেন তাঁদের কথা; দেহ-মন-প্রাণ দিয়ে ঈশ্বরকে প্রিয়তম ক'রে নিজেকে সোঁপে দেবার কি অপূর্ব পথ! দেখ সন্থ, আমাদের লর্ড যিশুও ঐ ভালবাসার কথা বলেছেন, এই ব'লে এণ্টনী চুপ ক'রে কেমন যেন উদাস হয়ে চেয়ে থাকে বাইরের দিকে।

সৌদামিনী গৃহস্থালীর কথা পাড়ে না আর। উঠেও যায় না। চুপ ক'রে বসে থাকে।

কিছুক্ষণ পর এণ্টনী স্তব্ধতা ভেঙ্গে ধীর স্বরে বললে, তোমার মনে আছে বোধ হয়, একদিন চুঁচুড়া থেকে ফেরবার পথে শিশুক্রোড়ে একটি মাতৃমূর্তি দেখে আমার মা যশোদা আর মেরীমাতাকে এক সঙ্গেই মনে হয়েছিল। কেন হয়েছিল তখন অত ভাবিনি। আজ বুঝেছি সন্থ, সব ধর্মই এক প্রেরণায় একসুরে বাঁধা। যে খৃষ্ট সেই কৃষ্ট, এ আমি আজ শুধু ভাবতে পারি না দামিনী, বিশ্বাস করি। অন্তর দিয়েই বিশ্বাস করি।

—এ বিশ্বাস তোমার অটল থাকুক। এই বিশ্বাসেই সব সংশয় তুমি কাটিয়ে উঠবে, সৌদামিনী আবেগ-উষ্ণ স্বরে ব'লে ওঠে।

—অথচ দেখ সন্থ, মানুষ নামের ফেরে ঘুরে মরে। নিজ অন্তর ঈশ্বর জ্ঞান করে না। মানুষকে ভালবাসে না। শুধু প্রয়োজনে ব্যবহার করে। হয়ত আমিও করতাম। কিন্তু তোমার স্পর্শে সব সুন্দর দেখলাম!

সৌদামিনী আবেশে চোখ বুজে এণ্টনীর কাঁধে মাথা রাখে।

এণ্টনী স্নিগ্ধ স্বরে বললে, জানো দামিনী, অনেক দিন ভেবেছি তোমার সঙ্গে আমার জীবনের এই যে যোগ, যে সম্বন্ধের জন্যে আমি আমার জাতের কাছে হেয়, এটি কি মোহ, না ঈশ্বর-প্রেমের প্রাথমিক সোপান? তুমি হয়ত লক্ষ্য করেছো আমার অস্থিরতা চন্দননগরে থাকতে—কতদিন রাত্রে উঠে আমি পায়চারী ক'রে বেড়িয়েছি আর ভেবেছি এ সব কথা।

সৌদামিনী এবার কাঁধ থেকে মাথা তুলে তার টানা টানা চোখ তুলে চাইল এণ্টনীর মুখের দিকে। তারপর ঘাড় নেড়ে স্মিতহাস্যে

বললে, দেখেছি বইকি। আর আমারও কি কম কথা মনে হয়েছে না কি, বামুনের ঘরের বাল্য-বিধবা আমি ; জ্বালা কি আমারও ছিল না, ছিল। তোমাকে কাছে পেয়ে যখন মনের উত্তেজনা কমেছে, তখুনি আরো জ্বলেছি মনে মনে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, তোমার মনে আমার জন্যে যে আকুলতা দেখেছি, সেই হয়েছে আমার শীতল প্রলেপ গো। চিন্তায় যখন রাতে ঘুম ভেঙ্গে গেছে আচমকা, প্রদীপের আলোতে যখন তোমার শান্ত মুখ দেখেছি তখুনি আমার বৈষ্ণব মহাজনদের বাণীর কথা মনে হয়েছে। মন তোমার মুখছবি দেখেই বলেছে "বঁধু তুমি যে আমার প্রাণ। দেহ মন আদি তোমারে সোঁপেছি কুল শীল জাতি মান।" সান্ত্বনা পেয়েছি। প্রেমের কাছে জাতি কুল মান কিছু নেই। ঈশ্বরের কাছে সব মানুষ যেমন এক, মানুষের কাছে মানুষ তেমনি এক। ভেতরের বস্তুই আসল গো, ও বস্তু ভগবানের দেওয়া, ওর কোন জাতি নেই গো। তাইতো তোমাকে নির্ভয়ে সব সোঁপেছি—আবেগে নিবীড় ক'রে জড়ায় এন্টনীকে সৌদামিনী।

কয়েকটি মুহূর্ত নীরবে কাটে। কেউ কথা বলে না। দুজনে দুজনার বুকের শব্দের সঙ্গে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনে।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেলে সৌদামিনী ধীরে ধীরে বলে, তোমার মনের দ্বিধা যে জয় করেছো তা আমি জানি গো। আমরা জাতে মেয়েমানুষ, হাঁড়ির একটি ভাত টিপলেই সব বুঝতে পারি।

এন্টনী সৌদামিনীর চুলগুলো হাত দিয়ে চূর্ণ করার নিষ্ফল চেষ্টা করতে করতে বলে, দ্বিধা আমার কেটেছে। একটি মানুষকে ভালবাসলেই সকলকে ভালবাসা যায় মধুমুখী। সমস্ত ধর্মেরও ঐ সুর—মানুষকে ভালবেসে ঈশ্বরকে ভালবাস। অথচ মানুষ কি অন্ধ। বিচারের গোঁড়ামি আর বিভেদ টেনে টেনে জাতের বিচার ক'রে ক'রে আসল বস্তুটির সন্ধান হারায়।

—ঠিক বলেছো গো তুমি। ভারী সুন্দর পরিষ্কার তোমার ধারণা গো। আজ আমার বড্ড আনন্দ হচ্ছে—সৌদামিনী উজ্জ্বল চাহনিতে চেয়ে থাকল এন্টনীর মুখের দিকে।

—যা কিছু ধারণা সে সবই তোমার কাছ থেকেই শিখেছি দামিনী। তোমাকে শুধু ভালবাসিনি সত্ন, শ্রদ্ধাও করি। অনেক জ্ঞান পেয়েছি। সত্য কি তা বুঝতে তুমিই পথ দেখিয়েছো।

—অত বোলো না গো, দেমাক আমার বেড়ে যাবে।

—ঠাট্টা নয় সত্ন, সত্যিই; মা ভবানীকে আর গির্জায় যিশুকে ভজনা করতে পারি শুধু তোমার দেওয়া শিক্ষায় আর জ্ঞানে। শক্তিতত্ত্ব সম্পর্কে যা জানি তা তোমার কাছ থেকে। শুধু রাজা সুরথই কেন, সমস্ত মানুষই তার মনস্কাম পূর্ণ করতে পারে শক্তি উপাসনায়। আর এই বিশ্বাসের সঙ্গে লর্ড যিশুর ঈশ্বরপ্রেমের প্রতি পরম শ্রদ্ধা করার শিক্ষা আমি তোমার কাছ থেকেই পেয়েছি দামিনী।

—তোমার এই জলের মতন স্বচ্ছ ধ্যান-ধারণায় আমার বল যেন শত গুণ বেড়ে গেল! কিন্তু কবি এবার আমায় ছাড়ো, আমার সংসার যে মাটি হবে। ওগো লক্ষ্মীটি সোনাটি রান্নাঘরে যাই এবার, চঞ্চল খুসীর স্বরে ব'লে ওঠে সৌদামিনী। অনেক দিন বাদে মনটা ওর হাল্কা হয়ে উঠেছে। কোন গ্লানি নেই।

এণ্টনী একটি নিঃশ্বাস ফেলে স্বাভাবিক স্বরে বললে, যেতে দিতে পারি এক সর্তে।

—কি সর্তটা তোমার শুনি?

এণ্টনী হেসে বললে, আজ যদি পরমান্ন খাওয়াও, তোমার হাতের পরমান্ন, অমৃত!

—এই তোমার সর্ত! বেশ খাওয়াবো। কিন্তু এখন নয়, রাত্রে।

—কিন্তু আমার একটি উপসর্ত আছে যে।

—তাই নাকি!

—হ্যাঁ, দ্বিপ্রহরে আহারের পর আমাকে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শোনাবে আগে বল?

সৌদামিনী এক ঝলক হেসে বললে, শোনাবো গো, এখন তাহলে আসি, কথা শেষে যাবার উদ্যোগ করে।

—এস, আর কাউকে দিয়ে কয়েক খিলি পান আর এক ছিলিম তামাক পাঠিয়ে দিও।

আবার ঘুরে দাঁড়ায় সৌদামিনী, তারপর চোখ পাকিয়ে বলে, বড্ড কিন্তু পান খাওয়া বেড়ে যাচ্ছে তোমার। অত পান খাও কেন বল দেখি বাপু?

—রঙ্গীন মন যে আমার মধুমুখী। ঠোঁট রাঙাই তোমার দেওয়া রঙে, তাম্বুল ত উপলক্ষ্য গো! কথান্তে এণ্টনী তরল হাস্যে ঘর ভরিয়ে তোলে।

—কথার বাহার খুব শিখেছো। ঘুরে আসি, আমিও দেখাচ্ছি, তীব্র কটাক্ষ হেনে সৌদামিনী ঘর থেকে যাবার উদ্যোগ করে।

এণ্টনী চেয়ে চেয়ে দেখে আর হাসে।

দিন যায়। বেশ সুখেই ভাবে-আনন্দে দিন যায়। এণ্টনীর কবিদলের সুনামও বাড়ে। বিভিন্ন জায়গায় গান হয়। বিশ্রাম নেবার অবসরও থাকে না। সদাই ব্যস্ত এণ্টনী—হয় মহলায়, না হয় গানের আসরে। নেশার মতনই কবিগানে বুঁদ হয়ে থাকে এণ্টনী। অর্থচিন্তার কথা মনে হয় না। টাকার দরকার হলেই সৌদামিনীর ডাক পড়ে। সৌদামিনী নীরবে টাকা বের ক'রে দেয়। সখের দল প্রতিপালিত হয়।

কিন্তু আর্থিক অবস্থা দিন দিন সঙ্গীনই হয়ে ওঠে। সৌদামিনীর সদাহাস্য মুখে সময় সময় অন্ধকার ঘনিয়ে আসে—কি যে হবে! হাত প্রায় খালি হয়ে এলো। অভাবের খবর শুনিয়ে এণ্টনীকে বিরক্ত করেনি এতদিন। নিজেই সামলে নিয়ে চলেছে সৌদামিনী।

কিন্তু আর চলে না। আজ সকালে যখন জোর তলব পাঠালে এণ্টনী রামচরণকে দিয়ে, তখনই মুখ কালো হয়ে ওঠে। মহলার আসর থেকে এ সময় এণ্টনী ফেরে না বাড়ীর ভেতরে। তাই সন্দেহ হলো সৌদামিনীর নিশ্চয় টাকার প্রয়োজন—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে হাত ধুয়ে কাপড়ে জল মুছতে মুছতে ঘরে এলো। তারপর ম্লান হেসে এণ্টনীকে জিজ্ঞাসা করে, কি ব্যাপার অসময়ে তলব যে?

—ব্যাপার হলো আর কি, টাকা চাই। শতখানেক টাকা দাও দেখি, এণ্টনী ব্যস্ত হয়ে ব'লে ওঠে।

—অত টাকা তো নেই।

—নেই, এই সেরেছে! কিন্তু এদিকে যে মহাবিপদ, গোরক্ষকে টাকা না দিলেই নয়। কিছু দাও, মিনতির সুরে বলে এণ্টনী।

সৌদামিনীর শুকনো মুখ আরো শুকিয়ে যায়।

—কি হলো, কথা বলছো না কেন? ক্ষোভ প্রকাশ পায় এণ্টনীর স্বরে।

—গোটা তিরিশ টাকা আছে তা আমি দিতে পারি, কিন্তু তারপর কি করবো আমি! কি ক'রে সংসার চলবে—হতাশ স্বরে বললে সৌদামিনী।

এণ্টনীর মুখখানা বিরস হয়ে ওঠে। কিছু বলে না। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ দুজনেই।

সৌদামিনীর মায়া হয় এণ্টনীর ম্লান মুখ দেখে। এ মলিন মুখ সহ্য হয় না। তাই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ও টাকা বার করতে করতে বলে, না দিলে যখন চলবে না, যা আছে দিয়ে দাও। মা ভবানীর ইচ্ছে যা তাই হবে।

এণ্টনী যেন একটু বল পায় মনে, তবু সঙ্কোচের সঙ্গে বলে, গোরক্ষনাথ মানুষ সুবিধের নয় তাই, তবে ভাবনা করো না তুমি, এবার থেকে পয়সা নিয়েই গান করবো।

সৌদামিনী টাকাকড়ি সম্পর্কে আর কিছু বল্লে না। শেষ কপর্দক এণ্টনীর হাতে দিয়ে রান্নাঘরের দিকে যাবার উদ্যোগ ক'রে বললে, পাক করা হয়ে গিয়েছে, স্নান সেরে খেয়ে নাও।

—আগে দাঁড়াও গোরক্ষকে টাকা দিয়ে কালকের গানের ব্যবস্থাটা ওর সঙ্গে পাকা ক'রে আসি, এই ব'লে সৌদামিনীর আগেই ব্যস্ত হয়ে ঘরে থেকে বেরিয়ে যায় এণ্টনী।

সৌদামিনী নিশ্চুপ হয়ে আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে ঃ বাহ্যজ্ঞান যেন হারিয়ে গেছে। কোন দিশা পায় না—কি হবে, তবে কি সব

আশা ব্যর্থ হবে! না না, মা ভবানী ওকে রক্ষে করো এই বিপদের দিনে—ভবানী স্মরণে চকিতে সম্বিৎ ফিরে পায় সৌদামিনী। ও পরম ভক্তিপূর্ণ মনে গলায় আঁচল দিয়ে করজোড়ে ভবানীর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে মৃদুস্বরে ব'লে ওঠে, ওকে দেখ, বড় ভালমানুষ ও, ওর মঙ্গল করো মা মঙ্গলময়ী।

ভবানীর ইচ্ছে কি না কে জানে! তবে সৌদামিনী মনের জোরে সবদিক বজায় রাখে। ওপর থেকে এণ্টনীকেও বুঝতে দেয় না কি ক'রে সব চলছে। জানে শুধু একজন। সে হলো বুড়ো রামচরণ। চুপিচুপি কথা হয় পাকশালে সৌদামিনী রামচরণে। মাঝে মাঝে কি যেন দেয় সৌদামিনী রামচণের হাতে। রামচরণ সন্তর্পণে তা নিয়ে যায় মুখ ভার ক'রে।

কিন্তু ধরা পড়ে একদিন এণ্টনীর কাছে সৌদামিনী, যখন হাতের চুড়ের স্পর্শ পেলো না রাতে ওর হাতে হাত বুলোতে বুলোতে। তখুনি জিজ্ঞাসা করে—তোমার গহনাগুলি কোথায় সত্ব?

সৌদামিনী প্রথমটা চুপ ক'রে থাকে। তারপর হেসে বলে, আছে গো আছে, অন্ধকারে গহনা পরে তোমাকে দেখাবো নাকি, তুলে রেখেছি।

বিশ্বাস করে না এণ্টনী। কিন্তু কিছু বলে না। ও শুধু বিছানা ছেড়ে ঘরময় পাইচারী করতে থাকে।

সৌদামিনী প্রথমটা সাহস পায় না এণ্টনীকে কিছু বলতে। প্রদীপের ম্লান আলোতে ওর গম্ভীর মুখ দেখে চুপ ক'রে থাকে বেশ কিছুক্ষণ সৌদামিনী। তারপর অনেক সময় গেলে ধীরে ধীরে বিছানা ছেড়ে এণ্টনীর কাছে যায়। গায়ে হাত রেখে স্নিগ্ধ স্বরে বলে, চল শোবে চল, অনেক রাত হয়েছে। ভাবনার কি আছে। টাকা নেই তাই বিক্রি করেছি। আবার যখন টাকা হবে তুমি কিনে দেবে। তুমি তো বলেছো আমাকে, এবার থেকে পয়সা-কড়ি নিয়েই গাইবে; গান গেয়ে কত টাকা আনবে তুমি, তখন সব হবে গো সব হবে! তখন আমাকে না হয় গহনায় মুড়ে রেখো—এস দিকি এখন, এস বলছি,

সৌদামিনী জোর ক'রে টেনে নিয়ে আসে এণ্টনীকে। তারপর সোহাগ-ভরে চুম্বন ক'রে নিজের বাহুডোরে বাঁধে।

এণ্টনী বেদনায় হাউ হাউ ক'রে কেঁদে ওঠে সৌদামিনীর সোহাগ-স্পর্শে।

সৌদামিনী সান্ত্বনা দেয় গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে—ছিঃ কাঁদতে আছে, আচ্ছা পাগোল তো তুমি।

—তুমি বুঝছো না সত্থ, কি অন্যায় না করছি তোমার ওপর।

—না গো না, কোন অন্যায় নয়, তোমায় আমায় আলাদা ক'রে ভাবছো কেন ; আমরা যে এক ! তুমি হাসলেই যে আমি হাসবো গো, তুমি কেঁদো না, মনে বল আনো, দেখবে কিছু বিপদ নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে।

এণ্টনী কিছু বলতে পারে না। সৌদামিনীর কাঁধে মুখ লুকিয়ে ফোঁপানো দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে।

•

সে রাতের পর থেকে এণ্টনী আপ্রাণ চেষ্টা করছে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে। নটবরকে স্পষ্ট ব'লে দিয়েছে, টাকা ছাড়া আর বায়না নেবে না। নিজেদের কথা এবার আর না ভাবলে চলছে না নটবর।

—সে তো সত্যি কথা। পেশাদার দলের সঙ্গে যখন গান করছি তখন টাকা নেবো না কেন !

—দেখ, হারু একটা বায়নার কথা বলছিল, তেলিনীপাড়ায় বাঁড়ুজ্জেদের বাড়ীর, তা বলেছি পঞ্চাশের কম নয়।

—বেশ করেছো ওস্তাদ। এইবার ঠিক ঠিক কাজ হচ্ছে তোমার। এই নাও খাও, একটু মৌজ করো দেখি।

এণ্টনী ম্লান হেসে বললে, ও এখন খাবো না, ভাল লাগছে না।

—মন খারাপ করছো কেন ওস্তাদ। সব জিনিসের সাদা কালো আছে, অত ভাঙ্গলে চলে ? নাও নাও, খাও।

—দাও, অনিচ্ছা সত্ত্বেও কল্কেটি হাতে নিয়ে মুখে তোলে এণ্টনী।

নটবর এণ্টনীর মনের হতাশভাব লক্ষ্য ক'রে প্রসঙ্গ পালটায়। নখ দিয়ে মেঝেতে দাগ কাটতে কাটতে বলে—আচ্ছা ওস্তাদ, ভোলাময়রা তো শুনেছি আজকাল রাম বোসের মত আসরেই গান বেঁধে ধরতা পাল্টা করছে।

এণ্টনী একটা জোর দম দিয়ে বলে, হ্যাঁ শুনলাম, তা আমাদের আর ভয় কি। আমরাও সেভাবে তৈরী। তবে কি যেন, মেজাজ পাচ্ছি না। টাকা-পয়সা হাতে না এলে ঠিক মনটা বসছে না।

—ও সব ভেবো না ওস্তাদ, লক্ষ্মীদেবী ঠিক সদয় হবে। ও ভেবে মন খারাপ করো না। হ্যাঁ, ভাল কথা ওস্তাদ, কাল মেয়ে কবিউলীর সঙ্গে কি রকম কি করবে বল দেখি শুনি? ওরা কিন্তু হেঁয়ালী আর সমস্যা বড্ড করে, ওস্তাদ সেদিকে খেয়াল রেখো।

—কিছু ভাববার নেই নটবর, গোরক্ষনাথ আছে, আর আমারও তো একটা মন তৈরী হয়েছে হে।

—তা তো বটেক, তোমার গান বাঁধা খাসা! নূতন গান বাঁধলে নাকি?

—না হে, মন ভাল না। আজকাল মনে গান আসেই না। তার ওপর ঠাকুরদাসের অনেকগুলি গান নিয়েও ব্যস্ত, সে তো দেখছোই। ভাল কথা, একটা খবর শুনেছো নটবর?

—কি ওস্তাদ, নটবর আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞাসা করে।

—রাম বসুর অনুগৃহীতাকে দেখেছো তো কলকাতায়?

—অনুগৃহীতা! একি আবার শব্দ শোনালে ওস্তাদ। খুলে বল বাপু, দিন দিন কোথা থেকে কি সব বিদ্‌ঘুটে শব্দ আমদানি কর, বুঝতে গেলে রীতিমত ভাবতে হয়।

এণ্টনী হাসে একচোট উচ্চহাসি। মনটাও বেশ হাল্কা হয়ে এসেছে। মেজাজী স্বরে বললে, আরে রাম বসুর স্ত্রীলোক হে।

তাই বল, হেঁ হেঁ···এই কথা বললেই তো চুকে যেতো ন্যাটা। তা কি হয়েছে তেনার, তেনার নাম যেন কি—ও হ্যাঁ, যজ্ঞেশ্বরী। উনিও বেশ গান বাঁধেন।

—তা বাঁধেন, তবে এবার কাসিমবাজারে ভোলানাথের কাছে নাজেহাল হয়েছেন, হেসে বলে এণ্টনী।

—কোথায় শুনলে ওস্তাদ ?

—ভোলার সেই বেঁটে দোহারটির সঙ্গে যে কাল দেখা হয়েছিল, সেই বলছিল যজ্ঞেশ্বরীকে এক হাত নিয়েছে ভোলানাথ।

—কাকে নিলে ভোলা আবার, নিতাই মহলাঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললে। নিতাইয়ের পেছু পেছু হারু, বিশে, জগন্নাথও ঘরে ঢোকে।

—যজ্ঞেশ্বরীকে ভোলানাথ নিয়েছে রে, নটবর মেজাজী স্বরে বললে উচ্চরবে।

—কি রকম নিলে একটু খোলসা ক'রে কও না ওস্তাদ। আমরা শুনি একটু, বিশে হাজরা হাঁটু মুড়ে বসে বললে।

এণ্টনী নটবরের হাত থেকে কল্কে নিয়ে মৌজ ক'রে একটি টান দিয়ে কল্কেটা নিতাইয়ের হাতে দেয়, তারপর বলে, ভোলানাথের সঙ্গে পেরে উঠবে না ব'লেই যজ্ঞেশ্বরী আসরে নেমেই বললে, আমি মাতা তোমার, তুমি পুত্র আমার, এই ব'লে চুপ করলে এণ্টনী।

—থামলে কেন ওস্তাদ, বল। ভোলানাথ কি জবাব দিলে সেটি বলেনি তোমাকে পঞ্চা দোহার ?

—বলেছে বইকি। এসে বলছি। জানালা দিয়ে কি লক্ষ্য ক'রে এণ্টনী ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

বাইরে বাগানে রামচরণ একটি গরু নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। এণ্টনী দ্রুত ওর কাছে গিয়ে গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করে, কোথায় যাচ্ছো রামচরণ ?

বুড়ো রামচরণ একটু থতমত খেয়ে যায়। বেশ খানিকটা সময় যায় উত্তর দিতে ওর।

—কথায় জবাব দিচ্ছো না যে ? এণ্টনীর স্বরে উষ্মা প্রকাশ পায়।

—আজ্ঞে, ঠাকরুণ এই গরুটি দিয়ে দিলেন। বললেন, তোমার মেয়েকে দিও, তাই হুজুর নে যাচ্ছি।

চকিতে এণ্টনীর মুখমণ্ডল কেমন যেন পাংশু হয়ে ওঠে। স্বর বের হয় না মুখ দিয়ে।

—রামচরণ ভীত হয়ে ব'লে উঠে, আমার অন্যায় লেগেছে হুজুর, আমি গোয়ালে নে যাচ্ছি।

এণ্টনী ঘাড় নেড়ে জনায়, না।

রামচরণ বোবার মতন দাঁড়িয়ে থাকে তবু।

—দাঁড়িয়ে রইলে কেন, নিয়ে যাও। মেয়ের বাড়ীতে ওকে রেখে এস, বিকৃত স্বরে বললে এণ্টনী রামচরণকে। তারপর আর দাঁড়ালো না, সোজা মহলাঘরেই আসে। আবার নেশা করে। ছিলিমের পর ছিলিম গাঁজা খায়। কারুর সঙ্গে কথাও বলে না।

দলের লোকেরা পরস্পর মুখ চাওয়াচায়ি করে। নটবর বোঝে কি দুঃখ ওস্তাদের। তাই বারণ করে না অন্য সময়ের মতন অত নেশা করতে। ছিলিম নিজেই বানিয়ে দেয় একের পর এক।

নিতাই রসিকতা করে, ওস্তাদ কি আজ খালি টেনেই যাবে মুখ বুজে, কিছু বলবে না।

এবার এণ্টনী তার টকটকে লাল চোখ দুটোকে প্রসারিত ক'রে কর্কশ স্বরে ব'লে ওঠে, কি শুনতে চাও বল, গাঁজার মাহাত্ম্য? বলবো, বাবু ভবতারণ যেমন ক'রে বলতো তেমনি ক'রেই বলবো, কি শুনতে চাও বল?

নিতাই আমতা স্বরে ব'লে ওঠে, শুনার জন্যে নয়, তুমি ভোলানাথের কথা বলছিলে না, তাই আর কি।...

—ভোলানাথ মানে কবিওয়ালা ভোলানাথের কথা বলছো কি?

—হ্যাঁ ওস্তাদ, খানিকটা ভীত স্বরেই নটবর বলে।

—এই নাও খাও নিতাই, বলেছিতো তোমায় মৌজ ক'রে নাও আগে, তারপর ভোলানাথ শুনো, দুগ্ধ মিষ্টান্ন চাই না নিতাইচরণ?

নিতাই ভয়ে ভয়ে বললে, হলে মন্দ হয় না ওস্তাদ।

—তাই নাকি! ওহে নটবর আমার ঘরণীকে তলব ক'রে দুগ্ধ মিষ্টান্ন নিয়ে এস, যাও যাও।

নটবর নিতাইকে মুখ ভেংচে উঠে যায়। নটবর উঠে গেলে এণ্টনী বললে, নিতাইবাবু একটা কথা বলি শোন, মানুষ যখন ইচ্ছে ক'রে লোভী হয় তখন লভ্য বস্তু জোটে না। আর যখন ত্যাগী হতে ইচ্ছে করে তখন ভোগ্য বস্তু ঘিরে থাকে—এই দেখ না, যজ্ঞেশ্বরী মাতা হবার ইচ্ছে করলেন আর ভোলা সেই ইচ্ছেকে গাল দিয়ে বললে—

তুমি মাতা যজ্ঞেশ্বরী, সর্ব্ব কার্য্যে শুভকরী
তোমার ঐ পুরাণো এঁড়ে রাম বোস বাপ,
যেমন পিতা তেমনি মাতা, ভোলানাথের অভয়দাতা
মা-বাপ ঠিক লাগিয়ে দিলে খাপ ॥
এখন মা! সুধাই তোরে, কেন এসে এই আসরে
ঘন ঘন দিচ্ছো জোরে ডাক ॥
বুঝি তোমার হয়েছে কাল, বেহায়ার নাই কালাকাল
তাই বাবুদের সভায় এত হাঁক ॥
তোমার পুত্র ভোলানাথ গুণধর, সকল কাজেই অগ্রসর,
পঞ্চ পিতা, সপ্ত মাতা, শাস্ত্রে শুনেতে পাই
তুমি আমার গাভী মাতা, চল তোমায়—যাই ॥

—বাহবা, বেশ দিয়েছে কিন্তু, বিশে উল্লাস প্রকাশ ক'রে ব'লে ওঠে।

এণ্টনী হাসে মৃদু, কিছু বলে না আর। মন ভোলাবার চেষ্টা ক'রেও পাচ্ছে না। বারে বারে কেমন যেন অন্ধকার হয়ে আসে সব; কিছু দিশে পায় না এণ্টনী।

—আচ্ছা ওস্তাদ, তোমার কি হয়েছে আজ, তেমন মেজাজ দিচ্ছো না?

এণ্টনী চোখ বুজেই বলে, মেজাজের অভাব কোথায় নিতাইবাবু, অভাবটা টাকাকড়ির, তোমাদের বেতন মাস তিনেক দিতে পারিনি ঐ অভাবেই। সত্যি ভাই, টাকাকড়ি হাতে না এলে আর কিছু যেন ভাল লাগছে না।

—এবার তো পেয়ে যাবো সব টাকাকড়ি, কি বল ওস্তাদ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ, পাবে বইকি, সব মিটিয়ে দেবো, এণ্টনী ব্যস্ত হয়েই মুখ কাঁচুমাচু ক'রে ব'লে ওঠে।

—এই নাও ওস্তাদ দুধ আর শর্করা। আমি এবার চলি।

—সে কি রে, খেয়ে যা, নিতাই ব'লে ওঠে।

—তুই খাস আমারটা, তোর তো আম্মা বেশী। কম্মের মধ্যে তো তুই, খাই আর শুই ; শালা একটা উপ্‌গারে নেই, খালি গেলন!

—আঃ নটবর, শুধুমুদু রাগ কর কেন, এস বস, খেয়েদেয়ে বরাত থাকে যাও, এণ্টনী ব'লে ওঠে।

—না ওস্তাদ, এসব বাপু আমার ভাল লাগে না। দলের দিকে নজর নেই, খালি গাঁজার সাজ হচ্ছে, আর মৌতাতের তরিবৎ!

—রাগ করিস্‌ কেন ভাই, বস্‌ বস্‌। জান ওস্তাদ, নটু আমাদের আজকাল আর মেয়েমানুষ মেয়েমানুষ করে না।

—থাম থাম গোয়ালা-বুদ্ধি, আশি না পেরুলে বুদ্ধি হয় না। কথা বলিস্‌নে! কে কি করে না করে সে খোঁজ না ক'রে দোয়ারকি শেখ্‌ দিকি। সুর লাগাতে পারে না, আবার কথা বলছে।

—ক্ষ্যামা দাও নটবর, বস বস।

এণ্টনীর কথার পর নটবর আর কথা বাড়ায় না। ধপ ক'রে বসে পড়ে।

নিতাই নটবরের কথার কোন প্রত্যুত্তর করে না, ও এণ্টনীকে বলে, আচ্ছা ওস্তাদ শাস্ত্রের কথা যে ভোলা বল্লে, ঐ যে পঞ্চ পিতা, সপ্ত মাতা—ও সম্বন্ধে কিছু জান নাকি?

এণ্টনী খুসীই হয় নিতাইয়ের প্রশ্নে। মানের মধ্যে গুমরোনি ভাব কেটে গেছে আগেই, হাসিমুখে স্বাভাবিক স্বরে বললে, তা তোমাদের ঠাক্‌রুণের দৌলতে এ সব জানা আছে হে; পঞ্চ পিতা হ'ল গিয়ে তোমার—অন্নদাতা, ভয়ত্রাতা, শ্বশুর, কর্তা আর জন্মদাতা। সপ্ত মাতা হ'ল তোমার—গর্ভধারিণী, গুরুপত্নী, ব্রাহ্মণপত্নী, রাজপত্নী, গবী, ধাত্রী আর বসুমাতা, বুঝলে নিতাই।

—হুঁ, ঘাড় নেড়ে জানায় নিতাই।

নটবর বিকৃত মুখভঙ্গি ক'রে ব'লে ওঠে, ঘোড়ার ডিম!

—তুই থাম দেখি, নে নে দুধ খা, নিতাই হাল্কা হাসি হেসে বললে।

—ভোলার বুদ্ধি খুবই তীক্ষ্ণ হে, এণ্টনী তারিফের সুরে ব'লে ওঠে।

—তোমারই কি কম, তোমার সুনামের অন্ত নেই আজকাল। চারদিকেই তোমার নাম ছড়িয়ে পড়েছে।

—আরে বাবু নিতাইচরণ, সুনাম নানাভাবেই করা যায়; যেমন সুরে, গলায়, ভক্তিতে। কিন্তু ভোলার ব্যাপারই অন্য। ওর হ'ল ধারালো কাতানের মতন চাপান-কাটান। উপস্থিত-বুদ্ধি, আমি যা দেখলাম কবি-ওস্তাদদের, সবার থেকেই ওরই বেশী।

—তা বটে। তবে তুমিও কম নয়। তোমার বুদ্ধির তুলনা নেই ওস্তাদ।

এণ্টনী কিছু বলে না। চুপ ক'রে বসে থাকে।

নটবর বলে, তুমি একবার বাড়ীর ভিতর যাও দেখি, ঠাকুরুণ ডাকছেন, ঘুরে এসে কথা বল।

—তাই নাকি! খানিকটা বিস্ময়ের সঙ্গে ব'লে চমকে উঠে দাঁড়ালো এণ্টনী। তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আলতো স্বরে বললে, তোমরা বস, আমি ঘুরে আসছি—ম্লান মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় এণ্টনী।

অভাব-অনটনে সদা-হাস্যময় এণ্টনীর মুখে কালো অন্ধকার ঘনায়। সময় সময় কোন কূলকিনারা পায় না। কি দিয়ে কি হবে। ভেবে ভেবে অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়ায়। দলের লোকজনের বেতনাদি দিতে না পারায় মনোকষ্টের সঙ্গে লজ্জায় নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকে। আগের মত প্রাণখুলে আড্ডা দিতে পারে না এণ্টনী। শুধু নেশার মাত্রা বাড়ে।

দলের লোকজনদের মধ্যে, বিশেষ ক'রে নিতাই, বিশে হাজরা, জগন্নাথ ইত্যাদি পাঁচকথা বলে আড়ালে। ঠাট্টা-বিদ্রূপও করে নিজেদের মধ্যে এণ্টনীকে নিয়ে।

এণ্টনীর সঙ্গে সঙ্গে নটবরও উঠে গেলে বিশে হাজরা মুখ বেঁকিয়ে বললে, কত গেল রথারথি, এলেন এবার শেওড়াতলার চক্কত্তি।

—চুপ চুপ, শুনতে পাবে যে শালা নটু, নিতাই ফিস্ ফিস্ ক'রে ব'লে ওঠে।

—চুপ করবো কেন রে! গরীবকে ভাতে মারবে আর বলবুনি সে কথা—আর যাবুনি শালা গানে! বিশে বিরক্তি নিয়ে ব'লে উঠল।

নিতাই বিজ্ঞের মত বলে, ঐ বামনীই ফিরিঙ্গী এণ্টনীর কাল। ঐ মাগীটার পেছনে গুড় ঢেলে ঢেলেই ত ওস্তাদের এই দেউলে-দশা—তা বাবা ছেড়ে দে-না, বাজারে চরে খাবে, তা নয় হিন্দুঘরের বর-বৌ সেজে কলা চুষগে যা! হয়েছে কি, আরো পস্তাবে। বাবা, যা রয় সয় তাই কর।

—তা যা বলেছো নিতাইদা; আমরা মরবো না খেয়ে ওনার জন্যে খেটে, আর উনি মাগের খরচ মেটাতে সর্বস্বান্ত। তা কথায় আছে না—ট্যাঁকে নাই টাক, মাগ বেচে থাক! তাই কর না বাপু, বিশে হাজরা কুৎসিৎ ভঙ্গি করে।

বিশের কথা শুনে নিতাই-জগন্নাথ-হারু হাসাহাসি করে।

দলের লোকজন নিজেদের মধ্যে এণ্টনীর কেচ্ছা করলেও সামনা-সামনি আগের মতই খোসামোদ করতেই থাকে। কিন্তু এণ্টনী বোঝে ওদের মনোভাব; তাই নটবরকে একদিন আড়ালে ডেকে হাত ধরে শুষ্ক করুণ কণ্ঠে বললে, তোমাদের বেতন দিতে পারছি না ব'লে আমিও কম লজ্জায় নেই নটবর।

নটবর ব্যস্ত হয়ে আন্তরিক দরদ-ঢালা স্বরে বললে, আমি তা জানি ওস্তাদ, তোমাকে চিনি তো—কম দুঃখ্খু তোমার! ঘোঁট পাকাচ্ছে ঐ নিতে শালা, এবার টাকা হাতে এলে ও ব্যাটাকে মিটিয়ে আগে বিদেয় করো—বড্ড পাজি ও!

এণ্টনী ম্লান হেসে বলে, পাজি ওকে ওর অভাবই করিয়েছে নটবর। আর আমিই তো সেজন্য দায়ী। যাক দিনকতক ধৈর্য

ধরতে বল সবাইকে ; আমি সব মিটিয়ে দেবো। তোমাদের এইটুকু উপকার ভাই করতেই হবে।

—অত ভাবতে হবে না তোমায় ওস্তাদ। তুমি কিছু চিন্তা করো না, সব ঠিক হয়ে যাবে।

এণ্টনী শুষ্ক হাসি হেসে বললে, আমিও সেই আশাই করি। দেখা যাক, এই ব'লে আপন খেয়ালে মাথা নীচু ক'রে গম্ভীর মুখে বাগানের মধ্যে পায়চারী করতে থাকে।

নটবর চিন্তাগম্ভীর এণ্টনীকে আর কিছু ব'লে বিরক্ত করতে সাহস করে না, ও একটি সহানুভূতিসূচক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চলে যায়।

এণ্টনীর কিছুই যেন আর ভাল লাগে না—আড্ডা, নেশা, গান, এমন কি সৌদামিনীকে এড়িয়ে চলতে চায় মন। সৌদামিনী চোখের সামনে এলেই চোখের সামনে সংসারের দৈন্যটা ভেসে ওঠে। কিন্তু সময় সময় আশ্চর্য হয়ে ফ্যালফ্যালে চোখে সৌদামিনীকে দেখে আর ভাবে, এই অভাব-অনটনে কি অপরিসীম ধৈর্য আর বুদ্ধি দিয়ে সংসারের সব দিক সব ঠাট বজায় রেখে চলেছে হাসিমুখে ঃ এই ভাবনায় বলও পায় এণ্টনী সাময়িক। কিন্তু চিন্তা যায় না, আবার জড়িয়ে ধরে।

দিন দিন মুষড়ে পড়ে চিন্তায়। সৌদামিনী কথায়-বার্ত্তায় খুসীর ভাব দেখিয়ে ওকে সহজ স্বাভাবিক করতে সব সময়ই চেষ্টা করছে। কিন্তু এণ্টনীর মন মানে না, দিন দিন ভেঙ্গে পড়ে। এর ওপর মেয়ে-কবিয়ালের সমস্যার কাছে হেরে আরো যেন মুষড়ে পড়লো। সারাদিন কারো সঙ্গে কথা বলে না। নীরবে বিছানায় পড়ে থাকে।

সৌদামিনী এণ্টনীকে সন্ধ্যের পরও শুষ্ক বিরস মুখে বিছানায় দেখে কাছে এলো, গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললে, এত ভেঙ্গে পড়ার কি হয়েছে তোমার, ওঠ দেখি, চল একটু গঙ্গার তীরে বসি। পদাবলী শোনাবো গো, চল না।

এণ্টনী ম্লান হেসে বললে, বেশ আছি, আবার গঙ্গার তীরে কেন এখন, রাতও হয়েছে।

সৌদামিনী আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে মাথার চুলে আঙুল চালাতে চালাতে বলে, মোহিনীর কাছে হার হয়েছে ব'লে কি মন খারাপ তোমার। হারজিত নিয়েই খেলা গো। তাছাড়া হার তো তোমার মোটেই হয়নি। ওকে কি হার বলে, গান মোহিনীর মোটেই জমেনি। আমি মেয়ে-মহলে কারোর মুখে ওর সুখ্যেত শুনিনি বাপু। সবাইকে দেখলাম তোমার গানের সুখ্যেত করতে। তোমার গান খাসা হয়েছে। আর সমস্যা যা পূরণ করতে দিলে তোমায়, ওকি আবার সমস্যা নাকি! ও তো সামান্য মেয়েলী ছড়া, ওর উত্তর মেয়েরা সবাই বলতে পারে। ও সমস্যা পুরুষেরা কি আমল দেয়, না ভাবে কোনদিন, সমস্যা তো এই—

হৈ হৈ বল দেখি
যোগী নয় ঋষি নয় ছাই মাখে গায়
মাচার উপরে পড়ে তিনি গড়াগড়ি যায়॥

—এর উত্তর হল গো তোমার গিয়ে চাল-কুমড়ো; সব মেয়েই জানে। তুমি অতশত কুমড়োর নাম মনে রাখবে কি! আর এতে দমে যাবারই কি আছে। এ হার হারই নয়। নাও ওঠো দেখি, এই ব'লে সৌদামিনী এণ্টনীকে বিছানা থেকে তোলার চেষ্টা করে।

এণ্টনী সৌদামিনীর সহজ সচ্ছন্দ ব্যবহারে খানিকটা সান্ত্বনা পায় বটে, কিন্তু মনের গ্লানি যায় না।

—ওঠো না গো, আবদারের সুরে বলে, সৌদামিনী এবার জোর ক'রেই টেনে তোলে এণ্টনীকে। তারপর হেসে বলে, তোমার সঙ্গে হুড়োহুড়িতে পারি কি! গতর যে ভারী হয়েছে—না, খাওয়া কমাতে হবে বাপু!

এবার এণ্টনী গম্ভীরস্বরেই বললে, হ্যাঁ এখন খাওয়া-দাওয়া কমাবার কত অছিলাই তুমি খুঁজে বার করবে।

—অছিলা! তুমি কি বল গো—এই দেখ, বেড় দিয়ে মেপে দেখ, কি গতর নাই হয়েছে! চোখে বিস্ময় উপচিয়ে বললে সৌদামিনী!

—থাক, আর শরীর খুঁড়ে কাজ নেই। চল তোমার গানই শুনি, মলিন হেসে বললে এণ্টনী।

অনেক দিন পর ওরা ঘাসের ওপর দিয়ে জ্যোৎস্না-রাতে পাশাপাশি হেঁটে গঙ্গার কূলে যেতে থাকে।

সৌদামিনী যেতে যেতে কীর্তনের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে এণ্টনীর একটি হাত নিজের মুঠির মধ্যে নিয়ে এগিয়ে চলল।

শান্ত ঝিরঝিরে বাতাসে জোনাকিরা আপন আলোয় আপনি জ্বলে ওদের আগে আগে ছোটে। এণ্টনী দেখে; ভাল লাগে আজ হঠাৎই। ঝিঁঝিঁর নিয়ত ডাকের সঙ্গে সৌদামিনীর সুরের গুণগুণানিতে এণ্টনী এক অদ্ভুত শান্ত ভাবের আস্বাদ পায়। আবেশ-বিহ্বল হয়ে পথ চলে এণ্টনী।

গঙ্গার কূলে পৌঁছলে সৌদামিনী এণ্টনীর দুটি হাত ধরে উজ্জ্বল চোখে আবছা আলোতে অনেকক্ষণ ধরে দেখলো।

এ দৃষ্টি বিনিময়ে এণ্টনীরও ভাবান্তর হয়। ওর মনের গ্লানি ধুইয়ে দেয় সৌদামিনীর প্রশান্ত মুখচ্ছবি—নিষ্পলক চেয়ে থাকে এণ্টনী।

তারপর এক সময় সৌদামিনীর কণ্ঠ হতে সমস্ত আবেগ সুর হয়ে নতুন ক'রে প্রেমের অভিষেক করে—

এস এস বঁধু এসো আধ আঁচরে বসো
নয়ন ভরিয়ে তোমায় দেখি।
অনেক দিবসে মনের মানসে
তোমা ধনে মিলাইল বিধি॥
মণি নও মাণিক নও হার ক'রে পরি গলে
ফুল নও যে কেশের করি বেশ।
নারী না করিত বিধি তোমা হেন গুণনিধি
লৈয়া ফিরিতাম দেশ দেশ॥

বঁধু তোমায় যখন পড়ে মনে, চাহি বৃন্দাবন পানে
আলুইলে কেশ নাহি বাঁধি,
রন্ধনশালাতে যাই তুয়া বধু গুণ গাই
ধুঁয়ায় ছলনা করি কাঁদি ॥
কাজর করিয়া তোমা নয়নেতে রাখি যদি
তাহে গুরুজনা অপবাদ।
ও রাঙ্গা চরণে নূপুর হইতে
লোচন দাসেরই সাধ ॥

পদটি শেষ হলে সৌদামিনী সন্ধ্যা-শান্ত গঙ্গার দিকে চেয়ে এণ্টনীর কাঁধে মাথা রেখে চুপ ক'রে থাকে, কিছু বলে না।

সামনে গঙ্গার কুল কুল শব্দ। বাতাসে গাছের পাতার কথা। আর নির্জন সন্ধ্যার ঝিঁঝিঁর ডাক। অন্য কোন কলরব নেই। শুধু গানের রেশ থাকে দুজনার মনে। সৌদামিনীর গানের সুরে এণ্টনীর মনের জ্বালা কমে। মন শান্ত হয়। কবি-অন্তর প্রেরণা পায়। ঘন অন্ধকারেও সুদূর আলোর নির্ভরতা আনে।

ধীরে ধীরে কথা বলে এণ্টনী—সদু, তোমার এই পদটি শুনে মনে হচ্ছে কি জান; অভাব চিরকালই থাকবে, আসলে মন যদি ভরে থাকে তাহলেই বাইরের কিছু থাকলেও যা, না থাকলেও তা—কোন কিছুই তখন মানে না, বাধা পেলেও মানে না মন। প্রেমপূর্ণ মনই আসল, ওটি থাকলেই আমার সব থাকবে সদু। সৌদামিনী বলো, আমার মনের কথা সবই তো বুঝতে পার, অভাবে অনটনে কি আমি শেষ হয়ে যাবো! বল সদু?

সৌদামিনী এণ্টনীকে জড়িয়ে ধরে। তারপর মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে স্নিগ্ধ স্বরে বলে, অভাব কি তোমার? কি চাই তোমার, বল না গো। তোমার সবই আছে, সব থাকবে, কিছু চিন্তা করো না। তোমার মনে সুর আছে। ভাব আছে। বিশ্বাস আছে আর আমি আছি, ভয় কি তোমার।

তবু ভয় হয় সদু। যদি হারিয়ে যাই! যা পেয়েছি তাও যদি অভাবে নষ্ট হয়ে যায়—এণ্টনী উদাস সুরে ব'লে ওঠে।

—ওগো, আমি তা হতে দেবো না। তুমি বিশ্বাস রাখো, শক্তি আপনি পাবে। তোমার কণ্ঠে সরস্বতী আপনি ভর করবেন, বিশ্বাস রাখো।

এণ্টনী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, তাই রাখবো। অভাবে আর হার মানবো না।

—এই তো যোগ্য কথা, কবি তুমি, অভাব তোমার ভাবকে হরণ করতে পারে কি? লক্ষ্মী, আর ওসব বাজে চিন্তা করো না। তার চেয়ে নিজের গানের কথা ভাবো। তোমার নিজের রচনা আসরে শুনতে আমার বড় ইচ্ছে গো।

এণ্টনী হেসে বলে, আমারও কি কম ইচ্ছে, দেখি তোমার ইচ্ছাময়ী আর আমার লর্ড যীশুর কি ইচ্ছে।

ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা কি না বলা মুস্কিল। কিন্তু তেলিনীপাড়ায় গানের দিন আসরে যখন বাবুরা নতুন গান শুনতে চাইল তখনই এণ্টনীর মাথায় বজ্রাঘাত পড়ল গোরক্ষনাথ বেঁকে বসতেই।

—মাইনে না চোকালে আমি নতুন গান বেঁধে দিতে পারবো না এ আসরে।

এণ্টনীর মাথায় রক্ত চড়ে ওঠে। তবু আড়ালে গিয়ে অনুনয় সুরে গোরক্ষনাথকে এণ্টনী বললে, মাইনে আমি সব মিটিয়ে দেব, কিন্তু আমাকে এই আসরে এত লোকের সামনে অপদস্ত করো না।

—না, না! তোমার ওসব ভালমানুষী কথা ঢের শুনেছি, আগে বাকী-বকেয়া পাওনা-গণ্ডা চোকাও, তারপর গান বাঁধবো কিনা চিন্তা করবো।

—এই কথা তোমার শেষ কথা, এণ্টনী রাগে থরথর ক'রে কাঁপতে থাকে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, এটাই আমার শেষ কথা।

—তবে রে নচ্ছার বেল্লিক কোথাকার—

—মুখ সামলে সাহেব।

—সাট্ আপ! একটি কিকে তোমার ভুঁড়ি আমি ফাঁসিয়ে দেবো না—এণ্টনী তেড়ে যায়।

—আহা কর কি সাহেব, তোমার মাথা গরম করা কি সাজে, নটবর এণ্টনীকে আটকে বলে। তারপর গোরক্ষনাথ কি যেন বলতে যায়।

এণ্টনী নটবরকে ধাক্কা দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে ব'লে ওঠে, গেট আউট রাসকল্, আর কোন কথা শুনতে চাইনে।

—সে কি সাহেব! গানের কি হবে, ভীত স্বরে নটবর ব'লে ওঠে।

—চুলোয় যাক্। গেট আউট—রক্তচক্ষু নিয়ে এণ্টনী তেড়ে যায় আবার গোরক্ষনাথকে।

—আচ্ছা, আমিও দেখে নেব তোমায়। সাতমাসের মাইনে মেরে কি ক'রে তুমি পার পাও! দেখে নেব। বলতে বলতে গোরক্ষনাথ সরে যায় এণ্টনীর সামনে থেকে।

পলের পর পল যায়, এণ্টনী রাগে ঠক ঠক ক'রে কাঁপতে থাকে।

নটবর, হারু ইত্যাদি বোবার মত দাঁড়িয়ে থাকে।

—কি হবে! মান-ইজ্জৎ যে সব গেল—কি হবে, কি হবে সাহেব? নটবর কাঁদো কাঁদো স্বরে ব'লে ওঠে।

এণ্টনী একটি জোরে নিঃশ্বাস ফেলে নটবরের দিকে চেয়ে থাকলো। তারপর আস্তে আস্তে বললে, আসরে চল, নতুন গান আমাদের গাইতেই হবে, এই ব'লে নিজেই এগিয়ে যায় আসরের দিকে।

ওদিকে আসরে গোল উঠেছে—কি হলো, সাহেব কি পালালো নাকি?

—আরে ভাই, মজা হয়েছে—সাহেবের সরকার ভেগেছে! এবার মরবে ফিরিঙ্গী সাহেব। আসরে আর গাইতে হচ্ছে না।

—কি ব্যাপার ভাই!

—ব্যাপার কি আর, মাইনে বাকী। সরকার বেঁকে বসেছে, মাইনে না চোকালে আর গান বাঁধছে না।

—এ কিন্তু ভাই ভারী অন্যায়, আসরে দল নামিয়ে গোরক্ষ সরকার একি করলে! বাঙ্গালীর বদনাম করলে।

—থাম থাম, মুখে দিলাম তুলো আর পিঠে বাঁধলাম কুলো ক'রে খালি ব্যাগারই খাটবে নাকি সাহেব ব্যাটাদের কাছে! বেশ করেছে গোরক্ষনাথ। এখন মান-ইজ্জৎ নিয়ে কেমন ক'রে আসরে আসে দেখি না ফিরিঙ্গী কবি, বরাতে ঐ ময়রা ভোলার বাঁধা কলার ছড়া নাচছে! এমনিই ভোলার কাছে কুপোকাত হতোই, এখন বোঝার উপর শাকের আঁটি—বাবুদের ফরমাস, নতুন গান চাই—গাক্ দেখি ফিরিঙ্গী এবার বাপের সুপুত্তুরের মতন।

—আরে ঢোল ঘাড়ে সাহেবের ঢুলি যে আসরে এলো! বোধ হয় মিটমাট হয়ে গেল।

—না বোধ হয়, সবাই আসছে, ঐ এণ্টনী ফিরিঙ্গীও এলো, কিন্তু গোরক্ষনাথ সরকার কোথায় রে ভাই!

—আরে শোন না কি গায়, তা হলেই বোঝা যাবে।

নটবর ধরতা বোল বাজায়।

বাজনা থামলে এণ্টনী শান্ত স্বরে নটবরকে একতালা বাজাতে বললে। নটবর একটু আড়ষ্ট হয়েই বাজাতে আরম্ভ করে। অন্য দিনের মত যেন সহজ নয়—কি করে সাহেব, কে জানে! বুকটা দুর দুর ক'রে ওঠে নটবরের।

এণ্টনীরও পা কাঁপে। রাঙা রং আরো রাঙে। তবু সুর ধরলে ও চোখ বুজে। আসরে মুখ টিপে ভোলানাথ হাসে। তারপর এক সময় দলের সকলকে আশ্চর্য ক'রে দিয়ে গেয়ে ওঠে এণ্টনী—

> ভজন পূজন জানিনে মা, জেতেতে ফিরিঙ্গী
> যদি দয়া ক'রে তারো মোরে এ ভাবে মাতঙ্গী।

বাবুরা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে—বাহবা সাহেব, বাহবা। শ্রোতাও উচ্চ কণ্ঠে তারিফ ক'রে ওঠে। নটবরও মেজাজ পায়। আসর জমে ওঠে।

চিকের আড়ালে মেয়ে আসরে সৌদামিনী। সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আনন্দোজ্জ্বল নয়নে এণ্টনীকে লক্ষ্য করে। তারপর সৌদামিনী আশপাশ নজর করে।

—বেশ কিন্তু গাইছে ভাই। এমন ক'রে গান বিদেশী যে গাইতে পারে দেখিনি বাপু! শুনিনিও ভাই। কি ক'রে যে শিখলে আশ্চর্য!

সৌদামিনী মেয়ে-মহলে এণ্টনীর প্রশংসা শুনে গর্ব অনুভব করে, তৃপ্তিও পায়।

এণ্টনীর পালা শেষ হলে ভোলানাথ আসরে এলো, নিজে ভগবতী সেজে গেয়ে উঠল—

তুই জাত ফিরিঙ্গী, জবর জঙ্গী,
আমি পারবো নাকো ত'রাতে
তোকে পারবো নাকো তরাতে—

ভোলা ময়রা নেচেনেচে ঘুরেঘুরে দোহারদের সঙ্গে গাইতে থাকে। আসরে তারিফের উল্লাস ওঠে।

ভোলা ময়রা হেসে আবার গান ধরে—

শোন রে ভ্রষ্ট বলি স্পষ্ট,
তুই রে নষ্ট, মহা দুষ্ট
তোর কি ইষ্ট কালী-কেষ্ট
ভজগে যা তুই যিশুখৃষ্ট,
শ্রীরামপুরের গির্জাতে।

ভোলার পাল্টা শেষ হলে এণ্টনী মেজাজে হেলে দুলে নির্ভয়েই গান ধরে—

সত্য বটে আমি জাতেতে ফিরিঙ্গী
ঐহিকে লোক ভিন্ন ভিন্ন
অন্তিমে সব একাঙ্গী॥

—বাঃ বাঃ, কি সুন্দর ভাবটি! না হে জবর জবাব দিচ্ছে বাপু এণ্টনী ফিরিঙ্গী।

—জমেছে।

—জমতে হবে—ভোলা-এণ্টনী, এই জুড়ির গান শুনে কালে দেখবি লোকে নাচবে রে নাচবে!

বাবুরা মহাখুসী। গান শেষ হলে এণ্টনীকে পুরস্কৃত করলেন সম্মান মূল্য দিয়ে।

গানশেষে ভোলানাথ হেসে বললে, আজ বেঁচে গেলে হে। যাক্ গোরক্ষনাথ তা' হলে সত্যই চলে গেল?

—এণ্টনী মুখ বিকৃত ক'রে ব'লে উঠল, দেখ দেখি কি বিপদেই ফেলে গিয়েছিল।

ভোলানাথ এণ্টনীর পিঠ চাপড়ে হেসে বললে, তুমি তো খাসা বানালে নিজেই গেয়ে, ভারী বাঁধুনি দেখলাম তোমার। হ্যাঁ, ভাল কথা হে, কলকাতায় সামনের মাসেই আসছো তো?

—হ্যাঁ।

—বেশ মেজাজ হলো কিন্তু আজ, ভোলানাথ হেসে ব'লে উঠে।

এণ্টনী হাসির রেখা টেনে বললে, তোমার গালাগালগুলো কিন্তু ভোলানাথ ভারা মধুর লাগলো।

—তাই নাকি! তা এ আর কি গাল দিয়েছি, যেও কলকাতায়, দেব ঝুড়ি ঝুড়ি! কুড়তে হিমসিম খেয়ে যাবে। যাক্, এখন বিদেয় হই! ওহে বিশু, চল দেখি একটু গড়িয়ে নিই। আচ্ছা ভাই চল্লুম, ভোলানাথ হেসে ব'লে ওঠে।

—এস ভাই, আমিও চলি, গিন্নীটিকে নিয়ে যেতে হবে, এণ্টনী হেসে ভোলানাথের কাছ থেকে বিদায় নেয়।

এণ্টনীর মনের মধ্যে যে গ্লানি জমা হয়েছিল গান শেষে তা ধুয়ে মুছে গেছে। গাড়ীতে বসে সৌদামিনীর হাতে টাকাগুলো দিয়ে একগাল হেসে এণ্টনী বললে, আর বোধ হয় অভাব হবে না, কি বল সদু?

সৌদামিনী শান্ত আনন্দোজ্জ্বল চাহনিতে অনেকক্ষণ ধরেই এণ্টনীকে লক্ষ্য করছিল। এবার কথার সঙ্গে এণ্টনীর চোখে চোখ পড়তেই সৌদামিনী হেসে বললে, অভাব তো হবেই না, তাছাড়া তোমার গান বলার ভঙ্গি আর ভাবেতে তোমার কবি-দলের নতুন রূপ

দিল। এতেই আমার মন ভরেছে। গোরক্ষ সরকার ঝগড়া করলো ব'লেই ইচ্ছাময়ী তোমাকে স্বরূপে প্রকাশ করলেন। তাই দেখতে তিনি আমাকেও যেন পাঠালেন ; তা না হলে বাড়ীর পুজো ফেলে আসি! কচুয়ানকে বলদিকি একটু তাড়া ক'রে যেতে। পুজোর জোগাড় করতে হবে। সবই ভবানীর ইচ্ছে, বুঝলে গো।

এণ্টনী হেসে সৌদামিনীর দিকে চেয়ে বললে, যীশুরও কি রকম ইচ্ছেটা দেখলে ?

—ঠাট্টা নয়, প্রভু যীশুর ইচ্ছে বইকি, তিনিও তো জীবের ত্রাণকর্তা।

—ঐ দেখ সদু, পুব-আকাশটা দেখ দেখ! কি চমৎকার রং!

—ও তুমি দেখ, আমি রোজ দেখি ঐ রং। শুকতারাও দেখি রোজ। তোমার মতন বেলা পর্যন্ত নেশার ঘোরে পড়ে থাকিনে তো। হ্যাঁ, বড্ড কিন্তু ইদানিং বাড়িয়েছো বাপু।

—বেড়েছিল ভাবনায়। আবার কমবে গো। এখন ঐ রং আর সদ্য-জাগা পাখীদের স্বর শুনে তোমার একটা গান শুনতে ইচ্ছে করছে, এই ব'লে সৌদামিনীকে জড়াতে যায় এণ্টনী।

—আরে কর কি, লজ্জা-সরমের মাথা খেলে নাকি ?—দেখবে যে!

—এমন কেউ নেই গো যে তোমার কাছে ঘেঁসে বসলে মুখ বেঁকাবে, গাও না একটা গান।

সৌদামিনী আর প্রতিবাদ করে না, ধীরে ধীরে সুর ভাঁজতে থাকে—

ভজহুঁরে মন নন্দ নন্দন অভয় চরণার বিন্দুরে
দুর্লভ মানুষ জনম সৎসঙ্গ তরহ এ ভব সিন্ধুরে,—

সৌদামিনীর কণ্ঠে প্রভাতী সুর আর গাড়ীর দোলায় শান্ত আবেশে এণ্টনী চোখ বোজে।

পুজো শেষ হয়। দিন কতক বিশ্রাম। তারপর আবার কর্মব্যস্ততার দিন আসে। এণ্টনী সময় পায় না নাইতে খেতে।

সৌদামিনী তাগিদ মানে না। গৌরহাটিতে থাকলেই গানের মহলা নিয়ে ব্যস্ততা। তা নইলে গানের আসরে বাইরে বাইরে দিন কাটে। আজ নৈহাটী, কাল চুঁচুড়া, পরশু চন্দননগর, হুগলী—বিভিন্ন জায়গায় এণ্টনীর দলের ডাক পড়ে।

রোজগার বাড়ে, অভাবও কমে।

দ্রুত গানের জন্যেও এণ্টনীর নাম ছড়িয়ে পড়েছে। রসিক মহল তারিফ ক'রে বলে, দ্রুত গান বাঁধতে আর বলতে এণ্টনী ফিরিঙ্গীর সমকক্ষ কেউ তো দেখছি না আজকাল।

কানে আসে এণ্টনীর। শুনে হাসে, বলে, তাই নাকি! এমন কি দ্রুত গাই বাপু আমি, ভোলার থেকেও কি? না, না। তবু মনে তৃপ্তি পায়। সৌদামিনীর কাছে গল্পও করে, রসিক মহল বলাবলি করছিল, আমার দ্রুত গান নাকি খুবই ভাল হয়।

সৌদামিনী পুলকিত স্বরে বলে, তাই নাকি গো! বলবে বইকি, আমি বলিনি চুঁচুড়ায় তোমার বিরহ শুনে! আহা! বেশ গেয়েছিলে কিন্তু, সেই যে—

(মহড়া) প্রাণ সইরে, যদি বাঁচি প্রাণে, পরের প্রেমে আর আমি মজবো না।
আগে কতই ভালবাসে, কথা কয় মিষ্ট হেসে, শেষকালে পালায়।
তারে ধর্ত্তে গেলে প্রেমের পথে আর কি ধরা যায়,
একদিন প্রিয়ে বলে, মনে ভুলে, মুখ তুলে দেখে না॥

(খাদ) মিথ্যে পরের জন্যে পরে করে লাঞ্ছনা॥

(ফুকা) দৈবে দশে পাঁচে তার সঙ্গে পথে দেখা হলে
পিরীত জানাবে বলে, পথ ছেড়ে সে যায় অপথে
আমি পুড়ি তার পোড়াতে;—পোড়া লোকের গঞ্জনাতে,
মুখ ঢেকে যাই॥

—এই ব'লে সৌদামিনী চুপ ক'রে এণ্টনীর মুখের দিকে চায়।

এণ্টনী হেসে সৌদামিনীকে কাছে টেনে বলে, বেশ মনে রাখতে পারতো তুমি!

—এর পরে কি যেন গেয়েছিলে মনে পড়ছে না তো। ওগো গাওনা তুমি, তোমার এ গানটি শুনে অবধি শুধু তোমার সঙ্গে প্রথম

দেখা-সাক্ষাৎ-এর কথাই মনে হয়েছে—সেই ভেবেই যেন গান বেঁধেছ তুমি। গাওনা গো—আবদারের সুরে বলে সৌদামিনী।

এন্টনী হেসে গান ধরে—

(মেলতা) যেমন বন-পোড়া হরিণ, দুঃখে জ্বলে নিশিদিন
তেম্নি পুড়ে মরি জ্বলে, প্রেমানলে নেভে না॥

(চিতেন) কুলের কুলবালা আমি সই
ছিলাম যখন কুলেতে॥
লোকে বলতো তখন পিরীত-রতন,
তাইতে মজিলাম পরের পিরীতে॥

(ফুকা) কেবল দিন কতক কাল সই
যে জন আসতো বারে বার
তার গুণ বলবো কত আর,
যেমনধারা রাত্রিকালে রং-বাজিতে আগুন দিলে
ক্ষণেক মাত্র উঠে জ্বলে, শেষকালে অন্ধকার॥

(মেলতা) পরের পিরীত তদ্র প্রায়, ভাবেতে সব জানা যায়
দিলেম কুলে কালি পরের কথায় সে আপন হলো না॥

(অন্তরা) কেবল সই ঢলাঢলি ঘরে পরে
সদা পরের পোড়ায় পুড়ে মরি, এই সুখে ঘর করি ঘরে।
শুকিয়ে গেলাম ঐ জ্বালায়, পরের ভাবনা ভেবে তায়,
খেতে শুতে অসুখে প্রাণ যায়।
যেমন চোরের নারী বলতে নারি, গুমরে মরি চিন্তাজ্বরে॥

(চিতেন) আসা যাওয়া যদি থাকতো তার,
তবে কি সই এমন হয়॥

(ফুকা) যদি আমার হতো সে তবে,
এসে দেখা দিত, প্রেমের আদর বাড়াতো
কত্তোনা প্রেমে ছড়াছড়ি, হতোনা বিচ্ছেদের আড়ি,
পাড়ায় গেলে লোকের বাড়ী আয় ব'লে ডাকিত॥

(মেলতা) আমার পোড়া অদেষ্ট, প্রেম ক'রে পেলাম কষ্ট
এখন আমায় দেখে পাড়ার লোকে
কেউ ডেকে সুধায় না॥

এণ্টনী গান শেষ ক'রে হেসে বললে, খুব মেলে না ?

সৌদামিনী ঘাড় নেড়ে জানায়, হ্যাঁ।

এণ্টনী আবেশ-মাখা চোখে সৌদামিনীর দিকে চেয়ে বলে, জানো সদু, যখন কবিগান গাই তখন কখনও কৃষ্ণ, কখনও রাধা, কখনও ভগবতী, কখন বা ভোলানাথ ভেবেই গান করি। ভাবতে পারিনে তখন আমি হান্সম্যান এণ্টনী, একটি ব্রাহ্মণীর সঙ্গে প্রেম করেছি, তাকে নিয়ে গৌরহাটির বাগানবাড়ীতে থাকি। ব্যবসা-বাণিজ্য তাও নেশার আর সখের কবি করতে নষ্ট ক'রে এখন পেশাদার কবি হয়েছি —এ সব তুচ্ছ সৌদামিনী। এ সব পরিচয় তুচ্ছ। তখন নিজেকে আর ভাবতে পারিনে। ঢোলের বোলই একমাত্র পথ, চিন্তা যেন কৃষ্ণ-বিরহ, নিয়ত রাধা-অন্ত প্রাণ আমার। কেন হয় বলতে পার সদু ?

—পারি গো পারি, আমাদের শাস্ত্রে ধ্যান-মন্ত্র-জপ করতে করতে মূর্তি সত্য হয়ে চোখে ধরা দেয়। এও তেমনি গো। গভীরভাবে ভাবলে ধ্যানের কাজ হয়। ধ্যান না ভাঙ্গালে নিজেকে পাবে কি ক'রে —তুমি আমার ধ্যানী কবি গো। এবার লক্ষ্মীটি ঘুমিয়ে পড়। বিশ্রাম নাও। রাত অনেক হয়েছে।

এণ্টনী একটি নিঃশ্বাস ফেলে বললে, হ্যাঁ ঘুমাই, কাল ভোরে উঠতে হবে, তারপর পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমোতে চেষ্টা করে। সৌদামিনী সযত্নে এণ্টনীর পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে।

আরাম উপভোগ করতে করতে এণ্টনী বলে, জানো সদু, প্রায়ই যিশুর কাছে প্রার্থনা করি, আমাকে আলো দেখাও। লর্ড যিশুর ইচ্ছাতেই হয়তো আমি বঙ্গকবি, আমি প্রেমিক।

সৌদামিনী কিছু বললে না, শুধু এণ্টনীর গায়ে-পিঠে-মাথায় সপ্রেম স্পর্শ রেখে যেতে থাকে।

এণ্টনীর আর্থিক অভাব কবি-গানের পসারে মেটে। সংসারের খরচ সহজভাবেই হয়। দলের গাইয়ে বাজিয়ে যথাসময়েই বেতনাদি পায়। কিন্তু আগের মত সেই জীয়ট, সেই মেজাজ, সেই আড্ডার

নেশা যেন শ্লথ। নটবর, হারু, নিতাই, জগন্নাথ, বিশু ইত্যাদি সবাই আছে. বুড়ো ভবতারণের সঙ্গেও মাঝে মধ্যে যোগাযোগ হয়, কিন্তু ইদানীং ব্যস্ততায় রসিক মনে রস বিস্তারের সুযোগ পায় না।

গানের হারজিতেও সহজ হতে পারে না। জিত হলে আনন্দে ভূরি-ভোজের ব্যবস্থা, আর হার হলে মুখ অন্ধকার ক'রে বসে থাকে এণ্টনী। কারো সঙ্গে সেদিন আর বিশেষ কথা বলে না, হাসেও না। এমন কি সৌদামিনীও কথা বলতে সংকোচ করে ঐ সময়।

সেদিন শ্রীরামপুরের গানে এই অন্ধকার আরো ঘন হয়ে ওঠে।

গান হবার কথা ভোলা ময়রা, যজ্ঞেশ্বর দাস (জগা ধোপা) আর এণ্টনীর মধ্যে। ঝড়বৃষ্টির জন্যে জগা উপস্থিত হতে পারেনি। রাত ৮টা নাগাদ আসর আরম্ভ হলো।

ভোলানাথ আসরে এসে করজোড়ে নিবেদন করল—বাবুগণ, আমার যদি আজ হার হয়, কলার ছড়া নিয়ে বিদেয় হব। আর যদি জিত হয়, ঐ গামছা-বাঁধা টাকাগুলি আমার প্রাপ্য—আপনারা অনুমতি করুন, আমি আমার প্রতিপক্ষ এণ্টনী ফিরিঙ্গীকে প্রশ্ন সুধাই।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, মঞ্জুর মঞ্জুর, আরম্ভ কর ভোলানাথ।

—যথা আজ্ঞা, করজোড়ে বাবুদের নমস্কার জানিয়ে ভোলানাথ আসরে-বসা এণ্টনীর দিকে চেয়ে হেসে ঢুলিকে ইসারা করলে বাজাতে।

ধরতা বাজনা থামলেই ভোলানাথ একতালে গান ধরলে,—

> নাটুর নীচে ষাড় নড়ে, লাড্ড নয় ভাই !
> বৃন্দাবনে বসে দেখ, বসু ঘোষের রাই।
> ঘোমটা খুলে, চোম্টা মারে, কোনটা বড় ভারী,
> তিন লম্ফে লঙ্কা পার, হাসছে শুকসারী,
> বাঁঝা মেয়ের ব্যাটা হলো, অমাবস্যার চাঁদ,
> এণ্টনী জবাব দাও, নইলে বাঁধবে বিষম ফাঁদ !

ভোলানাথের এই হেঁয়ালীর উত্তর দিতে না পেরে মাথা হেঁট ক'রে বসে থাকে এণ্টনী।

আসরে হাসা-হাসির রোল ওঠে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা যায়। উত্তর আসে না এণ্টনীর কাছ থেকে। এণ্টনী মাথা হেঁট ক'রে বসেই থাকে। মরমে মরে যায়। সব অন্ধকার দেখে।

বাবুরা যেই ভোলানাথের জয় ঘোষণা করলেন, এণ্টনী আর দাঁড়ালে না, সোজা গৌরহাটি চলে এসেছিল। কথাও বলেনি কারো সঙ্গে। টাকাকড়ি নটবরই নিয়ে এসেছিল।

বাড়ীতে এসেও স্বাভাবিক হতে পারে না। লজ্জায় অধোবদনে নুয়ে নুয়ে চলে। খায় না ভালো ক'রে। কেউ কিছু বলতে গেলে তাকে তেড়ে ওঠে। শুধু সৌদামিনীই মন বুঝে এণ্টনীর কাছে আসে, শান্তও করে ধীরে ধীরে।

স্বাভাবিক হলে আবার হাসে এণ্টনী। ডাকে কারণে-অকারণে সকলকে। আড্ডা জমে। গানের মহলাও হয়। বিভিন্ন গানের আসরের সমালোচনাও করে এণ্টনী। নিজের দোষ-ক্রুটী স্বীকার ক'রে শুধরেও নেয়।

নতুন নতুন দালাল আসে আসরের বায়নার খবর নিয়ে। এণ্টনী আশপাশের বিভিন্ন আসরে বেশ মেজাজ নিয়েই গান করে।

এদিকে আবার কলকাতারও ডাক এসেছে। সৌদামিনীকে হেসে এণ্টনী সেদিন বললে, এবার যাবে তো কোলকাতা ?

— নিশ্চয়ই যাবো, কবে যাচ্ছো গো কলকাতা ?

—পরশু।

—বেশ তো, আমি ঘরদোরের সব ব্যবস্থা ঠিকমত ক'রে নিই। রামচরণ থাকবে, কেষ্টার মাও থাকুক, দেখাশোনা করবে।

—যা ভালো বোঝ করো। এণ্টনী বার-বাড়ীর দিকে এগিয়ে যায়।

আবার কলকাতা। রঙ্গরসে ভরা কলকাতা। নেচে-গেয়ে হেসে-কুঁদে মাতোয়ারা হবার কলকাতা।

সৌদামিনীর চোখে বিস্ময় লাগে—কত রকমের লোক, কত রং বেরঙের পোষাকে—কেউ চোকা-চাপকান পরে পাল্কীতে, কেউ

চওড়া কালো পাড় ধুতি পরে, গায়ে জরির বুটি দেওয়া আদ্দির বেনিয়ান পরে ছড়ি দুলিয়ে গোঁফে তা দিয়ে রাস্তায় হেঁটে চলেছে, কেউ বা খালি গায় কৌপিনের মত টুক্‌রো পরে জিনিস মাথায় নিয়ে ফিরি ক'রে চলেছে—সকালে দুপুরে সন্ধ্যাকালে মাঝরাতে নানান্‌ জিনিষ নিয়ে।

রাতে দোতলার ঘরে শুতে গিয়ে শোনে বাইজীদের নাচের ঘুঙুরের শব্দ—মনটা ঘিন্‌ ঘিন্‌ ক'রে ওঠে সৌদামিনীর। এ সময় প্রায়ই এণ্টনীর পাত্তা থাকে না। কোন কোন দিন গভীর রাতে বাড়ী ফেরে নেশায় বম্‌ হয়ে। গান থাকলে রাতে ফেরে না।

দিনে রান্না-বান্না শেষে চুপচাপ বসেও থাকতে হয় সৌদামিনীকে। দশ-বারো জন লোকের রান্নার তদারকে পরিশ্রম শেষে ক্লান্ত শরীরে কিছু যেন ভাল লাগে না। কলকাতার আবহাওয়ায় সৌদামিনীর মন মানে না। তাছাড়া আজকাল পাশের ফিরিঙ্গী-সাহেবদের বাঙালী উপপত্নীরাও দুপুরে আহারাদির শেষে গল্প করতে আসে। বারণ করতেও বাধে, আবার কথাবার্তা সহ্যও হয় না সৌদামিনীর।

—তুমি ভাই মেমসাহেব হতে পারলে না? কি ছাই বাঙালী খানা খাও! আমার বাবুর্চির হাতে খাবে নাকি একদিন? সুশীলা ডি সিলভা সৌদামিনীর পানের বাটা থেকে আর একটি পান মুখে পুরে চিবুতে চিবুতে বলে।

সৌদামিনী কিছু বলে না। সুশীলা ডি সিলভার হাবভাব লক্ষ্য করে শুধু—কি কুৎসিত না দেখতে হয়েছে বিবি-খোঁপায়! যেন জেলে মাগী, রং যা!

—তোমার এখানে এসে একটি জিনিস মনের আশমিটিয়ে খেতে পারি—সে হচ্ছে পান, আমার হোস্‌বণ্ড দুচক্ষে দেখতেই পারে না, লর্ডও নাকি পছন্দ করে না। পান খেলে বড্ড নাতি মারে কিনা ওয়াইন্‌ খেয়ে। তাইতো এণ্টুনী দিদি চলে আসি তোমার এখানে। রাগ কর নাকি?

সৌদামিনী হেসে বলে, না না, যত খুশী ভাই খাও না পান, এই নাও ডাবর রইল, আমি আসছি, বস।

সুশীলা ডি সিলভা এক গাল হেসে বলে, এণ্টুনী দিদি আমাদের বড্ড ভালো।

সৌদামিনী দেখন-হাসি হেসে উঠে যায়।

সৌদামিনীর মন বসে না। একমাত্র ভোরে যখন পাল্কী চেপে গঙ্গাস্নানে যায় তখনই একটু শান্তি পায়। একদিন রাতে এণ্টনীকে বলেও সৌদামিনী—এমন একটা জায়গায় বাসা নিয়েছ যেখানে না আছে একটা দেব-দেবীর মন্দির, না আছে তু-একজন সৎ মেয়েছেলে।

এণ্টনী হেসে বলে, দিচ্ছি দিচ্ছি তোমার দেব-মন্দির ক'রে দিচ্ছি শিগ্‌গির। আর একটু সহ্য করো না, হ্যাঁ ভাল কথা, কাল গান শুনতে যাবে নাকি ? ঠাকুর সিংহীর দলের সঙ্গে গান আছে।

—যাবো বইকি, তোমার গান শুনতে যাব না কি গো! কি গাইবে গো কাল ?

—কি ক'রে বলবো, আসর বুঝে গান, তবে রাম বসু আছে ঠাকুর সিংহীর দলে, জমবে গান।

—আচ্ছা, একটা কথা বলবে তুমি ?

—কি বল না।

—হ্যাঁ গো, ঐ যে আমাদের বাড়ীর আশেপাশে সাহেবরা যে বাঙালী মেয়েছেলে নিয়ে থাকে, তারা কি প্রেমে পড়ে বিয়ে ক'রে আছে ?

এবার এণ্টনী হো-হো ক'রে হেসে ওঠে। তারপর হাসি থামলে সৌদামিনীকে জড়িয়ে ধরে বলে, ওগো মধুমুখী, সাহেবগুলো সবাই আমার মত নয়। এখানে মেমসাহেব কম আছে কিনা, তাছাড়া যাদের দেখছো তারা তত বড়লোক ধনী নয়, অথচ বুঝলে কিনা একা থাকা কি যায় ? সুযোগও পেয়েছে সাহেবগুলো, তোমাদের বামুনের ঘরের অনেক বিধবা সতী হবার ভয়ে পালিয়ে সাহেবদের আশ্রয়ে এসেছে। আর সাহেবদেরও অভাব মিটেছে। দিব্বি সেবাযত্ন,

দেহ ভোগ হচ্ছে। বুঝলে মধুমুখী, তোমার ঐ শ্রীমতী সুশীলা ডি সিলভা, শ্রীমতী পটলী জেকবরা সব ঐ জাতের।

সৌদামিনী নিশ্চুপ হয়ে যায়। কেমন যেন ম্লান হয়ে আসে ওর মুখমণ্ডল, প্রদীপের আলোতে নজর করে এণ্টনী।

—কি ভাবছো, মধুমুখী?

—কিছু ভাবিনি তো।

—না না, ভাবছো বইকি—হয়তো তুলনা করছো ওদের সঙ্গে নিজের, না?

—তুমি কি মন বুঝতে পারো?—খানিক বিস্ময় উপচিয়ে বললে সৌদামিনী।

—পারি বইকি, তোমার চোখের চাহনিতেই আমি বুঝি তুমি কেমন আছো, কি ভাব তোমার মনের, ভেব না গো, তুলনা করো না গো ওদের সঙ্গে তোমার। আমি মনে বড় ব্যথা পাই। তুমি কি জানো না, তুমি কি বোঝ না, "তোমারই তুলনা তুমি প্রাণ" দরদ ঢালা স্বরে বলে এণ্টনী।

—গাও না গো নিধুবাবুর ঐ গানটি। ভারী মধুর গান—সৌদামিনী ঘন হয়ে এণ্টনীর বুকের কাছে মুখ লুকোয়।

এণ্টনী সৌদামিনীর কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ নিয়ে খেলা করতে করতে গান ধরে:

> তোমারি তুলনা তুমি প্রাণ এ মহীমণ্ডলে
> গগনে শরৎ-শশী উদয় ভূতলে (দহিছে কলঙ্কানলে)
> সৌরভে গৌরবে, কে তোমার তুলনা রবে,
> তোমাতে সকলি সম্ভবে, যেমন গঙ্গাজলে ॥

ঠাকুরনাথ সিংহীর দল আর এণ্টনী ফিরিঙ্গীর গান যে আজ, তাইতো এতো ভীড় এখানে।

—একটু জায়গা ক'রে দেনা ভাই, বাবুদের সঙ্গে তো আলাপ আছে।

—আর আলাপ! ভীড়ে সব আলাপ লোপ—দেখি চল, চেষ্টা করি।

সত্যই অসম্ভব ভীড়। এত ভীড় যে মাথা ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। রসিক মহল ধৈর্য ধরে বসে থাকে। রাম বসুর পাল্টা আর এণ্টনীর দ্রুত জবাব শোনার জন্য। অনেক শ্রোতা বরাহনগর, ভবানীপুর, চেতলা, আলমবাজার থেকে হেঁটে হেঁটে এসেছে। অনেক বাবু মাইফেল ছেড়ে জুড়ি হাঁকিয়ে গান শুনতে এসেছে।

একটি বাবু নতুন বাঁধা মেয়েমানুষের ইচ্ছেয় তাকে নিয়ে ভীড়ে ঢুকতে না পেরে অসুবিধা বোধ করেন। মোসায়েব হিমশিম খেয়ে পথ ক'রে দিতে চেষ্টা করে—একটি সুন্দরী যাবেন আপনারা একটু পথ ক'রে দিয়ে কৃতার্থ হউন।

—কে হে চাঁদ, সুন্দরীর পথ তো এটি নয়। ঐ পিছনদিকে।

—তাই নাকি, আচ্ছা কিন্তু এই মহামহিমমণ্ডিত জমিদার শ্রীলোচন বিলাসের জন্য একটু পথ দিয়ে কি এই অধমের সম্মান বাঁচাবেন।

—আসুন, আসুন, এ আর বেশী কি! পথ একটু দুর্গম; তা চেষ্টা করলে যেতেও পারবেন।

—যথা আজ্ঞা।

কয়েকজন মাতালও হল্লা করতে করতে ভেতরে ঢুকতে চেষ্টা করে। ফোর্ট উইলিয়াম থেকে সাহেবও এসেছে হান্সম্যান এণ্টনীর মুখে কবি-গান শুনতে।

মিত্তিরবাবু বিশিষ্ট অতিথিদের জন্য মহাব্যস্ত। হাওয়া, হাঁকডাকে সরগরম। পেয়াদা পাইক বরকন্দাজ ছোটাছুটি করতে থাকে। সৌদামিনীও গান শুনতে এসেছে। চিকের আড়ালে গানের অপেক্ষায় থাকে। আর গুমটে অন্যজনার মত উস্‌খুস্‌ করে। হাত-পাখার হাওয়া খায়—কখন যে আরম্ভ হবে!

গান আরম্ভ হলো ৯টা নাগাদ। ঠাকুর সিংহীর দল বিরহেই ধরতা দিল। প্রথম গান শেষ হলে এণ্টনী আসরে এলো হাসিমুখে। আনন্দে

কলমুখর হয়ে ওঠে আসর। রসিক বৃদ্ধেরা রামবাবুর গান নিয়ে আলোচনা করে—বেড়ে বাঁধন আর আজ নিজেও গাইলে খানিকটা। ভারী অদ্ভুত গলা কিন্তু। কি মিঠে! নিধুবাবুকে মনে করিয়ে দেয়!

—হ্যাঁ, পেশাদার কবি-দলে ঐ একা রামবাবু আছে বাপু যাই বল তারিণীচরণ।

—তা যা বলেছেন।

—এণ্টনী ফিরিঙ্গীর ঢুলি কিন্তু চমৎকার বাজাচ্ছে হে। শোন, শোন!

নটবর মনপ্রাণ ঢেলে ঢোলে বোল তুলছে—গুড় গুড় গুড় গুড়, ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ কিটিতা, কিটিতা কিটিতা, তাক্ তাক্ তাক্, তেত্তা তেত্তা, কিটিতা কিটিতা কিটিতা, ঝাঁ গুড় গুড়, ঝাঁ গুড় গুড়, ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ, তাকিটি তাকিটি তাকিটি তা, ঝাঁ ঝিনাক্ ঝাঁ, ঝাঁ ঝিনাক ঝাঁ, ধে ধে তিনি কিটিতা কিতা, ধেন্না ধেন্না কিটিতা কিটিতা, ধা ধা কিটি ধা, ধা ধা কিটি ধা।

—আহা মরি, খাসা! মরি মরি, মেরে ফেলরে!

নটবরের ধরতা বাজনা থামলে, এণ্টনী তালে তালে নেচে নেচে গান ধরলে :—

(মহড়া) এ বসন্তে সখী, পঞ্চ আমার কাল হলো জগতে
করে পঞ্চ দুঃখে দাহ, পঞ্চ ভূত দেহ,
পঞ্চত্ব বুঝি পাই পঞ্চবাণেতে ॥
পঞ্চ যাতনা প্রায়, নিশি পঞ্চ প্রহরেতে ॥
যদি পঞ্চামৃত করি পান, নাহি জুড়ায় প্রাণ
হৃদে বেঁধে পঞ্চবাণ ॥
দেখ পঞ্চানন তনু ভস্ম করেছিলেন যার,
এখন সেই দহে দেহ পঞ্চ শরেতে ॥
(চিতেন) পঞ্চাক্ষর, নাম মকরধ্বজ, বিরহী রাজ্যের রাজন!—

শ্রোতারা উল্লাস ক'রে ওঠে—বলিহারি যাই,—ভেরী ভেরী নাইস!

—চমৎকার।

এণ্টনী নেচে নেচে হাতে তাল দিয়ে গাইতে থাকে ঃ—

সহ সহচর, পঞ্চশর, রিপু হলো পঞ্চজন ॥
ভ্রমর কোকিলাদি পঞ্চশর, রাজা পঞ্চশর,
অঙ্গে হানে পঞ্চশর।
তাহে উনপঞ্চাশৎ, মলয়-মারুত সই
আবার ভানু দহে তনু পঞ্চ যোগেতে ॥

(অন্তরা) সই গ্রহ প্রকাশিলে, পঞ্চম মঙ্গল,
ফুলঘ্রাণ যেন পঞ্চবাণ
পঞ্চ দান দিলে হ্রাস বৃদ্ধি যার, তার কি বাণও দহে প্রাণ।

(চিতেন ২) পঞ্চ-দ্বিগুণ বদন যার, রাক্ষসের যে প্রধান,
তার চিতাসম জ্বলিছে সখি, পঞ্চম দুঃখেতে প্রাণ,
যদি দ্বিপঞ্চ দিকেতে চাই, পঞ্চ রিপু পাই,
পঞ্চ সহকারী নাই,
কেবল পঞ্চম অসাধ্যে, পঞ্চ রিপুর মধ্যে সই
আমি থাকি যেন সখি পঞ্চ তপেতে ॥

(অন্তরা) সই পঞ্চ পাণ্ডবের, খাণ্ডব কানন
জ্বালিয়েছিল যেমন ॥
এমনি এ দেহ জ্বালায় সখী, বসন্তের চর পঞ্চজন ॥
পঞ্চম দ্বিগুণ, দ্বিগুণ করে, করিতে চাহি ভক্ষণ,
তাহে প্রতিবাদী হই গো আসি, প্রতিবাসী পঞ্চজন
বলে পঞ্চরিপু গিয়েছে, প্রাণে সয়েছে,
এ পঞ্চ ক-দিন আছে।
কিন্তু এ পঞ্চ যাতনা, প্রাণে আর সহে না, সই,
এবার পঞ্চ মিলায় বুঝি পঞ্চ ভাগেতে ॥

এণ্টনী নেচে নেচে দোহারদের সুর ছেড়ে দেয়। দোহাররা গাইতে থাকে।

—বেশ গাইছে ভাই, তত্ত্বকথা খুব আয়ত্ত করেছে।

—কি বাপু পঞ্চ পঞ্চ করছে, রস কোথায়—বাবরী চুলের ছোকরা শ্রোতাটি মুখ বিকৃত ক'রে বলে।

—দাঁড়া দাঁড়া রস জমবে। যখন মুখোমুখি প্রশ্ন-উত্তর হবে। ধৈর্য ধর, জেন্‌টিল-ম্যান।

এন্টনীর গান শেষ হলে ঠাকুর সিংহের দল আসরে আসতেই শ্রোতারা হৈ হৈ ক'রে ওঠে।—সামনা-সামনি কাটান জবাব চাই। খেউড় হোক।

—বড্ড গোল, না থামলে তো কিছু বলারও উপায় নেই, রামবাবু বিরক্ত হয়ে ব'লে ওঠে।

ঠাকুর সিংহী রামবাবুকে ব'লে ওঠে, গান কি চালাবে নাকি ?

—দাঁড়ান মোশাই, আসরের হাওয়া দেখছেন না, খেউড় খেউড় ক'রে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছে ! খেউড়ে উদ্ধার চাইছে সব, সাহেবকে প্রশ্ন করুন !

—কি করবো ! ঠাকুর সিংহী যেন দিশে পায় না।

—আমিই ধরছি আপনি সঙ্গে সঙ্গে গান। —ওহে, ধরতা দাও একতালা—ঢুলিকে নির্দেশ দেন রামবাবু।

বাজনার ধ্বনিতেও শ্রোতাদের কোলাহল থামে না, বরং বাড়ে— খেউড় চাই।

রামবাবু হাত জোড় ক'রে জানান, তাই হবে ; তারপর দোহারদের সুর ধরতে বলে। দোহাররা সুর ধরলে, রামবাবু ঠাকুর সিংহীকে গানের কলি ধরালেন,

বলো হে এন্টনী আমি একটি কথা শুনতে চাই
এসে এদেশে এবেশে তোমার গায়ে কেন কুর্তি নাই॥

শ্রোতারা ঠাণ্ডা হয়। উল্লাস ক'রে ওঠে। এন্টনী জবাব দিতে ওঠে। একতালা বোলের সঙ্গে নেচে নেচে গাইতে থাকে—

এই বাংলায় বাঙ্গালীর বেশে আনন্দে আছি
হয়ে ঠাকুরে সিংয়ের বাপের জামাই কুর্তি টুপি ছেড়েছি॥

আসরে হাসির রোলের সঙ্গে তারিফের তুফান ছোটে—সাবাস এন্টনী ফিরিঙ্গী, বহুত আচ্ছা, জিয়া রহো !

হাসিমুখে জিতে সৌদামিনীকে নিয়ে ভোর রাতে বাড়ী ফেরে এণ্টনী। সৌদামিনী আনন্দে আহ্লাদে এণ্টনীকে নিয়ে কি করবে ভেবে পায় না—চুমুতে চুমুতে ক্লান্ত এণ্টনীকে আরো ক্লান্ত ক'রে বলে, কি ভালই না হয়েছে আজ তোমার জবাব।

—তা তো হয়েছে। কিন্তু আগামী শনিবার ভোলার সঙ্গে গান আছে বাগবাজারে পেঁর‍্যার বাগানে—

—তাতে কি হয়েছে, আরো ভালো ক'রে গাইবে—দেখ, দেখ, মাতালটার রকম দেখ! বাছুরটাকে জড়িয়ে চুমু খাচ্ছে—আজব সহর বাপু তোমার এই ক'লকাতা।

এণ্টনী হেসে বলে, মেয়েছেলে বের ক'রে দিয়েছে বোধ হয় ঘর থেকে বেচারাকে, তাই আর কি করবে—বাছুরই সই।

—কি বিশ্রী, আচ্ছা এখানে কি লোকে রাতে ঘুমোয় না—কি রকম লোক চলছে দেখ। এখনও তো ভোর হয়নি অথচ লোকের ভীড়ে যেন দিনমান।

—বাবুরা সব রাঁড়ের বাড়ী থেকে ফিরছে। জুড়ী, পাল্কীতে ক'রেই বেশী চলেছে। হেঁটে হেঁটে ঐ যারা ফিরছে তারা হয়তো কেউ বাজনদার, কেউ দালাল, কেউ মোসাহেব, আবার কেউ আমার মত গেঁজুড়ে কবিও আছে গো!

—এই ক'রে গোল্লায় দিলে হিন্দু সমাজটাকে।

—এরা অবশ্য গোল্লায় দিচ্ছে নিজেদের। কিন্তু তোমাদের রায়বাবু তো সমাজকে বেশ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। বাঙ্গালী সমাজকে নতুন ক'রে গড়বার চেষ্টা করছেন তিনি।

—তেনারা যদি ভালো করেন ভালই। কিন্তু আমাকে বাপু গৌরহাটি নিয়ে চল।

—যাবো গো, ক'লকাতায় ভোলার সঙ্গে গান ক'রে তোমাকে গৌরহাটিতে রেখে সোজা যাবো কাসিমবাজারে পুজোতে।

—যেমন বুঝবে করবে। আঃ, বড্ড ঘুম পাচ্ছে যে!

—আমার কাঁধে মাথা রেখে ঘুমোও না, বাড়ী এলে কোলে ক'রে না হয় ওপরে তুলবোখন, গাল টিপে আদর ক'রে ব'লে ওঠে এণ্টনী।

—যাঃ! দেখে ফেলবে যে ওরা।

—ওরা কেউ দেখবে না গো। তুমি ঘুমোয়, এই ব'লে এণ্টনী সৌদামিনীকে নিজের বুকের কাছে টেনে নেয়।

পাল্কী চলে হেলে দুলে। বেহারা বিড় বিড় ক'রে সুর ধরে—

হুকুমদা হুকুমদা হুকুমদা—সড়া বড় ভারী, সালী বড় ভারী।

বাগবাজার। এই বাগবাজারে বারুদখানা ব'লে একটি অঞ্চল আছে। পলাশী যুদ্ধের আগে ইংরেজরা এখানে গোলা-বারুদ তৈরী করতো ব'লেই এ অঞ্চল বারুদখানা ব'লে পরিচিত। উত্তরে মারাঠা ডিচ্‌! দক্ষিণে পাউডার মিল রোড। পশ্চিমে গঙ্গা। পূবে হরলাল মিত্রের গলি।

এই বাগবাজারের বারুদখানা অঞ্চলে এক ধনীর বাড়ীতে এণ্টনী আর ভোলা ময়রার গানের আসর। ভীড়ে ভীড়। ভোলা-এণ্টনীর গানের কথা শুনে কোলকাতার লোক ভেঙ্গে পড়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলের লোক এক জায়গায় এসে ভীড় জমিয়েছে ভোলা-এণ্টনীর গানের জনবর শুনে। মারামারি, লাঠালাঠিও হয়ে গেল জায়গা নিয়ে। ষাঁড় লেলিয়ে ভীড় কমাতে চাইলে বদমাইস লোকেরা। কিন্তু কিছুতেই লোকের ভিড় কমে না। রাত বাড়ে যত, লোকও জমে তত।

শ্রোতাদের অনুরোধে ভোলা ময়রা দ্রুত লয়ে গান ধরে। গান জমে গেছে। ভোলার গান শেষ হলে আসর থেকে চীৎকার ওঠে—সামনাসামনি কাটান-চাপান চাই।

এণ্টনী মুচকি হেসে ভোলানাথকে বললে, আজ আমি ভগবতী, তুমি ভোলা ভোলানাথ!

—ভগবতী হয়ে দেখ না, মজা টের পাবে। ভোলানাথ মন্তব্য ক'রে ওঠে।

—দেখাই যাক্না, এণ্টনী হেসে বলে। নটবরকে ইসারা করে বাজাতে। তারপর আসর-শ্রোতারা ঠাণ্ডা হলে এণ্টনী ভগবতী সেজে ভোলা ময়রাকে শিব কল্পনা ক'রে প্রশ্ন করে :

যে শক্তি হতে উৎপত্তি, সেই শক্তি তোমার পত্নী কি কারণ,
কহ দেখি ভোলানাথ এর বিশেষ বিবরণ ॥
জান না কি শিব! আমি তোমার শিবাণী,
তোমায় গর্ভে ধরে আমি, এখন হলেম তোমার রমণী ॥
সমুদ্র মন্থনকালে বিষ পান করেছিলে,
তখন ডেকেছিলে দুর্গা ব'লে,—রক্ষা কর আপনি।
চলেছিলে বিষ পানে, বাঁচালেম স্তন্য দানে,
সেই দিন কি ভুলে আমায় বলেছিলে জননী ?

প্রশ্ন শেষে এণ্টনী ভোলা ময়রার দিকে চেয়ে মুচকি হাসলে।

ভোলা ময়রা চোখ মোটকে ঢুলিকে তাল দেখালে, তারপর এণ্টনীর কানের কাছে মুখ নিয়ে চুপি চুপি বললে, শালা, তুই যেখানে ভগবতী সেখানে আমি ভগবান হতে চাইনে। একবার গালখানা শুনেনে।

এণ্টনী হেসে বলে, দে না বাপু কি গাল দিবি। ভোলা কোমর দুলিয়ে তালে তালে নেচে নেচে গান ধরে—

(ওরে) আমি সে ভোলানাথ নই
আমি সে ভোলানাথ নই,
আমি ময়রা ভোলা, হরুর চেলা,
বাগবাজারে রই।
চিন্তামণির চরণ চিন্তি
ভাজনা খোলায় ভাজি খই।
আমি যদি সে ভোলানাথ হই,
সবাই পূজে ভোলার লিঙ্গ
আমার লিঙ্গ পূজে কই।
নে যা আমার খই, নে যা ঘাটালের দই
পেরিঙের মুখে গিয়ে গাছে লাগা মই।
কাছে বাগবাজারের খাল, আজ তোর বিষম জঞ্জাল
দড়ি কলসী নিয়ে বেটা! হোগে জলসই ॥

—কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ, এই না হলে আর কবি বলেছে,—ভোলার মুখে যেন খই ফুটছে।

প্রবীণরা আক্ষেপ করে—খিস্তি ক'রে উড়িয়ে দিলে যে ভোলা, পুরাণী প্রশ্নের জবাব দিলে না। এড়িয়ে গেল, এটাই তো হার।

—নিশ্চয়ই, এটাই হার।

—হার না ঘেঁচু, ভোলার গোঁড়ারা প্রতিবাদ ক'রে ওঠে।

আবার আসর ঠাণ্ডা হয় গানে। পাল্টাপাল্টি প্রশ্ন-উত্তর চলে ভোলা-এণ্টনীর মধ্যে রাত ভোর না হওয়া পর্যন্ত।

গান শেষ হলে ভোলা এণ্টনীর পিঠ চাপড়ে হেসে বললে, গাল-গুলো কি ক'রে নিলে হে হেস্থম?

এণ্টনী হেসে উত্তরে দেয়—ও আমি নিইনি হে! কবি ক'রে গালি দিয়ে রস দিতেও চাইনে নিতেও চাইনে। সত্যিকারের রস যদি গোল্লা ক'রে দাও, নেবো খাবো মাখবো আর বিলোবো সবাইকে। দেবে নাকি হে সত্যিকারের রসের গোল্লা?

—আমার গোল্লায় কি এত রস যে তুমি খাবে মাখবে আবার বিলোবে, তাজ্জব কথা!

—আছে বইকি হে, তুমি হলে গিয়ে কবি-দলের আদি গুরু রঘু-দাসের চেলার চেলা, তুমিই পার সত্যিকারের রসের গোল্লা দিতে। কিন্তু এই যা দিলে ভাই, এ তো রস নয়, খিস্তি-খেউড়। গানকে খেউড় লহর দিয়ে নিচে নিয়ে যাওয়া কি তোমার সাজে!

—ওরে বাবা! এ যে আবার তত্ত্বকথা কইতে আরম্ভ করলে তুমি!

—তত্ত্বকথা নয় ভোলানাথ, এ হলো গিয়ে তোমার প্রেমের কথা। বঙ্গকবি রঙ্গে আমি সামান্য চাকুরে মাত্র। আমি এইটুকু বুঝেছি ভোলানাথ, মানুষের সত্যিকারের ধর্ম প্রেমের রসেই রসিক হওয়া। তার রসনা যদি খেউড়ে লহরে খিস্তিতে নিম্ন রসের আস্বাদ পায়, তাহলে তোমার ঐ বদরসে বদরসিক হয়ে উঠবে। আমার ভাই পসার হোক আর নাই হোক, যদি তোমার মত নাম না পাই না পাব। তবু বদরসিক হতে পারবোনি।

—দেখ হেম্ম্ন, পষ্ট কথাই বলি তোমায়, আমি বাবা পষ্ট কথার লোক। ধম্মপুত্তুরের মত বড় বড় অনেক উচিৎ কথাই বল্লে। মেনেও নিচ্ছি। তবে তোমার কি, নেমকের কারবারে প্রচুর অর্থ আছে, আমার তো নেই। কবি ক'রে আর ভিয়েন ক'রে সংসার চালাই। এই দেখ না, এই সহরে নিজের একটা আস্তানা বানাচ্ছি। টাকা-পয়সার তো দরকার। যুগের মুখ রেখে ধম্মও করছি। এই তো সেদিন জমিদার রায়বাবুদেরও একচোট নিলাম, শুনবে? তাহলে শোন ঃ—

আমি ময়রা ভোলা ভিঁয়াই খোলা, বাগবাজারে রই
নই কবি কালিদাস তবে খোসামোদের মাথা খাই।
বাবু তো লালাবাবু কোলকাতায় বাড়ী,
বেগুন পোড়ায় হুন দেয় না, সে ব্যাটা তো হাঁড়ী।
পিঁপড়ে টিপে গুড় খায়, মুকতের মধু অলি।
মাপ কর গো রায়বাবু, ছুটো সত্য কথা বলি ॥
মোষের মত মুন্সীবাবু মসীর ন্যায় কালো।
পান খেয়ে ঠোঁট রাঙায় চেহারাখানা ভালো ॥
পূর্বজন্মের পুণ্যফলে পান খেতে পাই।
লক্ষ্মীছাড়া বাসীমড়া যার পানের কড়ি নাই ॥

ছড়াশেষে হেসে ভোলানাথ বললে, দেখ ভাই, মানুষকে হাসাতে পারলেই আমি খুসী। তবে বাবুদের মনের মতন ক'রে নয়, গাল দিয়েই। তোমাকে তো সেবার বললাম এখন যুগের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই ঘা দিতে হবে। হ্যাঁ ভালো কথা, কাসিমবাজারে তুমি কি তোমার গৌরহাটি হয়ে যাবে নাকি?

এণ্টনী বললে, হ্যাঁ গিন্নীকে ওখানে রেখে ছু-একটা আসর ক'রে তারপর যাবো।

—পঞ্চমীর দিন যাতে পৌছতে পারো সেদিকে নজর করো বাপু। শেষে আমায় যেন তালগাছ গুণতে না হয়—হাসে ভোলানাথ।

—নিশ্চিন্ত থেকো ভাই, ঠিক তরি তীরে ভিড়বে।

—ভিড়লেই ভাল, না গেলেই কাল।

—যাক্, যে কথা বলছিলাম তোমাকে ভোলানাথ, আমি ভাই লহর বাঁচিয়েই গান গাইতে চেষ্টা করবো।

—তা করো গো, তোমার ইচ্ছেয় তো কেউ বাদ সাধছে না। তুমি যদি খেউড় লহর বাঁচিয়ে কবি করতে পারো ভালোই হবে। পরে আমরাও তোমার পথ নিতে পারি। বেশ উত্তম প্রস্তাব। তবে দ্রুত কাটান-চাপানে একটু লহর না করলে ধৈর্য বসবে কেন শ্রোতার। অর্ধেক শ্রোতার মন হলো গিয়ে রসনার মত, আর আমরা যদি আনারসী হয়ে তাতে একটু নিমক মরিচ দিয়ে দিই, তাহলে মজে ভালো। আমি নিমকও দিই আবার মরিচ দেই হেস্মম !

এণ্টনী হেসে বলে, তোমার পদ্ধতি তাই লোকচিত্ত জয় করে। আমরা হেরে যাই। তবে তাতে দুঃখ পাইনে ভোলানাথ।

—আরে ! তুমি এখানে সাহেব, আর আমরা তোমাকে খুঁজে মরছি—হারু কাছে এসে বললে এণ্টনীকে।

—কি ব্যাপার হে, এণ্টনী জিজ্ঞাসা করে।

—আমি চলি হে হেস্মম, ভোলানাথ ব'লে ওঠে।

—যাবে, তা এস, ঐ কথাই রইল, কাসিমবাজারে দেখা হচ্ছে।

—হ্যাঁ, ঐখানেই দেখা হবে, চললাম, ভোলানাথ যেতে যেতে বলে।

ভোলানাথ চলে গেলে হারু বলে,—সাহেব, এদিকে যে মস্ত বিপদ, নটবর হঠাৎ হাত-পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসেছে।

—সে কি ! কি হলো তার ? এণ্টনী জিজ্ঞেস করে।

হারু ঘাড় চুলকে ব'লে ওঠে, দমটম দিয়ে ওর বৌকে মনে পড়েছে কিনা, তাই। সেজন্য কাঁদছে। বেচারী বাড়ী যাবে ব'লে বায়না ধরেছে।

—চল চল দেখি, এণ্টনী এগিয়ে যায়।

ব্যাপারটা ঘটলো হারু আর নিতাই-এর জন্যে। ক'লকাতায় হারু আর নিতাই দুজনেই দুজন বাঁধা মেয়েমানুষ রেখেছে। নটবর

তা পারেনি। মুখে বৌকে গাল দিলেও কালিদাসীকে সত্যিই ভালোবাসে নটবর। গান শেষে আস্তানায় গিয়ে গাঁজা টানতে টানতে নিতাই হারুকে বললে, সাহেবের কাছে টাকা নিতে হবে, আমার কেতুকে কাল রাধাকান্ত জীউর শোভাযাত্রা দেখতে নিয়ে যেতে হবে।

নিতাই বললে, আমার রূপকুমারী আবার খাসীর ঝোল খেতে চেয়েছে সঙ্গে পোলাও দিয়ে। আমারও কিছু টাকা চাই যে।

নটবর গাঁজায় দম দিয়ে ওদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। কিছু বলেনি, চুপচাপই ছিল।

নিতাই ওকে ঠেলা দিয়ে বললে, তুই শালা কি করবি রে? হারু বললে,—ও আর কি করবে, এখান থেকে ফরেসডাঙ্গার জেলে-মাগীর গন্ধ শুঁকবে।

—তাই নাকিরে নাটু? নিতাই ওর থুতনি ধরে নাড়া দিয়ে ব'লে ওঠে।

তখনই নটবর ডুকরে কেঁদে উঠেছিল।

—কি হলো রে, কাঁদবার কি বললাম রে? নিতাই ব্যস্ত হয়ে ব'লে ওঠে।

নটবর কিছু বলে না, উচ্চকণ্ঠে কাঁদে।

—ভ্যালা জ্বালা রে, ওরে নটু, বলনারে কি হলো তোর?— হারু জিজ্ঞাসা করে।

নটবর কাঁদতে কাঁদতে এবার ব'লে ওঠে,—আমি বাড়ী যাবো।

—এই সেরেছে, কচি সোনার আমার পুতুল বৌকে মনে পড়েছে! ডাক্ ডাক্ সাহেবকে ডাক।

হারু তখনই ছুটে গিয়েছিল এণ্টনীর কাছে।

এণ্টনী আসে। নটবরকে বোঝায়—ছি, কাঁদতে আছে কি? সামনের ছুটো আসর সেরে আমরা ফিরে যাবো। ছেলেমানুষের মত কাঁদে না নটবর। নাও, চল দেখি, এবার বাসায় যেতে হবে না। চল, আজ তোমাকে ঘুড়ির বাজী দেখাতে নিয়ে যাবো ময়দানে।

চল, শিশু ভোলানোর মতন ক'রেই সস্নেহে ভুলিয়ে টেনে তোলে, তারপর কাঁধে হাত দিয়ে জড়িয়ে বাইরে নিয়ে যায় নটবরকে এণ্টনী।

বিচিত্র জীবনযাত্রার দিন কাটে ক'লকাতা সহরে হারু-নটবর-নিতাইদের। বাড়ীঘরের টান যে নেই এমন নয়; এই তো সেদিন সন্ধ্যার সময় রাস্তায় নেংটা এক শিশুকে দেখে হারুর মনটা হু-হু ক'রে ওঠে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নিতাইকে বলে, ছেলেটা কেমন আছে কে জানে, আর মাগীটার জ্বর দেখে এসেছিলাম রে, কি করছে, কেমন আছে কে জানে!

—আমারও ভাই বৌটা কি করছে ভগবানই জানে; একটা পুরুষমানুষ নেই, এই কাহিল শরীর দেখেছিস্ তো, ঐ ক্ষীণজীবি হাড় ক'খানা নিয়ে কি ক'রেই বা দুটো গরুর কাজ, নিজের রান্নাবান্না, কচি মেয়েটার তদারক কি ক'রে করছে সেই জানে। আর জানে পঞ্চানন্দ! তারপর অভাব—কি যে ছাই করি।

—কেন, ওস্তাদ তো আসার আগেই থাউকো টাকা দিলে সবাইকে। সে সব কি করলি? হারু জিজ্ঞাসা করে।

—সে কথা আর কোসনি, রূপসী মাগীটা তখন কান্না জুড়ে দিলে মটরমালার জন্যে। মাইরি! থাকতে পারলাম না, দিয়ে ফেললাম ট্যাঁক খুলে।

হারু হাত নেড়ে বলে, তবে আর ভাবনা করছিস্ কেন। ঘরের মাগ হয়তো এতদিনে সাবড়ে গেছে। আর মেয়েটাকে শ্যাল-কুকুরে নে গ্যাছে।

—জ্যা মাইরি, কি যে বলিস্! বুকে বড্ড লাগে, হাজার হোক বিয়ে করেছি তো তাকে রে।

—সেদিকে তো শিয়ানা শালা, তবে বকরা ক'রে দিয়ে এলিনে কেন? ঘরও করবি রাঁড়ও রাখবি যখন, তখন সামলে চলবি তো শালা। এদিক থেকে নটু বেশ আছে, দেখলিনে সেদিন কি কান্নাই না।······

নিতাই হারুকে বাধা দিয়ে তাচ্ছিল্য স্বরে ব'লে ওঠে, নে নে, ওর কথা আর বলিস্‌নে, ওটা নেহাতই গাঁউয়া মাদী। ব্যাটাছেলে যদি রাঁড়ই না করে দু-চারটে, তাহলে কি আর ব্যাটাছেলে বলে! কলকাতায়, ফরেসডাঙ্গায় যেখানেই যাবি সেখানেই দেখবি—বাবু বল, জমিদার বল, ভদ্দর নোক বল—রাঁড় না করলে লোক ব'লেই গম্মি হয় না। এই তো সেদিন দেখলি তো বাবু পুরন্দর পটলরাণীর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে ঠাই সোনাগাজীর থানের কাছে দাঁড়িয়ে রইল, তবু বাড়ী গেল না। কেন গেল না বলতে পারিস্‌?

হারু হাঁ ক'রে চেয়ে থাকে নিতাই-এর দিকে বোকার মতন, কিছু বলে না।

—পটলরাণী তো ফুলুরাণীর কাছে যখন-তখন পান খেতে আসে। সেদিন ও রাগের মাথায় পান সাজতে সাজতে বল্লে,—যাবে কোন্‌ চুলোয় আর মিনসে! বাড়ীতে এখন ফিরতে পারবে না; মাগের গাল খাবে। রাতে মাল টেনে না ফিরলে ঘরে শুতেই দেবে না। আর ট্যাকেও টাকা নাই! এলো ব'লে দেখ না! বুঝলি হারু, বাবুদের ঘরের মাগরাও চায় না সোয়ামী সন্ধ্যে রাতে ঘরে ঢুকুক। তাদেরও যে পাড়া-প্রতিবেশীদের ঠাট্টা শুনতে হবে। বাবুদের ইস্ত্রীরাও চায় বাবু রাঁড়ের বাড়ীতে যাক্‌—এই হলো আজকালকার চাল, বুঝলি ব্যাটা। নে নে, দেরী হয়ে গেলো, ফুলুরাণী আবার দুটো ভাল কথা ব'লে বিদেয় না ক'রে দেয়।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, চ, আমারও আবার রাবড়ী নে যেতে হবেক, এই ব'লে হারুও জোরে পা চালায়। ঘরের বৌ-ছেলের কথা আর মনে থাকে না।

সহর কলকাতার মানসিকতায় হারু নিতাই নটবর নতুন বিশ্বাস পায় এণ্টনীর সংস্পর্শে এসে। বিশেষ ক'রে নটবর ত সমস্ত অন্তর দিয়েই মেনে নিয়েছে।

—সব মানুষই এক। সব ধর্মই এক সুরে বাঁধা। বিভিন্ন

পথের শেষে একই নির্দিষ্ট স্থান। গোঁড়ামি ক'রে লাঠালাঠি ক'রে মানুষ নিজের ধর্মই নষ্ট করে—এণ্টনীর আন্তরিক স্বরের সঙ্গে নটবর হারু নিতাইও সায় দেয়।

—রামমোহন শিক্ষা বিস্তারের জন্য ঠিকই করছেন। সতীদাহ প্রথা নিবারণের জন্যেও যথেষ্ট চেষ্টা করছেন। দ্বারকা ঠাকুরও অনেক ভাল ভাল বিষয় চিন্তা করেছেন। বাঙ্গালীর সুখ-সমৃদ্ধির জন্য এইসব মহান্ পুরুষেরা তোমাদের সমাজ-কর্তাদের অনেকেরই চক্ষুশূল গো নটবর।

নটবর সায় দিয়ে বলে, তা যা বলেছো সাহেব। তেঁনারা ভালই করেছেন। শিক্ষা না পেয়ে মানুষ মানুষকে খরিদ করবে। ভালবাসবে কি ক'রে। এই তুমিতো সেদিন বললে, শ্রাদ্ধবাড়ীতে বিদেয় নিতে এসে না পেয়ে নিজের মেয়েছেলেকে বিক্রী ক'রে গেল, এটা অবশ্য অভাবের জন্য, কি বল ?

—শুধু অর্থের অভাবই নয় নটবর, শিক্ষার অভাবেই সেই মানুষ তার সন্তানকে বিক্রী করেছে। হয়তো পরে অনুতাপ হয়েছে যখন সন্তান বেচা টাকা তার ফুরিয়ে গেছে। এমনি অনুতাপ চন্দননগরের সেই সামান্য ওয়ার্ডারটিরও এসেছিল অভাব মেটানোর জন্যে। পয়সার লোভে চন্দননগর এটাক্ করবার সুবিধা ক'রে দিয়েছিল ইংরেজকে সেই সামান্য সৈনিক। ফরাসীরা হেরে গেলো। সেই টাকা পেয়ে ইংরেজদের মারফৎ দেশে পাঠালে তার বাবার কাছে। পিতা সেই পাপ-অর্থ গ্রহণ করেনি, অর্থ ফিরে আসে ভৎ‍র্সনার মতনই। তখনই সেই সৈনিকের অনুতাপ আসে, আত্মহত্যাও করে সে। বুঝেছ হারু, লোভ করলেই পাপ, আর পাপেই ধ্বংস। এক তোমার দেশেই এর বহু নজির দেখতে পাবে—মিরজাফরকে দেখ, ইংরাজদের সঙ্গে হাত মিলালে নবাব হবাব লোভে, তার ফলটা দেখলে তো ?

—হ্যাঁ, আমাদের দেশটা এখন ইংরেজদের, নিতাই ব'লে ওঠে।

—তাইতো বলছিলাম ভোলাকে সেদিন, আসর হয়তো জিতবো ভাই বেশী খিস্তির লহর করলে। কিন্তু কবিগানের মধুর বস্তুই

হারাবো। লোভকে দমন করতে হবে হারু, মানুষ সম্বন্ধে বিশ্বাস আর প্রেম আনতে হবে মনে—আমার লর্ড যিশু, তোমাদের চৈতন্য এই শিক্ষাই দিয়েছেন। ঐ প্রেমের বিশ্বাসেই প্রেম আসে নির্মল আনন্দ হয়ে। "বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর"—এ তো তোমাদের বৈষ্ণব মহাজনেরাই বলেছেন।

—ওস্তাদ তুমি এতো সুন্দর ক'রে বল, এতো ভাল লাগে, নটবর মুগ্ধ হয়ে ব'লে ওঠে।

এণ্টনী হাসে তারপর ব'লে ওঠে, তুমিও বলতে পারবে নটবর বিশ্বাস করলে, ঐ বিশ্বাসের বলেই দস্যু রত্নাকর হয়েছিলেন বাল্মীকি মুনি, বিশ্বাসের জোরেই অন্ধের চক্ষুদান করেছিলেন লর্ড যিশু! যার জোরে আমি জাতে পোর্তুগীজ হয়েও বাঙ্গালী কবিওয়ালা হতে পেরেছি নটবর। প্রকৃত প্রেম মনে উদয় হলে ভালো-মন্দের বিচার যায় ঘুচে, তখন সবাইকেই ভালো লাগে, সবই ভালো লাগে, মন্দ চিন্তা আসে না, মন্দ দেখে না, মন্দ করে না—এণ্টনীর আন্তরিক ভাবগম্ভীর স্বর নটবরের ভালো লাগে।

নিতাই উসখুস করে। তত্ত্বকথা ওর ভাল লাগে না। ও বলে, সাহেব ও তোমার ছেলে-ভুলানো কথা। মন্দ লোক মন্দ করবেই। ভালো আর দেখি কই। সহরখানায় বেশ কয়েকবারই তো এলাম, থাকলাম। দেখলাম তো, মন্দ করতেই লোকে ওস্তাদ। আর তুমিই তো সেবার শ্রীরামপুরের গানের আসরে গোঁসাইদের ব্যাভারে নিলে না একচোট—সেই যে গেয়েছিলে, এই ব'লে সুর ক'রে গেয়ে ওঠে :—

"তোমরা পয়সা পেলে, হেসে খেলে শাদায় কর কালো,
তোমাদের গোঁসাই চেয়ে (আমি বলি) কসাই তবু ভালো॥"

এণ্টনী এবার বল্লে, অন্যায় করলে বলবো বই কি। পয়সাটা ওরা কসাই-এর থেকে বেশী বোঝে—বিধানের পাল্টা বিধান দেয়। ভোলার কাছে শুনেছি, শুধু ভোলাই কেন, আমাদের বাবু ভবতারণের মুখেও শোনা সে ঘটনা, সে নিজে দেখেছেও। পরলোকগত রাজা

নবকৃষ্ণের প্রধানা স্ত্রী হিরামণি যখন পোষ্যপুত্র নিয়েছিলেন তখন ঐ বামুন-পণ্ডিতরাই কবিওয়ালার খেউড় ছড়া করেছিল। পয়সার জন্যে আর দানের কম-বেশীর জন্যে কি না করছে আজকাল বামুন-পণ্ডিতরা। গান দিতেও পেছপা হয় না।

—ছড়া কি কেটেছিল মনে আছে নাকি ওস্তাদ ?

—মনে আবার নেই, গেয়েছিল—

সোনা দান শোনা মাত্র ব্যয় মাত্র বাণি
শুভক্ষণে পোষ্য নিয়েছিল রাণী
অধ্যাপক ব্রাহ্মণপণ্ডিত বিদেয় কল্লেন বেশ
বাঁশবেড়ের আত্মাক্ষর গুপ্তিপাড়ার শেষ।

—সে কি ওস্তাদ ! একেবারে……

—হ্যাঁ হে, তা বুঝলে নটু, বাংলা ছিল সোনার দেশ। আর পণ্ডিতের মতন পণ্ডিতও ছিলেন রামনাথ পণ্ডিতের মতন এই দেশে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে তিনি একবার বলেছিলেন—অভাব কোথায়, বেশ তো আছি। প্রাঙ্গণে তেঁতুলগাছ আছে, তার পাতার অভাব নেই, আর ঘরে মা-লক্ষ্মীর কৃপায় তণ্ডুলও আছে, অভাব কোথায় মহারাজ ! বুঝলে নটবর পণ্ডিত হচ্ছেন তাঁরাই—শিক্ষা গ্রহণ আর দানের মধ্যেই ব্যস্ত থাকতেন তাঁরা। অর্থাভাব আর অন্নাভাবে তাঁরা ভাবিত হতেন না।

—তা যা বলেছ ওস্তাদ, আজকালকার বামুনরা টাকা যেদিকে সেদিকে। গরীবদের দুবেলা লাথি মারে, জমিদারদের পরেই ওরা। বামুনরা বড্ড হায়রান করছে সাহেব আমাদের মত গরীবদের। টাকাটা সিধেটা না পেলেই, ছুতো খোঁজে কি ক'রে ধোপা-নাপিত বন্ধ করবে। বড়লোকরা চাঁদির জুতো মেরে ঠাণ্ডা করে। আমাদের তো আর চাঁদির জুতো নেই। এই কোলকাতাতেই কি কাণ্ডকারখানাটাই করছে বামুন-পণ্ডিতরা। ভবতারণবাবু চন্দননগরে থাকতে একদিন কি একটা গল্প করেছিল মনে আছে রে নিতে, নটবর জিজ্ঞাসা করে নিতাইকে।

—মনে থাকবে না আবার সেই গল্প।

—কি গল্প বলো না। সত্যিই, বাবু ভবতারণ মারা গিয়ে আমরা গল্প শোনা থেকে বঞ্চিত হয়েছি। ভারি রসিকলোক ছিলেন বাবু ভবতারণ—এণ্টনী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আবার বললে, তারপর নিতাই, কি গল্পের কথা যেন বলছিলে তুমি ?

—গল্পটা কি জানো ওস্তাদ, রাজা নবকৃষ্ণের সঙ্গে কুমারটুলির মিত্র বাড়ীর, যেখানে আমরা গান করলুম গো সেদিন, সেই তাদের কর্তা অভয়চরণ মিত্র আর চূড়ামণি দত্তর মামলা হয়। রাজা নবকৃষ্ণের সেই মামলা বিলেতেও গেছলো। মামলায় হার হয়েছিল রাজার। আর জিতের খবরটা চূড়ামণি দত্ত মরার আগেই শুনেছিল। তাই চূড়ামণির গঙ্গাযাত্রা রাজা নবকৃষ্ণের বাড়ীর সামনে দিয়েই নিয়ে যাওয়া হয়েছিল শোনাবার জন্যে বেশ ঢাক-ঢোল বাজিয়ে। নাচতে নাচতে চূড়ামণির জয় ঘোষণা ক'রে ছড়া কেটে গেছলো। ছাড়াটা যেন কি—নিতাই দু'বার মাথা চুলকে ব'লে ওঠে, ওহো মনে পড়েছে গো—ছড়াটা হচ্ছে গিয়ে তোমার—

যম জিনতে যায় রে চূড়া, যম জিনতে যায়,
জপ তপ কর কি, মরতে জানলে হয়।

—বুঝলে ওস্তাদ, এই চূড়ামণি দত্তের শ্রাদ্ধের সময়ই রাজার পক্ষের লোকেরা বামুন-পণ্ডিতদের ঘুস দিয়ে নিজেদের দলে টেনে, শ্রাদ্ধটা ভণ্ডুল করার মতনই ক'রে ফেলেছিল আর কি। চূড়ামণির ছেলের নামে অনাচারের দোষ দিয়ে পণ্ডিতরা বিধান দিলে—শ্রাদ্ধতে আমরা মন্ত্রপাঠ, দানগ্রহণ প্রভৃতি কিছুই করবো না।

চূড়ামণির ছেলে কালীপ্রসাদ দত্তও ওস্তাদ লোক। তক্কে তক্কে তিনিও কালীঘাটের মন্দির বানানোর জন্যে বেশ কিছু টাকা দিয়ে ও-পক্ষের চাল ভেস্তে দিয়ে বামুন-পণ্ডিতদের নিয়ে এলো। শ্রাদ্ধ হলো, বিদেয়ও হলো—শুধু টাকার খেলা ওস্তাদ, টাকার খেলা। এই নিয়েই পণ্ডিতির মেলা।

—আরে এদিকে যে বেলা যায়! উঠবে না, গান আছে না?

যাও, যাও ওস্তাদ, একটু বিশ্রাম নিগে যাও। ঠাকরুণও কি ভাবছেন বলো তো!

—তাই তো হে, ঠিক কথা। কথায় কথায় ভুলেই গিয়েছিলাম আজকে গানের কথা। নাও নাও, তোমরা একটু বিশ্রাম নিয়ে নাও, আমিও একটু গড়িয়ে নিই। গিন্নী বোধ হয় ক্ষেপে গেছে—এণ্টনী হেসে উঠে দাঁড়ায়।

—কোলকাতায় যে কি ক'রে বেলাগুলো কেটে যায় বোঝাই যায় না।

এণ্টনী হেসে বলে, হ্যাঁ এ সহরে হাওয়াই এমনি! বুড়ো হয়ে মরার সময়ও মনে হয় বড্ড শিগ্‌গির শিগ্‌গির চলে যেতে হচ্ছে। অথচ জীবনটা সম্পূর্ণ হচ্ছে মৃত্যুতেই—একথা বোঝে না। বুঝতে ভয় করে মানুষ।

—হ্যাঁ, এখানে সবই তাজ্জব—একে বলে কলকাতা সহর! এখানে—এই ব'লে তড়াক ক'রে লাফ দিয়ে হারু নাচতে নাচতে গান ধরে—

(ওরে ভাই) এই সহরে দুর্গাপূজা ঘণ্টা নেড়ে,
খোকা হলে বাজে ঢাক
কাকাতুয়া ছেড়ে দিয়ে খাঁচায় পুল্লেন কিনা কাক।
বিষয়কর্ম গোল্লায় গেল, লড়িয়ে কেবল বুলবুলি
প্রকৃতি বিকৃতি হয়ে হায়, মারা গেলো লোকগুলি।

—বাহবা বেশ—ঘুরেফিরে হারু ঘুরেফিরে! নিতাই তাল দিতে দিতে ব'লে ওঠে।

এণ্টনী হেসে তারিফ ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

কবি-জীবন একটা নদীর স্রোতের মতই মনে ক'রে এণ্টনী কবি গেয়ে বেড়ায় আনন্দ ক'রে: কখনও প্রেমে পাগোল, কখনও প্রেমের জ্বালায় ওর কবিমন ব্যাকুল হয়ে রাধার মন নিয়ে ব'লে ওঠে—

(মহড়া) প্রেমে ক্ষান্ত হলেম প্রাণ
আর আমার পিরীতের পথে যেতে মন সরে না।

যা হবার তা হয়ে গেছে, সে আলাপে কাজ কি আছে,
ওরে আমার প্রাণ
মিছে বেগার দিতে আমার কাছে
আর তুমি এসো না ॥

(খাদ) তোমার যত ভালবাসা গিয়েছে জানা।

(ফুকা) যেদিন শয়নকালে প্রাণ তোমারে ভাবি মনে মনে,
মরি মনের আগুনে, প্রাণ রে।
তুমি থাক দেশান্তরে, আমি থাকি শূন্য ঘরে,
বুক ফেটে যায় চিন্তাজ্বরে, মুখ ফুটে বলিনে ॥

শ্রোতারা ঘাড় দুলিয়ে তারিফ জানায়—বলি, বেশ বেশ।

—খাসা বুঝেছে মাইরি বিরহ—ঠিক ঘরের বৌ-এর মনের কথা।

—নিজেই বেঁধেছে শুনছি। আচ্ছা, ঠাকুরদাস চক্রবর্তীকে দেখছিনে।

—না, পাকা-পোক্ত দাঁড়-কবি এখন ফিরিঙ্গী এণ্টনী। বলা বোষ্টম ফেলিয়োর!

চিকের আড়ালে মেয়েরা তারিফ করে। শুধু তরিফই নয়, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কুলীন বধূরা নিজেদের মনের কথা ভাবে। চোখের জলে ভাসে।

এণ্টনী মেলতায় দোহারদের সুর ছেড়ে দেয়—

আমায় যে দেখে একবার
বলে রক্ষা রক্ষে পাওয়া ভার
একটি মিষ্টি কথায় ব'লে কেউ তো সুধায় না ॥

—তা কি সুধায় না কি! কালার পিরীতের রীতিই এই। ভাবুক শ্রোতা স্বগত উক্তি করলে। অপর জন টিপ্পনী কাটে—মশায়ের ব্যাখ্যান শুনতে আসিনি, থামুন না।

প্রথম শ্রোতা কটমটে চোখে তাকায়—কি ভেবেছেনটা শুনি!

—ভাববার কিছু নেই কথকমশাই, দয়া ক'রে শুনতে দিন।

—শুনছেন তো খুব, খালি বাজে কথা……

বচসা মধ্যপথেই বন্ধ হয় এণ্টনী গান ধরতেই,—

(১ টিতেন) অবলা নারী আমি ছিলাম প্রাণ কুলেতে ॥
(পড়েন) ছিল বিধির লিখন, চক্ষের মিলন,
তোমায় আমায় দেখা পিরীতের পথে ॥

—সাবাস ফিরিঙ্গীর বাচ্চা, যা বললে সবই সাচ্চা! একটি শ্রোতা উল্লাসে চীৎকার ক'রে ওঠে।

—থামুন না মশায়, এটা বৈঠকখানা নয়, আসর এটা।

—জ্ঞানগম্মি থাকলে তো, আজকালের ছোকরা সহবৎ শিক্ষা জানে নাকি!

এণ্টনী এ সব মন্তব্যে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। মন্তব্যের ভালো-মন্দের দিকে তাই কান করে না। প্রথম প্রথম উত্তেজিত হতো, কিন্তু তাতে অসুবিধাই হতো নিজের গানের। এখন মন্তব্য মোটে আমলই দেয় না। ভালো-মন্দে মেশানো শ্রোতার দল প্রশংসাও করবে, নিন্দেও পঞ্চমুখ হবে। মাথা ঘামালেই বিপদ, গান জমাতে পারবে না—এ ধারণা হয়েছে এণ্টনীর বিভিন্ন আসরে গান গেয়ে। তাই স্মিত হাসি হেসে "ফিরিঙ্গীর বাচ্চা, যা বলে সবই সাচ্চা" মন্তব্যকে উড়িয়ে দিয়ে গান ধরলে—

তখন নতুন নতুন দিন কতককাল প্রাণ জুড়ালে এসে,
তাইতে মজলেম প্রেমরসে, প্রাণ রে······

—আহা রে, মরি মরি, আমি যদি পেতাম রে, ছিঁড়ে খেতাম রে!

—চুপ চুপ, বড্ড গোল।

—মেরে তুলে দেবো শূয়ারদের গোল করলে, বারোয়ারীর পাণ্ডা বাজখাঁই গলায় চীৎকার ক'রে ওঠে।

এণ্টনী গায়—

যেমন ধারা মাণিক জোড়ে
তেমনি ছিলাম জোড়ে জোড়ে,
এখন তুমি আমায় ছেড়ে
লুকিয়ে রও বিদেশে ॥

মেলতার দোহাররাও এণ্টনীর সঙ্গে গলা মেলায়—

দৈবাৎ হয়েছে মনে, তাইতে এলে এখানে,
বঁধু আজ বাদে কাল তোমার দেখা পাব না ॥

এণ্টনী অন্তরা ধরে—

এই কি রসিকের প্রেমের ধারা, প্রাণ রে,
আমার হলো ঝুটো মন, ভাব ছাড়া ছাড়া
প্রেম করা নয় কেবল কুলের রমণী খুন করা॥

(২ চিতেন) প্রেমেতে যত সুখ জেনেছি পরিচয়, প্রাণ রে॥

(পড়েন) রমণীর মন সরল যেমন রয়
পুরুষের মন সরল তেমন নয়॥

শ্রোতারা কেউ কেউ এ সময় হৈ হৈ ক'রে উঠে—বাজে কথা, একদম ঝুটো কথা, মেয়েরা সরল না কচু! জিলেপীর প্যাঁচ্!

—এণ্টনী ফিরিঙ্গী খেড়ালে রে—বলে কি সরল যেমন! ইল্লি নাকি?

—কেন বাবা, মাগ কি তোমার শতমুখী হস্তেন সংস্থিতা!

—তুই থাম মাগের ভেড়ু, শালা পুরুষ না কি তুই!

—দিল আছে শালা, দিল বল কল্‌জে বল এই বেটা শম্মার।

—শালা মেলা বাত মারিস্‌নি,—দুই বন্ধুর মধ্যে রাগারাগি পরে হাতাহাতিও হতে থাকে। পাণ্ডারা এসে তুলে নিয়ে যায় দুজনকে। তারপর গলা ধাক্কা দিয়ে আসর থেকে রাস্তায় বের ক'রে দেয়। এই ধরণের ঘটনা প্রায় আসরেই ঘটে। কিন্তু উত্তেজনা এলে পূর্ব অভিজ্ঞতা ভুলে শ্রোতারা আবার মারামারি, ঝগড়া করে; আবার গলাধাক্কাও খায়। ভোলানাথ মোদক আর এণ্টনীর মধ্যে গান হলে তো কথাই নেই, এ ঘটনা ঘটবেই। উভয় পক্ষের গোঁড়াদের বিরোধ অবধারিত।

আসর আবার ঠাণ্ডা হয়। এণ্টনী বাজনার তালে তালে গান ধরে:—

(ফুকা) তার সাক্ষী বলি উত্তমে অধমের তুলনা
সেটা মিথ্যা বলবো না, প্রাণ রে
সীতা সতী বিনা দোষে, রাম দিলেন তায় বনবাসে
ভালবাসার এই সুখ শেষে, ঘটে তার যন্ত্রণা॥

(মেলতা)　　আর দময়ন্তী সতী　　　নল রাজা হয়ে পতি
　　　　　　　বনে ফেলে গেল　　　একবার চাইলে না ॥

এণ্টনীর মেলতার শেষ কলিটি পর্যন্ত রসিক শ্রোতারা মন দিয়ে শোনে। তারপর বলরাম বৈষ্ণবের উত্তর কি হবে তাই নিয়ে জল্পনা কল্পনার গোল ওঠে।

এণ্টনী বিশ্রাম নিতে আসর ছেড়ে আস্তানার দিকে রওনা দেয়। সঙ্গে দলের অনেকেই আসে। নেশা না হলে মেজাজ আসছে না যেন—গাঁজায় টানটা না দিয়ে ঢুকেই তো গলাটা বে-সামাল করলে—নিতাই সাফাই গায়।

—থাক আর কৈফিয়ৎ দিতে হবে না। গাস্‌তো ঘোড়ার এণ্ডা।

এণ্টনীর শরীরটা বিশেষ ভাল নেই, সর্দি সর্দি ভাব। সৌদামিনী বারণই করেছিল—জ্বর-ভাব যখন, তখন আজ আর নাই বা গেলে আসরে।

এণ্টনী বলেছিল—কি যে বল, আগে থাকে খবর দিয়ে না গেলে লোকে যে ভুল বুঝবে। বলবে, ভয় পেয়েছে। তাছাড়া কত দূর দূর থেকে শ্রোতারা আসে গান শুনতে। তারা যে নিরাশ হবে। আর আমার শরীর তেমন তো কিছু খারাপ হয়নি ; তুমি অকারণ ভাব বড় মধুমুখী।

—সব তাতেই ঠাট্টা তোমার। যাও, যা খুসী করগে। সৌদামিনী মুখ ভার ক'রে চলে যায় !

এণ্টনী হাসে, কিছু বলে না। আসরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়।

তারপর আসরে এসে প্রথম পালা শেষ ক'রে দ্বিতীয়বার পাল্‌টাও করলে। কিন্তু ক্রমশঃ শরীরটা ঝিম্‌ঝিম্ করে আরও। তাই নটবরকে বললে, তাড়াতাড়ি কর নটবর, শরীরটা ঠিক ভাল বুঝছি না। নেশার জোরে যদি আজ আসরটার শেষ রাখতে পারি। লাগাও তাড়াতাড়ি।

নটবর ছুরি দিয়ে গাঁজা কাটতে কাটতে বলে,—এই যে হয়ে গেছে।

হারু বলে,—ওস্তাদ, তোমার চোখটা যে ছলছল করছে। জ্বর-জ্বালা ধরলো না তো! দেখি দেখি—এই ব'লে এণ্টনীর গায়ের উত্তাপ নেয়, তারপর উৎকণ্ঠা নিয়ে ব'লে ওঠে—এ তো দেখছি বেশ গরম, অনেক জ্বর বোধ হয়।

এণ্টনী হেসে বলে, তা একটু গরম বটে দেহটা, তবে ধোঁয়ার গরমে ও-গরম নরম হয়ে যাবে। দাও দাও দেখি কল্কেটা, এই ব'লে এণ্টনী নিজেই নেশার জোগাড়ে তৎপর হয়।

আসর শেষ ক'রে বেশ জ্বর নিয়ে ফিরলো এণ্টনী বাসাতে। সৌদামিনী গায়ের উত্তাপ নিয়ে শিউরে ব'লে ওঠে,—তখুনি বারণ করেছিলুম, আজ গিয়ে কাজ নেই, তা কি শুনলে তুমি। শুয়ে পড় দেখি চুপ ক'রে।

এণ্টনী হাসতে হাসতে পোশাক ছাড়তে চেষ্টা করতেই সৌদামিনী বাধা দিয়ে ব'লে ওঠে—থাক, আর এলো গা হয়ে কাজ নেই। এস, শুয়ে পড়, এই ব'লে সৌদামিনী জোর ক'রেই বিছানায় শুইয়ে দেয় এণ্টনীকে। তারপর পরম যত্নে এণ্টনীর মাথাটি কোলে নিয়ে হাত-পাখা দিয়ে হাওয়া দেয়।

এণ্টনী সৌদামিনীর চোখে চোখ রেখে বলে, আগামী কাল যে ফিরে যাবো ভেবেছিলাম গৌরহাটি।

—সে ভাবনা তোমার এখন ভাবতে হবে না। চুপ কর দেখি। দিন নেই রাত নেই, এত কথা বোললে আর অসুখ বাড়বে না? খবরদার আর একটি কথাও নয়।

—তা নাই বল্‌লাম, কিন্তু কিছু খেতে দাও, কি মিষ্টান্ন বানাবে বলেছিলে, বানিয়েছো?

—ওসব খাওয়া হচ্ছে না তোমার আজ। খিদে পেয়ে থাকে জলসাবু লেবু দিয়ে দিচ্ছি এখুনি, খাবে।

—না, এণ্টনী মুখটা কুঞ্চিত ক'রে বলে, সাগুদানার জল আমি খাবো না, আমার এমন কিছু হয়নি—তুমি ভালো ক'রে দেখ না গো, এই ব'লে এণ্টনী সৌদামিনীর হাতটা নিয়ে নিজের কপালে রাখে।

—লক্ষ্মীটি অমন বেয়াড়া আবদার ক'রো না। কিসে কি হয় বলা তো যায় না। এখন ওসব মিষ্টিমণ্ডা খেয়ে কাজ নেই। আমি এখুনি সাবু ক'রে আনছি খাবেখন।

এণ্টনী হতাশ হয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, যথা আজ্ঞা দেবী তব। তবে কি জানো মধুমুখী, মণ্ডামিঠাই খেলে হয়তো বা তোমার ভাবনা কমে যেতো।

—মানে?

—মানে, এই ফিরিঙ্গী কবিওয়ালার পেটে মণ্ডামিঠাই পড়লে জ্বর-জ্বালাও সরে পড়ে তার শরীর থেকে।

—কি মিষ্টিই না খেতে পারো তুমি! শুয়ে থাকো আসছি, সৌদামিনী মুখ ভার ক'রে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওঠে মিষ্টি আনতে।

এণ্টনী হেসে বলে, সাবুর জলই নিয়ে এসো গো। ঐ খাই, শরীরটা যখন……

সৌদামিনী যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে জবাব দেয়—থাক, আর ভালোমানুষী দেখাতে হবে না। মিষ্টি আনছি খাও। জ্বরের ওপর পেটটাও খারাপ হোক; তা নৈলে হবে কেন! রাগে আর দাঁড়ায় না সৌদামিনী।

এণ্টনী মুখ টিপে টিপে মেজাজী হাসি হাসে।

সামান্য জ্বর, তবু দু-চারদিন বিছানায় শুয়ে থাকতে হলো এণ্টনীকে সৌদামিনীর কড়া নজরে। এমন কি গাঁজা খাবারও সুযোগ পায়নি এ কদিন। নীচ থেকে হারু, নটবর, নিতাই ইত্যাদি দলের লোকজনরা দেখা করতে আসে। তাদের গাঁজার কথা বলতে সাহস করে না এণ্টনী সৌদামিনীর ভয়ে। তাই চারদিন বাদে দুটি অন্নপথ্যি করিয়ে এণ্টনীকে পানের খিলি দিয়ে সৌদামিনী যখন বললে, অন্নপথ্যি ক'রে যেন ঘুমিও না। হরিকে তামাক দিতে বলি, তামাক খাও, আমি হেঁসেল চুকিয়ে আসছি।

তখনই এণ্টনী মাথা চুলকে বললে, আমি না হয় নীচে গিয়ে বসি। ওদের সঙ্গে থাকলে ঘুম আসবে না।

সৌদামিনী চোখ পাকিয়ে ব'লে ওঠে—খবরদার! নীচে গেলে কিন্তু খুব খারাপ হবে। এই জ্বরভোগের পর দুটি ভাত পেটে পড়তে না পড়তেই আবার নেশা করতে ছুটলেন। যাও না দেখি একবার।

এণ্টনী মুখখানা চুণ ক'রে ব'লে ওঠে—বড্ড কড়া হয়ে যাচ্ছো তুমি মধুমুখী, এতো কড়া তো তুমি ছিলে না!

—কি হলুম কি ছিলুম, পরে চিন্তা ক'রো, আজ তুমি নীচে মোটেই যেতে পাবে না। তাতে আমি কড়াই হই আর খারাপই হই। এই চললাম শেকল তুলে দিয়ে। তামাক দিয়ে যাচ্ছি, এই ব'লে দরজা বন্ধ ক'রে শেকল টেনে দিয়ে সৌদামিনী রান্নাঘরের দিকে যায়।

এণ্টনী খানিক হতাশ হয়েই ঘরময় পায়চারী করে। তারপর এক সময় ক্লান্ত শরীরে অভিমানে বিছানায় গা এলিয়ে চোখ বোজে।

সৌদামিনী আহারান্তে ঘরে এসে গা ঠেলে ডাকলেও সাড়া দেয় না, কপট নিদ্রায় চুপ ক'রে থাকে। সৌদামিনী মুচকি হেসে কিছু না ব'লে গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়।

—মধুমুখী তুমি আমার নানান্ রসে রসিকা। রাতের ঘন আঁধারে সৌদামিনীর কপোতোষ্ণ বক্ষের পরশ খোঁজে এণ্টনী—দিনের আলোয় অভিমান-ক্ষুব্ধ মন অন্ধকার রাতের পরশে স্নিগ্ধ সরস নমনীয় ভাবে বিভোর।

এণ্টনীর কথায় সৌদামিনী জবাব দেয় না, দিনের বেলার এণ্টনীর মতন মুখ ফিরিয়ে শোয়।

এণ্টনী হেসে সৌদামিনীকে কাছে এনে কানের কাছে মুখ নিয়ে সুর ক'রে গেয়ে ওঠে :—

তুচ্ছ একে রমণী শিরোমণি রসবতী
কোন ইচ্ছে জগমোহিনী।

সৌদামিনী কপট রোষে ঝঙ্কার তোলে—থাক্ আর খোসামোদ করতে হবে না! দুপুরে অত ডাকলাম তা সাড়া নেই মানুষের।

—সখী, দিবস বিরল ছিল তাহে
বুঝি নাইরে পিরীতির রীতি মোহে ॥

—সখী, তোমাকে বুঝি খুব আঘাত দিয়েছি ?

—না গো না, মন আমার পাথর কিনা তাই আঘাত আমি পাই না—সৌদামিনী বিকৃত স্বরে ব'লে ওঠে।

—রাগ ক'রো না গো রাগ ক'রো না, জানতো কতদিন নেশা করিনে, তাই আর কি—এস কাছে এসো—এণ্টনী সৌদামিনীকে ঘন ক'রে জড়ায়। কিছু বলে না সৌদামিনী, শরীরটাকে শ্লথ ক'রে আরামের নিঃশ্বাস ফেলে। তারপর এণ্টনী অধরে চুম্বন আঁকলে নেশা লাগে সৌদামিনীর ঃ ঘন হয়, তারপর দুটি বাহুলতা দিয়ে জড়িয়ে এণ্টনীকে বলে, তুমি বড় দুষ্টু !

এণ্টনী হেসে গালে গাল রেখে বলে, তা আমি তোমার জন্যেই সখী।

—থাক, আর দুষ্টুমি করতে হবে না, ঘুমোও দেখি। রাত অনেক হলো, ফিরিওয়ালাদের ডাক শুনছিনে, ঘুমোও।

—ঘুম আসে না সখী, তোমার রূপ, তোমার নব নব রসবিস্তারে আমার পুলকিত তনু মন পাগল হলো যে—রসসিক্ত কণ্ঠস্বর এণ্টনীর।

—লক্ষ্মীটি ঘুমোও, আজ ভাত খেয়েছো না, আচ্ছা গান গাইছি, তুমি ঘুমোবার চেষ্টা কর, কেমন ?

সৌদামিনী এণ্টনীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে গান ধরে—

নিতুই নূতন পিরীতি দুজন
তিলে তিলে বাড়ি যায়
ঠাঞি নাহি পায়, তথাপি বাড়ায়
পরিণামে নাহি খায় ॥

আবার ডেরা ওঠে। বাঁধা হয় জিনিসপত্তর। নৌকার পালে হাওয়া লাগে, নৌকা চলে পশ্চিমে, কলকাতা থেকে গৌরহাটির দিকে।

ভাঁটা এলে নৌকা নঙ্গর করে। জন এসে উনুন ক'রে দেয়।

সৌদামিনী তীরে নেমে অস্থায়ী উনুনে রান্না করে—খিঁচুড়ী আর

ভাজা। তারপর পরম যত্নে কলাপাতায় গরম গরম খিঁচুড়ী আর ভাজা পরিবেশন করে সকলকে।

—খাসা হয়েছে ঠাক্‌রুণ! এ তোমার সাহেবী কালিয়া পোলাও থেকেও উত্তম, নটবর জিব দিয়ে হাতের চেটো লেহন করতে করতে বলে।

সৌদামিনী তারিফে খুশী হয়। নটবরের পাতের কাছে এসে বলে, তা'হলে আর একটু দেই তোমাকে নটবর?

—না না, করেন কি! পেট যে জয়ঢাক।

—একটু নাও।

—দিবেন, তা নয় দিয়ে যান খানিক।

এণ্টনী খেতে খেতে চোখ ঠেরে সৌদামিনীর উদ্দেশ্যে দুষ্টু হাসি হেসে নটবরকে বল্লে—ডাল আর চাল মিশিয়ে ফোটালেই তো খিঁচুড়ী। এর আবার ভালোমন্দের কি বুঝলে বাপু নটবর? ব'লে দিলে তো কালিয়া-পোলাও-এর থেকে ভালো।

—এর মর্ম ওস্তাদ তুমি বুঝতে পারবে না গো। এইখানে শিখলে তো মোণ্ডা খেতে। জানেননি ঠাক্‌রুণ, আমাদের ওস্তাদ গুপচুপ দোকানেই শুধু মিঠাই খেয়ে ক্ষান্ত যায় না, আসরে গান হলে আগে কর্তাদের ডেকে ডেকে মিঠাই খাবে—এই ব'লে নটবর হাসে।

—খুব যে বলা হচ্ছে নটবর, দেখ নিতাই দেখ তোমার সখার কাণ্ডটা, নিজ কানে শুনে নাও।

—যেতে দাও সাহেব ওর কথা। যা কান্না কাঁদছিল কলকাতায়, এখন ফরেসডাঙ্গার অর্ধেক পথ পেরিয়েছে কিনা তাই জৈবন পেয়েছে। আর জানই তো জৈবনকালে মিথ্যে চাতুরালী না করিলে পুরুষালীই প্রতিপন্ন হয় না। নটুর আমাদের জৈবন এসেছে গো ওস্তাদ।

সৌদামিনীও ওদের কথায় রস পায়, ঘোমটার মধ্যে ঠোঁট টিপে টিপে হাসে।

—বলেছ ঠিক বটেক নিতাই, আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম যে আমরা অর্ধেক পথ এসেছি! নটবর তাই খিঁচুড়িকে পোলাও দেখছে, কিহে নটবর তাই নাকি হে?—এণ্টনী হেসে জিজ্ঞাসা করে।

—ভালোকে ভালো বলবো না তো কি, পথটথ আমি বুঝিনে বাপু, পাতের খিঁচুড়িটা সামলে নিতে নিতে বল্লে নটবর।

—তা বেশ বেশ, কিন্তু অত খাসনি নটু, প্যাট ফেটে যাবে যে, হারু রসান দেয়।

—শালা খেতে দিবিনে, নিজেতো গিললে দমভোর, ঠাকুরুণের হাতে ব্যথা লেগে গেলো তোরেই দিতে দিতে। উঠে পড় না, পংক্তি ভাঙ্গলে আমার মনে ঘা লাগবেনি, উঠে পড় না, এই ব'লে আহারে মনযোগ দেয় নটবর।

সৌদামিনী এবার ব'লে ওঠে, ওকে খেতে দাও না বাপু তোমরা, বকলে কি খেতে পারে মানুষ।

এণ্টনী হারুকে বলে—থাক থাক হারু, ওকে খেতে দাও, ওহে নটবর, আমরা তা হলে—

নটবর ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে সবাই উঠে পড়ে প্রয়োজনের বসেই—ভরা পেটে একটু ধোঁয়া না দিলে যেন জুত হচ্ছে না।

খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকলে জোয়ার এলে মাঝিরা আবার নৌকা ছাড়ে। ছলাৎ ছলাৎ শব্দে ঢেউ কেটে পুরোনো বটতলা, ঝোপ, মন্দির, জনপদ ছাড়িয়ে নৌকা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে। গোধুলির রাঙা আকাশতলে সবুজের নীচে সাদা-কালো রঙের গরুর পাল চলে ধুলো রাঙিয়ে—দূর তীরে রাখাল বালকেরা গোষ্ঠ থেকে ফিরে চলেছে, পাঁচন-বাড়ি হাতে গো-পালের সঙ্গে সঙ্গে—

নৌকোর ছৈ-এর ওপর বসে বসে এণ্টনী তামাক টানে নীরবে আর লক্ষ্য করে।

ছৈয়ের মধ্যে সৌদামিনীরও ভাবান্তর হয়ঃ দূর তীরের সোনা-রঙে আপন অঙ্গনে প্রতীক্ষিত এক স্নেহ-মূর্তি চোখে ভাসে—ছেলেবেলার দিনঃ মায়ের স্নেহ মনে পড়ে। গরুগুলো বাড়ী ফিরলে, প্রতিবেশী

অঙ্গনে ছায়া সন্ধ্যায় সই-এর সঙ্গে খেলার মত্ততার মধ্যে মায়ের স্নেহ-তিরস্কার স্মরণে এলো,—সন্ধ্যে হলো ভাই, মা বোকবে—গুটি গুটি পা ফেলে চুপি চুপি বাড়ী আসা। তারপর মায়ের বকুনি আর স্নেহ-তিরস্কার ; কোলে মুখ লুকানোর ডাক—মাকে জড়িয়ে মুখ ঢাকলে মা স্নেহের আস্তরণ দিয়ে জড়াতেন—সৌদামিনী গোধূলি রঙের স্মৃতি স্মরণে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে।

তারপর এক সময় নৌকার পাটাতনে কলরব ওঠে—গাওনা ওস্তাদ, বেড়ে রং লেগেছে আকাশে। মেজাজ রয়েছে সবার। ভাল লাগবে—এণ্টনীকে আহ্বান জানায় নটবর ঢোলে বোল তুলে।

—এণ্টনী হেসে যোগ দেয়, বলে, গোষ্ঠ গাই, কি বল হারু ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ গোষ্ঠই গাও।

এণ্টনী সুর ধরে দরদ দিয়ে—

ওরে গো-পাল লয়ে যাস্‌নে গোপাল গোষ্ঠে
গোচারণে যাসনে বনে।
গোপাল গোষ্ঠেতে গেলে পরে
পায়ে পায়ে শত্রু ফেরে,
সঙ্কটে তোরে পাঠাইতে শঙ্কা করে,
ননী খাও রে আর মা বল রে চাঁদ বদনে ॥

ছৈয়ের মধ্যে সৌদামিনীর স্মৃতি-স্তব্ধ মনও এণ্টনীর গানের সুরের ছোঁয়ায় কেঁদে ওঠে। বিরলে বসে অশ্রু বিসর্জন করে সৌদামিনী। এণ্টনীর করুণ সুরের ছোঁয়ায় ও মাতৃত্বের রসাস্বাদ গ্রহণ করে মনে মনে।

ওদিকে এণ্টনী আপন রসে আপনি মেতে ওঠে ; অশ্রুবিগলিত কণ্ঠে গেয়ে চলে :—

(খাদ) না হেরে গোপাল তোরে মরি প্রাণে ॥
(ফুকা) আমায় মা বলে আর এমন কেহ নাই ॥
(যদি) যাস্‌ তুইরে প্রাণ কানাই ॥
লাগে যদি রবি কিরণ
মলিন হয় ঐ চন্দ্রবদন,
গোষ্ঠে লয়ে যেতে গোধন মানা করি তাই ॥

(মেলতা) আছে কি অভাব নন্দের ঘরে,
যাবি যমুনার তীরে
করে ধরে রে বলে
খাস নাকি ভিক্ষা ক'রে রাখালগণে ॥

—তারপর চড়ায় নিতাই-হারু এণ্টনীর সঙ্গে গাইতে থাকে—

(চিতেন) গোকুলের গোপাল যত আনন্দে গোষ্ঠের পথে ধায় ॥
(পড়েন) প্রভাত রজনী, শুনে শিঙ্গের ধ্বনি, নীলমণি বলে যশোদায় ॥

নটবর মেজাজে বাজায়। বাহবা নটু! নিতাই তারিফ ক'রে ওঠে। নটবর তেহাই দিয়ে দশকুশী বোলে বাজায়—কিটি তাক্, ধিনি তাক্, তিনি তাক্ ধেত্তা ধেত্তা ধেত্তা ধেত্তা তাক্ থুন্না তাক্ থুন্না ধেনা কিটি তাক্ থুন্না, ধা ধা কিটি ধা, ধা ধা কিটি ধা, ধা ধা কিটি ধা। এণ্টনী তালে তালে হেলেদুলে গেয়ে ওঠে :—

সাজায়ে গোষ্ঠের সজ্জা দে আমারে,
বলি বিনয়ে তোরে।
বেঁধে দে মা পীত ধড়া, গলায় দে মা গুঞ্জছড়া,
মস্তকে দাও মোহন চূড়া, বাঁশী দাও করে ॥

মেলতায় সকলে এণ্টনীর সুরে সুর মেলায় :—

শুনে গোপালের নিষ্ঠুর বাণী
কেঁদে কয় নন্দরাণী
ওরে নীলমণি, ওরে নীলমণি
যেতে দিব না প্রাণ থাকিতে
তোয় গোচারণে ॥

গান শেষ হলে সবাই 'আহা মরি' ক'রে এণ্টনীর সুখ্যাতি ক'রে ওঠে। হারু হেসে বলে—ওস্তাদ, আজ যা গাইলে এমনটি আসরে কোনদিন শুনিনি। দাঁড়াও, আজ এইসা বানিয়ে দিচ্ছি, যা অনেক দিন খাওনি।

এণ্টনী মুখে আঙ্গুল দিয়ে ব'লে ওঠে, আস্তে আস্তে শুনতে পাবে যে।

হারু জিব কাটে, তারপর হাত নেড়ে জানায় চুপি চুপি স্বরে, না না কানে নেননি ঠাকৃরুণ আমাদের।

সত্যিই কানে যায়নি সৌদামিনীর। এণ্টনীর গোষ্ঠ শুনে কেমন-তর যেন হয়ে গেছে সৌদামিনী। অবশ অঙ্গ। বল নেই যেন। চোখে ধারা বয়েই যায়। বুকের ভেতরটা হু হু ক'রে ওঠে। এণ্টনী যদি দেখতো, বিবস বিস্ময়ে হতবাকই হতো। ওমন ধীর স্থির বুদ্ধিমতী এমনি ক'রে কান্নায় নিজেকে হারিয়ে ফেলতে পারে কি ক'রে! এই অবস্থা দেখেও বিশ্বাস করতে সময় লাগতো তার।

দীর্ঘদিন বাদে গৌরহাটির এণ্টনীর বাগানবাড়ী সরগরম হয়ে ওঠে সৌদামিনীর আগমনে। ভোরের বাতাসে ঘুম ভাঙ্গলে আগের দিনের মতন মঙ্গল ছড়া দিয়ে ঝাঁটপাট সেরে গঙ্গার স্নানে যায় সৌদামিনী। তারপর স্নান সারা হলে গুণ গুণ স্বরে প্রভাতী সুরে ঠাকুরের নাম গান করতে করতে ঘরে এসে কাপড় ছেড়ে সোজা পুজোর দালানে গিয়ে বসে। ইদানীং জপতপের দিকে মন দিয়েছে সৌদামিনী। দিন আজকাল কাটছিল তার নানা ভাবনা-চিন্তায়। মন বড় অবসন্ন ছিল। এবার কোলকাতায় কালীঘাটে এক সাধুবাবার কাছে প্রায় যেতো সৌদামিনী। সেই সাধুবাবাই মন্ত্র দিয়ে সৌদামিনীকে বলেছিল, যা বেটী জপগে যা, শান্তি পাবি।

সৌদামিনী সেই থেকে জপতপে মন দিয়েছে। নিত্য গঙ্গাস্নান আর পুজোপাঠ করে। আজকাল সৌদামিনী অন্য কাজে বড় একটা হাত দেয় না।

এণ্টনী এখানে এসে পেটপুরে চব্যচোষ্য খেয়ে, ঘুম দিয়ে, গাঁজা টেনে দিন কয়েক বিশ্রাম নিয়ে সৌদামিনীর সঙ্গ-স্বাদে তন্ময় থাকে। এণ্টনীও লক্ষ্য করে সৌদামিনীর পরিবর্তন। কিন্তু কিছু বলে না। শুধু মাঝে একদিন রাতে শুয়ে সৌদামিনীকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আচ্ছা সহু, এই যে জপতপ করছো ওতে কি শান্তি আসে?

সৌদামিনী কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে উত্তর দিয়েছিল,—আসে

বইকি। তাছাড়া আমি কি নিয়ে থাকবো বলতো? তুমি যখন কাছে থাকো না তখন ঐ জপতপই আমার সম্বল। তাছাড়া বয়স হচ্ছে না, পারের ডাক আসতে কতক্ষণ!

—পারের ডাক। ঠিক বলেছ সদু, পারের ডাক আসতে কতক্ষণ! এণ্টনীও উদাস সুরে ব'লে ওঠে।

—তুমি আবার ওসব ভাবছো কেন? এখন কত নাম হবে তোমার। লোকে ভোলা ময়রার সঙ্গে তোমার নাম করে আজকাল। হ্যাঁ, ভালো কথা, আমার মার মন্দির প্রতিষ্ঠার কথা কি ভাবলে বল দেখি শুনি? সৌদামিনী আবদারের সুরে বলে এণ্টনীকে জড়িয়ে ধরে।

এণ্টনী শান্ত স্বরে ব'লে ওঠে, কাসিমবাজার থেকে ফিরে তো ক'লকাতায়ই থাকতে হবে। তখনই যা হয় হবে, তুমিও তো যাবে?

—মন্দির নির্মণের কাজ আরম্ভ করলে থাকতেই হবে ওখানে। খুব ধূমধাম ক'রে মাকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে কিন্তু। তোমার ঐ পাড়ার লোকগুলোর একটু চৈতন্য হোক। এত অনাচার আর ন্যাংটো স্বভাব বাপু আমার ভালো লাগে না।

এণ্টনী হাই তুলে বলে, বেশ তো গো তাই হবে, তোমার ইচ্ছের উপর আর তো কোন কথা নেই।

সৌদামিনী পুলকে আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে বলে, এইজন্যেই তোমায় ভালোবাসি।

এণ্টনী আবেশভরে সৌদামিনীকে বলে, তোমার আমার ভালবাসা নিয়ে লোকে কত কথা বলে। হয় তো ভোলা আসরে গালও দেবে, এও আমার দৃঢ় বিশ্বাস। সেবারই বললে, দেখবো তোকে কাসিম-বাজারে। তবু বলি মধুমুখী, সে গাল আমার ভূষণ। তোমার আমার ভালবাসায় ওদের বড় হিংসে। সেই চন্দননগরের জোসেফ সাহেব, যে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল, সেদিন দেখা হতেই আমাদের প্রেমের নিন্দা করতেই আমি হেসে বলেছিলাম, কোনদিন প্রেমে পড়নি, প্রেমে মজোনি, খালি নারীদেহ আস্বাদ করেছ।

আমার ব্যাপার নিয়ে কথা বল না। তাই তো বলছিলাম সন্থ, তোমার আমার মনের সুর এমন ক'রে মিলে গিয়েছে যে, সে সুরে বাইরের গালাগালিই বল, কটূক্তিই বল—সবই ভূষণ ব'লেই মানি। আবেগে নিবিড় ক'রে জড়ায় সৌদামিনীকে এণ্টনী।

সৌদামিনী আবেশে অবস। মুদিত নয়ন। জড়িত স্বর—এইজন্যই আমি বুক ভোরে আমার ঠাকুরকে বলতে পারি, আমি নষ্ট নই গো ঠাকুর, আমি নষ্ট নই। আমি প্রেম দিয়ে আরো স্পষ্ট ক'রে বুঝেছি তোমায়।

—সত্যি কথা সন্থ, খুব সত্যি কথা। আমি যদি তোমাকে না দেখতাম, যদি না ভালোবাসতাম, যদি অন্তররসের চাবিকাটি তুমি খুলে না দিতে, তাহলে ঐ জোসেফ কি আমার ভাই কেলীর মত মস্ত ধনী ক্ষমতাবান হয়ে অনেক লোকের উপর হুকুমদারীই করতাম। আর লোভের তাড়নায় উন্মত্ত কুকুরের মত স্বার্থসিদ্ধির জন্যে মারামারি কাটাকাটি ছেঁড়াছেঁড়ি করতাম। মানুষের জীবনের মধুর দিকটার আস্বাদ করতে পারতাম না। ক্ষমতা প্রতিপত্তি অর্থ আমাদের কম সন্থ, কিন্তু এমন শান্তিমাখা আনন্দময় জীবন ক'জন পায়? তৃপ্তির সুরে ব'লে উঠে এণ্টনী সৌদামিনীর বুকে মুখ লুকোয়।

সৌদামিনী সোহাগ আস্তরণে এণ্টনীকে ঢেকে রাখে। ঘন অন্ধকারে কথাস্তব্ধ দুটি শান্ত নিঃশ্বাস ভাসে।

পুজোর আর দেরি নেই। এণ্টনী কাসিমবাজারের দিকে রওনা দিয়েছে সৌদামিনীর পুজোর আয়োজনের সমস্ত ব্যবস্থা ক'রে। যাবার দিন সৌদামিনী মুখ গোমড়া ক'রে বলেছিল,—পুজোর কটাদিন কেন যে বাইরে বাইরে বায়না নাও, বুঝিনে। নিজের বাড়ীর পুজো অথচ তুমি থাকবে না!

এণ্টনী আদর ক'রে ব'লে উঠেছিল—তুমি একাই একশো গো। দশভুজার দশটি হাত বেঁধে তুমি ঠিক বাপের বাড়ী থেকে আনতে পারবে।

—আমি তো বাপ নই, মা। বাপই থাকবে না, আসবে কি ক'রে! মুচকি হাসে সৌদামিনী।

এণ্টনী এবার ম্লান হেসে নিজেকে দেখিয়ে বল্লে, এ বাপটি তো মায়ের দেশের নয়, বিদেশের। তাই বোধ হয় কিছু মনে করবে না গো উমা মেয়ে আমার।

—আবার ঐ কথা! বিদেশী বিদেশী, বিদেশীর কি এদেশী হতে নেই! আমরা সবাই তো ছিলাম বিদেশী। জন্মের আগে কে কোন্ দেশে থাকে বলতে পারো? বিদেশী ভেবে আর ব'লে কেন মনকে মিছে কষ্ট দাও বল দেখি। তুমি দেশী-বিদেশীর বাইরে। তুমি কবি। তুমি ভাবুক। ভাবের জগতে আছো। সে জগতে জাতের বিচার যারা করে তারা মূর্খ। তাছাড়া মনপ্রাণ দিয়ে যে মাটীকে ভালবেসেছ, যার ভাষাকে কণ্ঠের গান করেছো, যে দেশের মেয়ের প্রেমে মজেছো সেই তো তোমার দেশ। খবরদার বলছি, ফের যদি ঐ বিদেশী বিদেশী বলেছ তা'হলে আমি কিন্তু…

এণ্টনী বাধা দিয়ে ওঠে—ঠাট্টা করছিলাম গো, এদেশকে আমি ভালোবেসেছি সত্য, এইখানেই দেহ রাখবো! বিদেশী কেন হতে যাবো, মনে-প্রাণে আমি এদেশী। এই দেখ না কাসিমবাজার থেকে ফিরে এসে কলকাতায় মা কালীর মন্দির কি ধুমধাম ক'রেই না করি।

সৌদামিনীর মুখচোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। এণ্টনীর বুকের কাছে ঘেঁসে আবদারের সুরে বলেছিল, তাড়াতাড়ি ফিরো, আমার বাপু ভালো লাগবে না একা একা বেশী দিন।

—গান শেষ হলেই চলে আসতে হবে আমাদের। ভোলারও বায়না আছে চন্দননগরে যে। তোমার পুজোর ঝামেলা কাটতে কাটতেই চলে এলাম ব'লে।

—সাবধানে থেকো, বিদেশ-বিভুঁই জায়গা। সৌদামিনী উদ্বেগ প্রকাশ করে।

এণ্টনী ঠাট্টা ক'রে ব'লে ওঠে, আমার দায়িত্ব তো নটবরকে দিয়েছো।

—তবু ব'লে রাখছি তোমাকে মিষ্টি পেলেই গোগ্রাসে খেও না। কিছু একটা হলে কে দেখবে শুনি।

—আচ্ছা গো, বেশী খাবো না। চললুম তা'হলে, সাবধানে থেকো। কথাশেষে এণ্টনী নৌকাতে উঠেছিল।

নৌকা ছাড়লে সৌদামিনী সজল চোখে এণ্টনীর নিরাপত্তা কামনায় দুর্গানাম স্মরণ করতে করতে বাড়ী ফিরে এসেছিল। তারপর নিজেকে সারাদিনই কাজের মধ্যে রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু কাজ সারা হলে, রাতের অন্ধকারে এণ্টনীবিহীন শয্যায় সৌদামিনীর চোখে ঘুম আসে না। কাছে পাওয়ার তীব্র বেদনা সময় সময় কান্না হয়ে ফুটে ওঠে। তবুও মনকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করে: কিছুদিনের মধ্যেই তো সে ফিরে আসবে। কিন্তু মন কিছুতেই মানে না ও-কথায়। কাছে পাওয়ার জন্য ছটফট ক'রে শেষে একসময় কান্নায় শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে সৌদামিনী।

ওদিকে কাসিমবাজারে যথাসময়েই এণ্টনী উপস্থিত হয় পঞ্চমীর দিন। কিন্তু মন ভাল নেই, সৌদামিনীর জন্যে বড় মন কেমন করেছে এ'কদিন, নৌকোতে বিশেষ কথাও বলে না, সব সময়েই সৌদামিনীর অশ্রুসজল মুখ ভেসে ওঠে চোখের সামনে, মনটা বিচ্ছেদ-বেদনায় শিরশির ক'রে ওঠে, দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে। ভাবনার শেষ হয় না। আবার আসে চিন্তা—আগে কত জায়গায় গিয়েছে কিন্তু সৌদামিনীর অভাববোধ এত বেশী হয়ে বাজেনি।

এখানে পৌঁছবার পর ভোলানাথের সঙ্গে দেখা হতেই, ভোলানাথ হেসে স্বাগত জানিয়ে বললে, এস, এসহে হেম্নুম, কি ভাবনাই না হয়েছিল, ভাবলাম হয়তো বামনীর আঁচলে বাঁধা রইলে, আজ তা'হলে লড়ছো বল?

এণ্টনী ম্লান হেসে বলে, লড়াই কি করবো, মায়ের নামই গাইবো আজ।

ভোলানাথ চোখ কুঞ্চিত ক'রে হাসির ঝিলিক দিয়ে বললে, আমি কিন্তু ভাই মেজাজে আছি, গাইবো আজ প্রাণ খুলে।

— বেশ তো গেয়ো, তোমার গানই শুনবো না হয় আজ।

—শুনতে পারলে বুঝবো তোমার ক্ষমতা আছে। তা এখন বিশ্রাম-টিশ্রাম নিয়ে রাখ, রাতে তো ছুটবে জ্বালায়! যাও হেস্তুম, মণ্ডামেঠাই খেয়ে ঠাণ্ডা হও গে! মিচকি হাসে ভোলানাথ।

ঠাণ্ডা আমি সব সময়ই। গরম হলে কবি না হয়ে কপিবর হতাম যে! এণ্টনী ব্যঙ্গের স্বরে বললে।

—আচ্ছা শালা, কবি না কপি দেখাবোখন আসরে!

এণ্টনী হাসতে হাসতে চলে যায়। রসিকতা যেন আজ তার ভাল লাগছে না। শরীরের ক্লান্তি, তার ওপর মনও ক্লান্ত। ভোলানাথের কথার আর জবাব দেয় না, এণ্টনা সোজা আস্তানায় গিয়ে বিশ্রাম নেয়।

কাসিমবাজার রাজবাড়ীর চত্বর লোকে লোকারণ্য। ভোলানাথ আর এণ্টনীর গান শুনবার জন্যে দূর দূর থেকে লোক আসছে তো আসছেই। ভীড় বাড়তেই থাকে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। রাজবাড়ী আলোয় আলো। আসরে মানী-গুণী, বন্ধু-বান্ধবকে রাজা হরিনাথ খাতির ক'রে বসাচ্ছেন।

—গানের আর বেশি বিলম্ব নেই, আসুন, বসুন।

আসরে বিশেষ চীৎকার না থাকলেও গুঞ্জন আছে প্রচুর—কি গাইবে রে ফিরিঙ্গী কবি আজ?

—ফিরিঙ্গী কি আর গাইবে! গাইবে আর নাচবে দেখবি ভোলানাথ।

—হ্যাঁ, ভোলা ময়রা আমাদের মহারাজের ফেবরিট। সেই যে সেবার মেয়ে কবিওয়ালী যজ্ঞেশ্বরীকে কি রকম জব্দই না করেছিল ভোলা! বলে কিনা—তুমি আমার গাভীমাতা, চল তোমার পাল ধরতে যাই—বেশ গিয়েছিল মাইরি!

ঐ দেখ ভোলার দল এসে পড়েছে। হাসি হাসি মুখ। ফিরিঙ্গী সাহেবকে একচোট নেবে আজ মনে হচ্ছে।

—কি বকছো, চুপ ক'রে শোন না।

ভোলানাথ আসরে উপস্থিত হয়ে মহারাজ হরিনাথ এবং শ্রোতাদের উদ্দেশ্য ক'রে ব'লে ওঠে, এবার আপনারা অনুমতি দিন গান তা'হলে আরম্ভ হয়।

মহারাজ হেসে বললেন, অনুমতি দিলাম ভোলানাথ, গান আরম্ভ কর, ভবানী বিষয়েই সুরু হোক।

—যথা আজ্ঞা, করজোড়ে নমস্কার জানিয়ে ভোলানাথ দীনু ঢুলিকে বাজাতে বলে, দীনু ঢুলি ধরতার বোল বাজায়। বাজনা থামলে ভোলানাথ গান ধরে।

বেশ জমিয়ে ভবানী বিষয়ক গান গায় ভোলানাথ। শ্রোতারা নিশ্চুপ হয়ে শোনে।

ভোলার গান শেষ হলে এণ্টনী আসরে নামে। এণ্টনীকে বাঙালী পোশাকে দেখে শ্রোতারা খুসীর গুঞ্জন তোলে। নটবরের বাজনা সুরু হয়। এণ্টনী করজোড়ে মাথা ঝুঁকিয়ে মহারাজ ও অন্যান্য উপস্থিত শ্রোতাদের প্রীতি-নমস্কার জানায়, তারপর ভাবমুখর হয়ে বাজনার তালে তালে গান ধরে—

জয়া যোগেন্দ্র জায়া মহামায়া,
মহিমা অসীম তোমার,
একবার দুর্গা দুর্গা দুর্গা ব'লে
যে ডাকে মা তোমায়,
তুমি কর তায় ভবসিন্ধু পার॥

—আহা! কি মনোহর উক্তি! মহারাজ হরিনাথ মুগ্ধ হয়ে ব'লে ওঠেন।

—কি সুন্দর ভাব বলছে ভাই।

—ঈশ্বরের কৃপা আছে হে, তা' নইলে সাহেব হয়েই বা বাংলা দেশের দাঁড়-কবির পেশা নেবে কেন। শোন শোন।

এণ্টনী করুণ কণ্ঠে গাইতে থাকে :—

মা তাই শুনে এ ভবের কুলে
দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে, বিপদ কালে,
ডাকি দুর্গা কোথায় মা, দুর্গা কোথায় মা—
তবু সন্তানের মুখ চাইলে না মা,
আমায় দয়া করলে না মা, পাষাণে প্রাণ বাঁধলি উমা,
মায়ের ধর্ম এই কি উমা ?

এণ্টনী খাদে গাইতে থাকে :—

অতি কুমতি কুপুত্র ব'লে
আপনিও কু-মাতা হলে—আমার কপালে।
তোমার জন্ম যেমনি পাষাণকুলে,
ধর্ম তেমনি রেখেছো,—

(ফুকা) দয়াময়ী ! আজ আমায় দয়া করবে কি মা,
কোন কালে বা কারে তুমি দয়া করেছো।

—সহজ ক'রে কিভাবেই না মাকে ডাকছে। গুলে খেয়েছে হিন্দু ধর্মটাকে, গুলে খেয়েছে ফিরিঙ্গী সাহেব। না খেলে এইভাবে ভাব আসে ? না, গান বেরোয় ?

—তুলনা হয় না, আহা মাগো দয়া করো মা।—ভাবুক শ্রোতার চিত্ত বিগলিত হয়। স্বরে তার প্রকাশ পায়।

—এণ্টনী ফিরিঙ্গী এইভাবে মাকে ডাকতে পারছে আর আমরা কি পাষণ্ড কি নরাধম দেখ, মাকে সামনে পেয়েও দিনান্তে একবার ডাকি কিনা সন্দেহ।

—ও গান গাইছে। ও আবার ডাকা নাকি ?

—ওরে মুর্খ, মাকে ডাকার কোন বাঁধাধরা ধ্যান-ধারণ আছে নাকি ? যে ডাকে মন থেকে, সেটিই ধারা।

এণ্টনী দরদ ঢেলে গাইতে থাকে—

নাম কেবল করুণাময়ী, করুণাশূন্য হয়েছ,
মা তুমি দক্ষরাজ-কুমারী, দক্ষযজ্ঞে গমন করি
যজ্ঞেশ্বরী, যজ্ঞ হেরি নয়নে,
শিব বিহনে, শিব অপমানে

মা সেই অভিশাপে
এমন সাধের যজ্ঞে ভঙ্গ দিলি
দক্ষরাজের নিদয় হলি
আপনি মলি, তাকেও খেলি,
পিতার দুঃখ ভাবলিনে।

—তা যদি ভাবতো তা'হলে প্রলয় কি হতো ? সবজান্তা শ্রোতা হেসে মন্তব্য করে পাশের শ্রোতার দিকে চেয়ে।

এণ্টনী আপন মনে গেয়ে চলে :

তখন যার অপমান শুনে কানে,
প্রাণ ত্যজেছ বিষাদ মনে, দক্ষ ভবনে,
আবার আপনি উমা কঠিন প্রাণে
তার বুকে পা দিয়েছ।

—বা ভাই এণ্টনী ফিরিঙ্গী, বেশ প্রশ্ন শুধিয়েছ।

তুমি তার তার তার, না তার না তার,
আপনার গুণে তরিবো,
দুর্গা নাম তরি মস্তকেতে ধরি
যতন করিয়ে রাখিব
আমার অন্তে শমন এলে অন্ত্যা ফুরালে
দুর্গা দুর্গা ব'লে ডাকিবো,—

উচ্চকণ্ঠে দোহাররা মেলতায় এণ্টনীর সঙ্গে গলা মেলায়।

এণ্টনী চড়ায় দ্বিতীয় চিতেন ধরে—

মা অসাধ্য তোমার সাধন, কোরলে সাধন
কেবল তার নিধন হতে হয়
একবার তারা ব'লে ডেকেছে, সেই ডুবেছে,
তারা তোমার ধারা তো মায়ের ধারা নয়।

ফুকায় গেয়ে ওঠে এণ্টনী :

মা রাবণ রাজা অন্তিমকালে, রঘুনাথের রণস্থলে
দুর্গা ব'লে ডেকেছিল বদনে,
তবু তার পানে ফিরে চাইলিনে,
তার দুঃখ ভাবলিনে,

তারে ধ্বংস ক'রে ভগবতী,
নিদয় হলি ভক্তের প্রতি
শেষকালে তার বংশে বাতি
দিতেও কারে রাখলিনে।
আগে ছিল না তার কোন শঙ্কা
বাজতো জোরে কালীর ডঙ্কা, অতি তেজ ডঙ্কা
আবার ছল ক'রে তার সোনার লঙ্কা
দগ্ধ ক'রে এসেছ,
দয়াময়ী মাগো আমার
কোনকালে বা কারে তুমি দয়া করেছ।

ভবানী-বিষয়ক গান চলাকালীন শ্রোতাদের মধ্যে হৈ-হুল্লোড় সুরু হয়নি। মন দিয়ে উভয় পক্ষের গান শ্রোতারা শুনেছে, তৃপ্তিও পেয়েছে। কিন্তু মুখোমুখি লহরের সময় হৈ হৈ উল্লাসে মারামারি আর চীৎকার-রেশারেশিতে মত্ত সবাই।

—ভোলা যেন তুলো ধুনছে রে ফিরিঙ্গীকে!

—এণ্টনী কি কমটা শুনি! তবে কাঁচা খিস্তি একটু যা কম করছে।

—ওকে কি খেউড় বলে! নে নে শোন, ভোলানাথ কেমন কোমর দুলিয়ে গান ধরেছে।

ভোলানাথ মত্ত। এণ্টনীকে পরাস্ত করতে বদ্ধপরিকর। রাত ভোর হয়ে আসছে। কিন্তু ভোলানাথের ক্লান্তি নেই। দীনু ঢুলির বাজনার তালে তালে রঙ্গ ক'রে নাচে। শ্রোতারা উচ্চহাস্যে মুখর হয়ে ওঠে। ভোলানাথ মুচকি হেসে এণ্টনীকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে গান ধরে উচ্চকণ্ঠে—

পেদরু ফিরিঙ্গী ব্যাটা, পেরু কাটা,
ব্যাটা ছিলো ভালো, সাহেব ছিলো,
হলো বাঙ্গালী,
এখন কবির দলে, এসে মিলে,
ব্যাটা পেটের কাঙ্গালী।
জন্ম যেমন যার, কর্ম্ম তেমন তার,

এ ব্যাটা ভেড়ের ভেড়ে, নিমক ছেড়ে
কবির ব্যবসা ধ'রেছে।

শ্রোতারা হৈ হৈ ক'রে ওঠে—বহুত আচ্ছা!

—প্রাণ খুলে, প্রাণ খুলে ভোলানাথ, প্রাণ খুলে,—মহারাজ উল্লাস প্রকাশ করেন।

শ্রোতারা মজে উঠে কি করবে ঠিক পায় না।

ভোলানাথ নেচে নেচে গেয়ে ওঠে—

কেউ বা কচ্ছেন ব্যারিষ্টারী, কেউ বা ম্যাজিষ্টারী,
এলেমের জোরে কেউ বা কচ্ছেন জজগিরী
আর এ ব্যাটা পুজোর বাড়ী, ভুজোর লোভে
—নাচতে এসেছে॥

—বা ভাই বেশ, নেচে নেচে,—কি দিলে। এ যেন শালা নাটোরের কাঁচা গোল্লা রে!

গানের শেষমুখে মহারাজ খুসী হয়ে পার্শ্ববর্তী বন্ধুর দিকে চেয়ে বললেন, ভোলানাথের মতন উপস্থিত বুদ্ধি দাঁড়া-কবিদের মধ্যে কারো নেই।

বন্ধুটি বললেন, তা বটে, তবে একটা পরীক্ষা করবে?

—কি রকম?

—বঙ্গ দেশের কোথায় কি পাওয়া যায় জিজ্ঞাসা কর দেখি।

—বেশ বলেছো। মহারাজ মেজাজে হেসে আসরের দিকে চাইলেন, তারপর উচ্চকণ্ঠে ভোলানাথকে উদ্দেশ ক'রে বললেন, পাল্টা তো শুনলুম হে। এখন বাংলা দেশের কোথায় কি ভালো জিনিস মেলে তা শোনাও দেখি।

আসরের অন্যান্য শ্রোতারা মহারাজের কথা শুনে হৈ হৈ ক'রে বলে, শোনাও গো কবিমশায় কোথায় মেলে ভালো জিনিস।

ভোলানাথ এন্টনীর দিকে ফিরে বললে, তুমি শোনাবে না কি হে?

এন্টনী হেসে বললে, তুমি যেখানে, সেখানে…

—বাহবা, বাবা আমার কাঁধেই—আচ্ছা তাই সই, এই ব'লে ভোলানাথ জোড়হাতে মহারাজার দিকে চেয়ে বললে, অধম যৎসামান্য যা খবর রাখে নিবেদন করছে, শুনুন মহারাজ, কথা শেষে দীনুকে বাজনার তাল দেখিয়ে গান ধরলে ভোলানাথ :—

ময়মনসিংহের মুগ ভাল, খুলনার ভাল খই।
ঢাকার ভাল পাতক্ষীর, বাঁকুড়ার ভাল দই॥
কৃষ্ণনগরের ক্ষীরপুলি ভাল, মালদহের ভাল আম।
উলোর ভাল বাঁদর-বাবু, মুর্শিদাবাদের জাম॥
রংপুরের শ্বশুর ভাল, রাজসাহীর জামাই।
মেদিনীপুরের শাশুড়ী ভাল, সোহাগ আছে সদাই॥
শান্তিপুরের শালী ভাল, ভালো তার খোঁপা।
গুপ্তিপাড়ার গিন্নি ভাল, ভালো তার চোপা॥
সুখসাগরের নাতনী ভালো, বড় রসবতী।
কাটোয়ার ভাজ ভাল, দেওরেতে প্রীতি॥
নোয়াখালির নৌকা ভালো, চট্টগ্রামের ধাই।
গোয়াড়ীর গুণ্ডা ভালো, তুল্য তার নাই॥
দিনাজপুরের কায়েত ভালো, হাবড়ার ভালো শুঁড়ি।
পাবনা-জেলার বৈষ্ণব ভালো, ফরিদপুরের মুড়ি॥
বর্ধমানের চাষী ভালো, চব্বিশ-পরগণার গোপ।
পদ্মানদীর ইলিশ ভালো, কিন্তু বংশ লোপ॥
মাণিককুণ্ডের মূলো ভালো মুড়ি দিয়ে খেতে।
চন্দ্রকোণার ঘৃত ভালো অন্ন ব্যঞ্জনেতে॥
বীরভূমের আচার ভালো, মোরব্বা ভালো তার।
হালিশহরের দোকা বেগুন, পোড়া মজেদার॥
জয়নগরের মোয়া ভালো, খোসবয়ে প্রাণ হরে।
জনাইয়ের মনোহরা ভালো, জিবে জল সরে॥
মানকরের কদ্‌মা ভালো, বালীর ভালো পটোল্।
বৈদ্যবাটির কুমড়ো ভালো, কিন্তু পেটের গোল॥
হুগলীর ভালো কোটাল লেঠেল, মল্লভূমির ঘোল।
ঢাকের বাদ্যি থামলেই ভালো, হরি হরি বোল॥

—হরি হরি ব'লে ভাই, ভোলানাথের জয় গাই : হরিধ্বনিতে শ্রোতারা আসর মাতিয়ে ভোলার প্রশংসায় মুখর হয়।

মহারাজ হরিনাথ সাধু সাধু রবে ভোলানাথকে তারিফ ক'রে ওঠেন।

এণ্টনীও ভোলার পিঠ থাবড়ে হেসে বললে, না ভাই ভোলা, তোমার মত এখনও অত বাঙ্‌লা দেশে ঘুরিনি। বেশ হয়েছে কিন্তু ভালোর ছড়াটি।

—তাই না কি হে হেস্মুম! মুচকি হেসে বলে ভোলানাথ।

—সত্যিই ভালো হয়েছে। আন্তরিক সুরে ব'লে ওঠে এণ্টনী।

ওদিকে আসরে এণ্টনীর সমর্থকরা সোরগোল ক'রে ওঠে : 'এণ্টনীর জবাব চাই।'

—কি আর বলবে রে! সবইতো আমাদের ভোলা ব'লে দিলো। ভোলার সমর্থকদের একজন আসরে দাঁড়িয়ে উঠে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ব'লে উঠলো।

মহারাজ হরিনাথের বন্ধুটি মুচকি হেসে মহারাজকে ব'লে ওঠেন, এণ্টনী কিন্তু এবার বেশ মুস্কিলে পড়লো, আচ্ছা এক মজা করলে হয় না?

মহারাজ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, খুলেই বলো না ভনিতা না ক'রে।

—বলছিলাম কি, ভোলানাথ তো বিভিন্ন জায়গার ভাল ভাল খাদ্য-দ্রব্যের নাম ক'রে আমাদের রসনায় সুড়সুড়ি দিয়ে গেল। তা এণ্টনীকে জিজ্ঞাসা করা হোক্ না, ওর রসনায় কোন্ দ্রব্যটি সুড়সুড়ি দিয়েছে।

—বেশ বলেছো বটে! তাই জিজ্ঞাসা ক'রে ছড়া কাটতে বলা যাক্।

—পারবে কি? বোধ হয় না—

—দেখাই যাক্ না, ওর এলেমদারী কতদূর, এই ব'লে মহারাজ উঠলেন চেয়ার ছেড়ে। তারপর আসরের দিকে দু'হাত প্রসারিত ক'রে সকলকে চুপ করতে আদেশ করলেন। মোসাহেবদলের কয়েকজনও উচ্চকণ্ঠে আসরের গোলমাল থামাতে সচেষ্ট হলো মহারাজকে খুসী করতে।

কিছুক্ষণ চেষ্টার পর আসর শান্ত হলো। মহারাজ এণ্টনীর

উদ্দেশে উচ্চস্বরে ব'লে উঠলেন, ভোলানাথ আমাদের অনেক কিছু ভাল খাবার খেতে ব'লে গেল। আশা করি ভোলানাথ আপনার রসনাকেও সিক্ত করতে পেরেছে। শেষবেলা এবার আপনিই বলুন এণ্টনী সাহেব, আপনার রসনা কি পেলে তৃপ্ত? আমাদের কিন্তু হাই উঠছে ভোলানাথের খাবারের ফর্দ শুনে, কথা শেষে মহারাজ একটু মুচকি হেসে বসে পড়লেন।

এণ্টনী স্নিগ্ধ হাসি হেসে হাতজোড় ক'রে ব'লে ওঠে, 'ভোলানাথ দেশ উজাড় ক'রে অনেক কিছুই নিয়ে এলো আমাদের রসনার সামনে শুধু একটি জিনিস বাদে মহারাজ!' যে জিনিসটা না পেলেই আমার হাই ওঠে। এই ব'লে এণ্টনী ভোলার দিকে চেয়ে একটু হাসলো।

—কি জিনিস! কি জিনিস! আসর জনরবে মুখর হয়ে ওঠে।

ভোলানাথও চোখ কুঁচকে শোনে এণ্টনীর কথাগুলো। কিছুক্ষণ আগের আসর জয়ের খুসীর হাসিটা মিলিয়ে যায় তার মুখ থেকে। এণ্টনী কি বলতে চায় তা শোনার জন্য সেও প্রতীক্ষা করে।

এণ্টনী আর একবার ভোলার দিকে চেয়ে হাসলো, তারপর আসরের দিকে মুখ ফিরিয়ে ব'লে উঠলো, আপনারা চুপ করুন দয়া ক'রে, আমিই বলছি কি অমূল্য জিনিস ভোলা আজ বাদ দিয়ে গেল। এই ব'লে এণ্টনী মহারাজের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে, "অনুমতি দেন মহারাজ, ভোলার মান আমিই আজ রাখি।"

—বহুৎ আচ্ছা সাহেব! বহুৎ আচ্ছা!!

মহারাজ অনুমতি দিলে এণ্টনী নটোবরকে বাজনা ধরতে নির্দেশ দিয়ে চাদরটা কোমরে বেঁধে নিল আবার, তারপর শ্রোতাদেরকে লক্ষ্য ক'রে উচ্চকণ্ঠে ব'লে উঠল—তাহলে শুনুন ভদ্রমহাশয়গণ, একদিন এক আসরে আমাদের এই ভোলানাথই গেয়েছিল, এই ব'লে এণ্টনী হেলে-দুলে ভুঁড়ি দুলিয়ে ধুয়োর তালে গানের সুরে ব'লে উঠলো,—"এই ভোলানাথই গেয়েছিলো অ—গ।" ধুয়োর তালে তালে কিছুক্ষণ নেচে তেহাইয়ের পর এণ্টনী বলে, এই ভোলানাথই একদিন বলেছিল—

—"লক্ষীছাড়া বাসীমড়া যার পানের কড়ি নাই।"

সেই পানকেই আজ আমার মতন আপনাদের রসনায় উপহার দিয়ে বলি "হে মহাশয়গণ"—এই ব'লে এণ্টনী আবার বাজনার লয়টা দ্রুত করতে ইসারা ক'রে গান ধরলো—

বাংলাদেশে ও পান তুমি
হিন্দীতে তাম্বুলী!
তোমার দেখা না পেলে ভাই
ঘন ঘন হাই তুলি—

গানের কলি ছেড়ে এণ্টনী নেচে নেচে ধুয়োর তালে সুর ক'রে ব'লে ওঠে—ও পান, পান রে……

বাহবা সাহেব, বাহবা! শ্রোতারা উল্লাসে চিৎকার ক'রে ওঠে। রাজা হরিনাথ বন্ধুটিকে ব'লে ওঠেন—না হে, সত্যিই এলেমদার ফিরিঙ্গি সাহেব।

এণ্টনী ধুয়োর শেষে আবার গান ধরে :—

মহারাষ্ট্রে বিড়েচা পান
গুজরাটেতে নাগরবেল
এস না পান মহারাজ
দেব তোমায় যত তেল?
বোম্বাইতে বিলিদেলে
তামিল বলে বেত্তিলাই;
তোমার দেখা না পেলে ভাই
আমরা যে গো মরে যাই।
তেলেগুতে তামালপাকু
বলেও বা কেউ নাগবল্লি
এণ্টনী ভুললে ও পান
(পান রে……)
জেনে রাখিস্ ঠিক মরিল।

ধুয়োর সঙ্গে সঙ্গে হেলে দুলে আরও খানিক নেচে গানের শেষে এণ্টনী হেসে বলল, এই গানটিকে ভোলার তালিকায় যোগ ক'রে দিলাম।

এবার এণ্টনী ভোলার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলো, কিছু মনে করিস্‌নি ত ভাই?

না রে হেসুম, পানের কথা এনে ভালই করেছিস্। আমি খুশিই হয়েছি। পান খেতে তুই যে কত ভালবাসিস্ তা আজই বুঝলুম। এণ্টনী তৃপ্তিসূচক স্বরে বলে, "সত্যি ভাই, পান না পেলে মরে যাই আমি।"

ভোলানাথ আর কিছু বললো না, শান্ত হাসি হাসলো শুধু।

গান শেষে মহারাজ জয়-পরাজয় অমিমাংসিত রেখে উভয়কে পুরস্কৃত করলেন। এণ্টনীকে তারিফ ক'রে বললেন, আপনার ভবানী-বিষয়ক গানের তুলনা নেই। সেদিক থেকে আপনি জিতেছেন।

এণ্টনী হাসে, বলে, ভোলার সঙ্গে কি আমি পারি।

মহারাজ হেসে বলেন, কিন্তু আপনাদের জুড়ি খুব মজাদার। বেশ জমে।

এণ্টনী বিনয়ে মৃদু হাসলো, কিছু বললে না।

ভোলানাথ রসিয়ে বললে, সাদায় কালোয় মেলে ভালো।

মহারাজ উচ্চহাসি হাসেন ভোলানাথের রসিকতায়।

এণ্টনী এবার করজোড়ে ব'লে ওঠে, এবার যদি অনুমতি করেন আমি বিদায় নিই।

—সে কি, এর মধ্যে যাবেন কি! দু-দিন আরো থেকে যান।

এণ্টনী বিনয়সূচক স্বরে ব'লে ওঠে, এবার মাপ করবেন। আমাদের আবার একাদশীতে চন্দননগরে গান আছে। আবার যদি ইচ্ছা করেন তো আসবো, আর থাকবোও তখন।

এবার ভোলানাথ বললে, হ্যাঁ মহারাজ, এবার আমাদের যেতে দিন। সাহেবের সঙ্গে আমিও বায়না নিয়েছি ওখানেই। ডাকলেই হাজির হবো আবার।

—তা বায়না যখন আছে তখন আর আটকাবো না। তা'হলে খাজাঞ্চিখানায় গিয়ে আপনাদের দক্ষিণা ইত্যাদি যা প্রাপ্য নিয়ে নিন। আচ্ছা, আপনারা বিশ্রাম করুন। আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।

—আপনি ব্যস্ত হবেন না। সে ঠিক হয়ে যাবে। এখন তাহলে...

—আসুন। কিন্তু সামনের বার এলে পালাই পালাই করলে ছাড়বো না।

—না না কথা দিচ্ছি, নিশ্চয়ই থাকবো। আসি তা'হলে। এণ্টনী মহারাজকে নমস্কার জানিয়ে ধীরে ধীরে আস্তানার দিকে এগিয়ে যাবার উদ্যোগ করতেই ভোলানাথ উচ্চকণ্ঠে ব'লে ওঠে—দাঁড়াও হে, ফেলে পালাবে নাকি ?

দূর থেকে এণ্টনী হেসে ব'লে ওঠে, সে কি হে, ফেলে পালাব কি ক'রে ! আমি যে আজ গাঁটছড়া বেঁধেছি !

মহারাজ তারিফ ক'রে ওঠে, সাবাস এণ্টনী সাহেব।

ভোলানাথও হাসে। তারপর মহারাজকে বলে,—আজ্ঞা করেন তো এবার অধম বিদায় নেয়।

মহারাজ ভোলানাথের পিঠ চাপড়ে বললেন, আবার এসো হে।

—আসবো বইকি, আপনার ডাক আগে মানি। আপনার ন্যায় উদারচেতা কবি-গানের সমজদার শুধু মুন্সিবাবুকেই দেখি। আসবো বৈকি, এই ব'লে ভোলানাথ নমস্কার ক'রে মহারাজের কাছ থেকে বিদায় নেয়।

কাসিমবাজারের গানের আসরে ভোলানাথের ব্যক্তিগত আক্রমণ এণ্টনী গায়ে মাখেনি। সারা পথে এণ্টনী বেশীর ভাগ সময়ই ভোলানাথের সঙ্গে গল্প ক'রে কাটিয়েছে। হাসি-ঠাট্টায় দুজনেই মশগুল ছিল।

কিন্তু চন্দননগরে গিয়ে আসরের আগে বিশ্রাম নিতে নিতে অন্য লোকের সামনে এণ্টনী হেসে হঠাৎ ঠাট্টার ছলে ভোলানাথকে বললে, কি হে ময়রা, কিরকম মিঠাই-মণ্ডা বানাবে এখানে ?

এণ্টনী ভোলানাথকে ময়রা ব'লে সম্বোধন করতেই ভোলানাথ কিছুক্ষণ গুম হয়ে চুপ ক'রে বসে থাকে। তারপর ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলে, হেস্নুম, জাত তুললি ! আচ্ছা উত্তর এখন দেবো না, আসরে শুনিস্। ভোলানাথ বেশ কুপিত হয়েই চলে গেল।

এণ্টনী মুচকি হেসে নটবরের কানে কানে বলে, ভোলানাথ ক্ষেপেছে !

—তা'হলে সাহেব, তোমায় আসরে আজ খুবই গাল দেবে।

—দিক না কত গাল দিতে পারে ভোলা।

নটবরের মনঃপূত হয় না এণ্টনীর কথা। বলে, কেন যে গাল খাও বুঝি না। ভোলানাথের রসকলি কণ্ঠি নিয়ে তুমি তো গলাতে পরো।

এণ্টনী কোন জবাব দেয় না। হাসে শুধু।

আসরে সত্যিই ভোলানাথ এণ্টনীকে ছেড়ে কথা বললে না। ভোলানাথ আজ ক্ষেপেছে। শেষবেলায় এণ্টনীর ময়রা বলার শোধ ভালোভাবেই তুলে ছাড়লে। দীনু ঢুলি মহানন্দে বাজিয়ে ভোলাকে আরো নাচায়।

ভোলানাথ গান ধরে—

বামুন বলে 'আমি বড়', কায়েত বলে 'দাস'
বদ্যি বলে 'দ্বিজ আমি', ঢাকা জেলায় বাস ॥
যুগী বলে 'যোগী আমি,' চাষা বলে 'বৈশ্য',
শূদ্রও শূদ্রত্ব ছাড়ে, যথা কালীঘাটের নস্য ॥
বলে 'উগ্র নহি শূদ্র,—ধরি তলোয়ার,'
হলে রাত্রি, উগ্রক্ষত্রী, ভয়ে পগার পার ॥
চাষাধোপা 'সচ্চাষী' বলে, কৈবর্ত 'মাহিষ্য',
সবাই বড় হ'তে চায়, কেউ কারো নয় বশ্য ॥
এণ্টনী ফিরিঙ্গী বাচ্ছা, না আছে তার কাচ্চাবাচ্ছা,
ব্যাটা বড় নচ্ছারের শেষ,—

এতক্ষণ ভোলার গান আসরের বিভিন্ন জাতের শ্রোতারা চুপটি ক'রে শুনছিল। এই বোধহয় তারও জাত তুললে, এই আশঙ্কায় শ্রোতারা ভয়েভয়েই ভালমানুষের মতন নিশ্চপ হয়েছিল। কিন্তু এণ্টনীকে গাল দিতেই উল্লাসের দমকা চীৎকার ওঠে। গোল কমলে ভোলানাথ গান ধরলে :

—তার বাপ-মায়ের খবর নিলে,
কিছু না মেলে ধরাতলে,
ব্যাটার যেমন ধর্মকর্ম, তেমন বেশ !

আমি ময়রা ভোলা, ভিঁয়াই খোলা,
ময়রাই বারো মাস,
জাতি-পাঁতি নাহি মানি, ওগো মোর কৃষ্ণ পদে আশ!

আসরে হৈ চৈ লেগে যায়। বাবুরা ভোলার জয় সাব্যস্ত করলেন আসর শেষে। ভোলানাথ খুশী হয়ে এণ্টনীর সন্ধানে আস্তানায় আসে।

এণ্টনী কিন্তু হাসিমুখেই ভোলানাথকে স্বাগত করলে, এস ভাই ভোলানাথ।

—কি হে হেস্সুম, জাত খুঁড়ে মজাটা কেমন পেলে দেখলে তো! তবে হ্যাঁ, কারুকে বাদ দেইনি। সকলকেই নিয়েছি এক হাত ক'রে—জাত জাত ক'রেই দেশটা উচ্ছন্নে গেল!

—সে কথা ঠিকই। তবে কি জান ভোলা, তোমাকে ময়রা ব'লে ঠাট্টা করেছিলুম, জাত তুলে গাল দিইনি।

ভোলানাথ কিছুক্ষণ এণ্টনীর দিকে চেয়ে থাকলো তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে। তারপর একটু কোমল হেসে বল্লে, মনে বড় ব্যথা পেয়েছ না হেস্সুম? তা ভাই শ্রোতাদের একটু আধটু মিষ্টি দিতে গেলে আমাদের গায়ে একটু আধটু নিতে হবে বইকি। তা নইলে যে জোলো একঘেয়ে হয়ে উঠবে যে! মাঝে মধ্যে একটু আধটু উত্তাপ দেই। তুমিও দিও না আমাকে। তা দাও নাকি! সময় সময় মিষ্টি ক'রে বেশ তো ছাড়ো বাবা! পেটের পিলে পর্যন্ত চমকে দাও। তা কলকাতা যাবে কবে হে?

—যাবো শীঘ্রই। গিন্নীটির মনোরঞ্জন করতে হবে ভাই। তাছাড়া নিজেরও সাধ একটি কালীমন্দির নির্মাণ করি।

—তাই নাকি, ভারি আশ্চর্য কথা যে হে। শেষ পর্যন্ত একেবারে আমাদের মত পাকা হিন্দু লোক হয়ে উঠবে দেখছি! ভোলানাথ বিস্ময় প্রকাশ ক'রে ব'লে ওঠে।

এণ্টনী স্নিগ্ধ হেসে বলে, হিন্দুটিন্দু বুঝিনে ভাই ভোলা। তবে এই দেশের মাটির সঙ্গে ভাবের সঙ্গে মিলে আমি খাঁটী বাঙালী হতে চেয়েছি। বাংলার আচার-বিচার-সংস্কার-উৎসব—সব কিছুই আমার নিজের ব'লেই মনে হয়।

ভোলানাথ আগ্রহ নিয়েই শোনে। কিছু বলে না।

—তাছাড়া কি জান ভোলানাথ, বয়েস বেড়ে গেছে। কবে থাকি কবে নেই। যাকে ভালবেসেছি তার অন্তরের ইচ্ছেটা পূরণ করতে বড় সাধ হয়েছে ভাই।

—এ তো অতীব ভাল কথা। তা'হলে তাড়াতাড়ি আসছো ক'লকাতা ?

—হ্যাঁ, ইচ্ছে তো তাই।

—বেশ, এস। আমিও তোমার জন্য ভিয়েনের ব্যবস্থা ক'রে রাখবো।

—তোমার ভিয়ানই তো কলকাতায় আমার প্রধান আকর্ষণ। এণ্টনী হাসে। তারপর ভোলানাথের হাত দুটি ধরে বলে, এবার তা'হলে বিদায় দাও ভাই। ভাঁটা থাকতে থাকতে বাড়ী যাই, নৈলে বড্ড বেলা হবে।

—আরে ! চল চল, আমিও যাবো। দলের সব আগে ভাগেই এগিয়ে গেছে ঘাটের দিকে। ব্যস্ত হয়েই এণ্টনীর সঙ্গ নেয় ভোলানাথ।

দীর্ঘদিন বাদে আবার মিলন। গৌরহাটির নির্জনতায় শান্ত আনন্দে এণ্টনী তৃপ্তিতে স্বোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সৌদামিনীকে বললে, এবার কিন্তু মধুমুখী বড় কষ্ট হয়েছিল তোমাকে ছেড়ে থাকতে।

—আমারও গো, রাতে একা একা এমন মন কেমন করতো— সৌদামিনী কথা শেষ করে না, এণ্টনীর বুকে মুখ গুঁজে চোখ বুজে আরামের নিঃশ্বাস ফেলে।

—বয়স বাড়লে বোধ হয় এমনিই হয়। কাছ ছাড়া করতে মন সরে না। নিবিড় বন্ধনে বাঁধে এণ্টনী সৌদামিনীকে।

আদরে সোহাগে শিশুর মত আবদারের সুর তোলে সৌদামিনী —এবার তুমি দূরে মোটেই যেতে পারবে না। কাছেপিঠে গানের বায়না নেবে, বুঝলে।

—আচ্ছা গো আচ্ছা। এখন তো বেশ দিনকতক কলকাতায় এক সঙ্গে থাকি তো। তোমার মায়ের প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা তো করতে হবে। ভোলাকে বললাম, তোমার ইচ্ছের কথাটা। ও তো অবাকই হলো দেখলাম।

সৌদামিনী হেসে বললে, তাই নাকি! তোমাকে ঠুকলে না? নটবর বলছিল, মোদকমশাই তোমাকে কাসিমবাজারে চন্দননগরে উঠতে বসতে গালিগালাজ করেছে।

এণ্টনী হেসে বলে,—আসর জমাতে ভোলা একটু গালি দেয়ই আমায়। তবে খুব ভালবাসে গো।

—অমন ভালোবাসার মুখে ছাই! সৌদামিনী বিকৃত ভঙ্গিতে মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

এণ্টনী হাসে উচ্চ হাসি। হাসি থামলে সৌদামিনীর দিকে চেয়ে বলে, তুমি যে বড্ড চটা দেখছি ভোলানাথের ওপর।

—তোমাকে যারা গাল দেয় তাদের আমি মোটেই দেখতে পারিনে। দোষ থাকলে দোষ খুঁড়ুক, গাল দিক। কিন্তু শুধু-শুধু নেমক ছেড়ে পেটের কাঙ্গালী, পেরুকাটা ফিরিঙ্গী ব'লে গাল দেবে তোমাকে! এ কি রকম রসিকতা বলো তো? রাগের ঝাঁঝ থাকে সৌদামিনীর স্বরে।

এণ্টনী সৌদামিনীর মাথার চুলে আঙ্গুল চালিয়ে মিষ্টি স্বরে বললে, কবি-গানে রস আনতে মাঝে মাঝে খেউড় লহর ক'রে প্রতিপক্ষকে গালাগাল না দিলে আসরের শ্রোতারা যে বদনাম করবে। এক-ঘেয়েমি কি মানুষের ভাল লাগে। আমিও তো সময় সময় গাল দিয়ে পূর্বপক্ষ করি গো মধুমুখী। ভোলা না গাল দিলে আমি কি ক'রে নিজের গানের ধার বুঝবো বলতো।

সৌদামিনী মানতে পারে না এণ্টনীর কথা। তাই বললে, তবু গালাগালির একটা ছিরিছাঁদ থাকবে তো। রাম বসুও তোমাকে পূর্বপক্ষ করে, কিন্তু অত গাল দেয় কি! সেবার কলকাতায় সে আসরে আমি তো ছিলাম। মনেও আছে, কি সুন্দর না লেগেছিল তোমাদের দু'জনের গান। রাম বসু তোমায় গঞ্জনা দিয়েছিল বটে। কিন্তু—

—গঞ্জনা তো দিয়েছিলো মধুমুখী, এণ্টনী হেসে ব'লে ওঠে কথা কেড়ে নিয়ে।

—সে গঞ্জনা আর তোমার ময়রা বন্ধুর গালে আকাশ-পাতাল তফাৎ যে। তোমাকে—ব্যাটা নচ্ছার, ফিরিঙ্গীর বাচ্চা, না আছে কাচ্ছা-বাচ্চা, এ কথা তো বলেনি। বলেছিল—

সাহেব, মিথ্যা তুই কৃষ্ণপদে মাথা মোড়ালি,
(ও তোর) পাদরী সাহেব শুনতে পেলে গালে দেবে চুণ-কালি॥

এণ্টনী হেসে জিজ্ঞাসা করে—এর উত্তরে আমি কি বলেছিলাম বল তো?

—তুমি যা বলেছিলে তার তুলনা নেই গো। ঢলঢলে স্বর, টলটলে চোখ সৌদামিনীর—তুমি আমার ইয়ে ব'লে বলছি না। কিন্তু অমন ভাবের কথা ক'টা লোকে বলে? ক'টা লোকে ভাবে? সেদিন আসরে সবাই একবাক্যে স্বীকার করেছিল, হ্যাঁ, ভাবের মত ভাব দিয়েছে। একবাক্যে তোমার জয় গেয়েছিল সবাই। আমার আজও তোমার সেই শান্ত মুখের গানের কলিগুলি ভাবলেই আমি যেন শুনতে পাই, এই ব'লে সৌদামিনী চোখ বুজে সুর ক'রে গেয়ে ওঠে:

খৃষ্টে আর কৃষ্ণে কিছু প্রভেদ নাইরে ভাই
শুধু নামের ফেরে মানুষ ফেরে এও কোথা শুনি নাই॥
আমার খোদা যে, হিন্দুর হরি সে,
ঐ দেখ শ্যাম দাঁড়িয়ে রয়েছে—
আমার মানব জনম সফল হবে,
যদি রাঙা চরণ পাঁই॥

—বাঃ, বেশ সুন্দর লাগলো তো। আমার গান তোমার কণ্ঠে মধুমুখী, দেখি দেখি মুখখানি, একটু আদর করি।

—যাও, খালি ঠাট্টা তোমার! সৌদামিনী কপট অভিমানে মুখ লুকোয় এণ্টনীর কাঁধে।

—ঠাট্টা না গো, তুমি যদি কবি গাইতে, নামে তুমি যজ্ঞেশ্বরীকেও ছাড়িয়ে যেতে।

—আবার ঠাট্টা যদি করো চলে যাবো ঘর থেকে।

—না না সই, বিচ্ছেদ আর সইবে না—বহুদিন পরে বহুঁয়া আইল—এখন কি মুখ ভার করে! চাঁদের মতন হাসতো দেখি—এই ব'লে এণ্টনী সৌদামিনীর মুখটি নিজের মুখের সামনে তুলে ধরে।

—আঃ, কি কর বলদিকি। কথা বলতে দাও না। দেখ, এবার যখন মোদকমশায়ের সঙ্গে কবি গাইবে তখন আমার একটি হেঁয়ালী তোমার জবানীতে দিওদিকি।

—শুনি কি রকম তোমার হেঁয়ালী! বল বল, সাধে কি বলছিলাম, তুমি যদি কবি গাইতে……

—ফের ঐ কথা! বলবো না, যাও। সৌদাদিনী মুখ ভার করে।

—বল বল সখী। আর বলবো না ও কথা।

কথান্তে এণ্টনী ঘন চুম্বন আঁকে। তারপর আবদারের সুরে বলে, কই গো বল। সৌদামিনী এবার তৃপ্ত স্বরে বলে, বলছি, শোন, তোমার ময়রা বন্ধুকে প্রশ্ন করবে:

> তিন বীর বার শির বেয়াল্লিশ লোচন
> চারি জাতি সেনা ঘোরে ছেয়ানব্বই ভবন
> কহ কহ ময়রা ভোলা হেঁয়ালীর ছন্দ
> মূর্খেতে বুঝিতে নারে পণ্ডিতের লাগে ধন্দ।

—মনোহর, মন হরেছো কি সাধে, এণ্টনী হেসে ব'লে ওঠে। সুন্দরী! সুন্দর হেঁয়ালীটি। উত্তর দিতে বেশ একটু ভাবতে হয়।

—তা তুমিই বলো না দেখি উত্তরটা? মুচকি হাসে সৌদামিনী।

—আমি দেবো না সই উত্তর। হার মানতে আমি সব সময় প্রস্তুত থাকি তোমার কাছে, এই ব'লে সৌদামিনীর চিবুক ধ'রে এণ্টনী সুর ধরে—

> জিনেছি আমি প্রেমেতে
> (ও সই) হারি যে আমি মানেতে
> রাই মানিনা তোমার মানের বাণ

বসন্তের চর পঞ্চজন পঞ্চ বাণ
পড়ে এই পঞ্চ তখন ভূতলে,
শতদলের দুটি দলে, রাধে তোর পদতলে,
হার মানে যে নিতুই করি নানা ছলে ॥

এণ্টনী গলায় সুর নিয়ে হাঁটু ভেঙ্গে বসে।

—আঃ, কি কর বলদিকি! ত্রস্ত-স্বর-শেষে আলিঙ্গনবদ্ধ সৌদামিনী হাসে উছল ঝরণা হাসি।

খুসীতে জীয়ন্ত। স্তব্ধ হয় না প্রৌঢ়ত্বে চিহ্নিত হয়েও। আপন স্ফূর্তিতে এগিয়ে যায় গঙ্গাশীতল প্রাণ-স্রোত। নির্জন সবুজে পাখীরা যেমন কাকলী তোলে ভোরের আলিঙ্গন-স্বাদ পেয়ে তেমনি এণ্টনী সৌদামিনীর সঙ্গ-সুধায় সরস হয়ে নিত্য নূতন সৃষ্টিতে সজীব থাকে।

ক্লান্তি নেই। গ্রামের পর গ্রাম, গঞ্জের পর গঞ্জ, নগরের পর নগর গান গেয়েই চলে; ক্লান্তি অনুভব করে না এণ্টনী। এই পল্লীর দেশের কমনীয় সুরে বিরহ, সখীসংবাদ, মাথুর, গোষ্ঠ নতুন নতুন গানের কলি বাঁধে এণ্টনী।

ভোলানাথ মোদক, রাম বসু, রাম স্বর্ণকার, যজ্ঞেশ্বর দাস ইত্যাদি কবিয়ালদের সঙ্গে পাল্লায় আর নানান্ মানুষের সংস্পর্শে বিচিত্র অভিজ্ঞতার আস্বাদে এণ্টনীর রসিক মন সদাই উন্মুখ থাকে।

এবার কলকাতায় এসে এণ্টনী আরো উৎসাহের সঙ্গে বায়না নিতে থাকলো। নটবর, নিতাই, হারু সময় সময় এণ্টনীকে নিষেধ করে—কি করছো ওস্তাদ! শরীর বইষে কেন! দিন কতক ক্ষেমা দাও না কেন।

এণ্টনী হেসে বলে, গানে আমি ক্লান্ত নই নটবর। তা'ছাড়া লোকে ছাড়ে না যে। বলেঃ ভোলার সঙ্গে আমার গান না শুনলে তাদের আশ মেটে না।

নটবর মুখ ভার ক'রে ব'লে ওঠে, তোমার বাপু ময়রা ভোলার প্রতি একটু নেক্ নজর আছে। নৈলে অত গাল খেয়ে কি ক'রে যে আবার হাসো—বুঝতে পারিনে!

—ভোলা তো গাল দেবো মনে ক'রে গাল দেয় না, পরোক্ষে ও তো আমার প্রশংসাই করে।

—না ওস্তাদ, সেদিনের গানে ঠাকুরুণের নাম নিয়েও আসরে কেচ্ছা করলে তোমার ভোলানাথ। এসব বড্ড মনে লাগে।

এণ্টনী হাসলো, কিছু বললে না।

সৌদামিনীও সেদিন নিজের কেচ্ছা স্বকর্ণেই শুনেছিল ;—লজ্জায় রাগে রাঙা হয়ে সৌদামিনী বাড়ী ফিরে এণ্টনীর সঙ্গে কথাও বলেনি। অনেক সাধ্যসাধনার পর, মায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠার কথা তুলে এণ্টনী সৌদামিনীকে কথা বলাতে পেরেছিল—

—রাজ-মজুরদের পাওনাগণ্ডা তুমিই মিটিয়ে দিও বাপু। আমি ওদের বিকেলের দিকে আসতে বলেছি।

—ও সব তোমার করলে হতো না। আমি মেয়েমানুষ, কি দিতে কি দেবো—সৌদামিনী তখনই কথা বলেছিল।

—এণ্টনী হেসে ব'লে ওঠে, তোমার হিসেব ভুল হয় না গো।

—যাও, ঠাট্টায় আর কাজ নেই। বাইরের ঘরে কারা যেন রয়েছে ?

—নটবর নিতাইরা বোধ হয়।

—নটবরকেই ভার দিয়ে যাও না।

—তা কি ক'রে হবে, আমাদের যে আজ বরানগরে গান রয়েছে। আজ এক চোট নেবো ভোলাকে।

সৌদামিনী চোখ পাকিয়ে বলে, জানা আছে মুরোদ !

—চল না গিয়ে দেখবে, কি করি আজ ময়রাকে।

—আমার শরীর ভাল নেই, রাত জাগতে পারবো না। সৌদামিনীর মুখখানা গম্ভীর হয়ে ওঠে কথা শেষে।

এণ্টনী উদ্বেগ নিয়ে কাছে আসে। সৌদামিনীর গায়ের উত্তাপও পরীক্ষা করে। তারপর হেসে বলে, রাগ তোমার এখনও পড়েনি। আচ্ছা, না যেতে পারো তাতে কি হয়েছে ; চর মারফৎ খবর করো কি করি আজ।

সৌদামিনী আড়ে এণ্টনীকে লক্ষ্য ক'রে দেখে উদাস সুরে বললে, মণ্ডা-মিঠাই খেয়ে ময়রারই জয় গেয়ে আসবেখন।

এণ্টনী কিছু বললে না। বেশ একটু ক্ষুণ্ণ হয়েই ডাবর থেকে কয়েকটা খিলি পান মুখে পুরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সৌদামিনী অবাক হয়েই চেয়ে থাকলো ঃ এণ্টনী হঠাৎ চলে যাবে ভাবতে পারেনি ও। আফশোষও হয়—অভিমানের অত বাড়াবাড়ি না করলেই ভাল হ'ত—দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নিজেকে গৃহকর্মে ব্যস্ত রাখতে চেষ্টা করে সৌদামিনী।

•

বরানগরের আসর। হৈ-হৈ ক'রে নাচানাচি চলছে রীতিমত এণ্টনী আর ভোলানাথের পক্ষ-বিপক্ষদের মধ্যে। নানান্ পেশার লোক গোঁড়া হয়ে উঠেছে আজ এণ্টনীর পক্ষ নিয়ে! চাষী, বাজারের ফড়ে, ভদ্র, ধনী, মধ্যবিত্ত—সব ধরণের শ্রোতারাই আজ এণ্টনীর পক্ষ নিয়ে নাচানাচি করছে।

সত্যি সত্যি এণ্টনী ভোলানাথকে কিছুতেই ছেড়ে কথা বলছে না। শ্রোতারা জল খেতে উঠতেও ভুলে যাচ্ছে।

—এমন লড়াই আর কখনও শুনিনি, "রিজ এণ্ড রাইয়ৎ" সম্পাদক মন্তব্য ক'রে ওঠেন। কলকাতার সমজদাররাও পরস্পর বলতে থাকেন ঃ কেউ কম নয়, যেমন ফিরিঙ্গী এণ্টনী তেমন ভোলানাথ। রাত কাবার হয়ে গেলো, এখনও সমান পাল্লা!

—বহুত আচ্ছা সাহেব, বেশ হচ্ছে।

—কিন্তু কখন শেষ হবে ভাই। বেলা যে অনেক, রোদ হলো কটকটে, আজ আর দোকান বসাতে হবেক না।

—আরে শুনে লও। এমনটাক পাবেক কোথা গো!

ভোলানাথেরও ক্লান্তি নেই। হাসিমুখে সেও একটির পর একটি কাটান ক'রে নতুন চাপান দিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু বেলা ক্রমশঃ বাড়তে থাকলে কিছু শ্রোতা সোরগোল তোলে—শেষ মার মেরে দাও ভাই, বাড়ী গিয়ে ভাত খাই।

এণ্টনী আসরের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে হেসে নটবরকে ইসারা করলে বাজাতে। তারপর ব্যঙ্গের ভঙ্গিমায় নিজের গলার মালাটি খুলে ভোলানাথের গলায় পরিয়ে দিলে।

গলায় মালা পরাতেই জ্বালায় যেন চিড়বিড় করছে শরীর, এইভাবে নৃত্য শুরু করলে ভোলানাথ। আর ভোলার ঢুলি দীনুও বাজনা ধরলে নাচের তালে তালে।

আসরে সোরগোল উঠল—সাহেব আমাদের রণে ভঙ্গ দিলে রে! ঐ দেখ, ভোলার নাচন দেখেনে রে, দেখেনে!

ভোলা সত্যি সত্যিই জ্বলে উঠেছে মনে মনে। আশ মেটেনি ওর। এণ্টনী ওকে গানে আজ এমনই জ্বালিয়েছে তার ওপর হঠাৎ এণ্টনী হার মেনে মালা দিয়ে সে জ্বালা আরো বাড়িয়েই দিলে। ভোলানাথ উচ্চস্বরে সেই জ্বালার কথা ঘোষণা করলে ঃ

ওরে শালা কি জ্বালা, এ মালা দিল রে আমায়
চক্ষে বহে জল অবিরল, বিকল করিল আমার কায়॥
(কি জ্বালা এ মালা দিল রে আমায়)
ওরে হেসুম! মালার কুসুম
(পুষ্প নয়) ফুল-ধনু প্রায়
কি জ্বালা এ মালা দিল রে আমায়॥
মনে কি হয় না উদয়,
ভোলা কভু ভোলবার নয়,
ছলে বলে কৌশলে
মালিনীর মত ফাঁকি দিলে,
আচ্ছা ফন্দী এবার খেলালে
তরে গেলে বড় দায়॥
ওরে শালা, কি জ্বালা এ মালা দিল রে আমায়॥

গান শেষে হৈ হৈ ক'রে আসর ভেঙ্গে গেলো—না, আজ সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলিই হলো। সমান সমান। কেউ কম যায় না। না ভোলা, না ফিরিঙ্গী এণ্টনী।

ভোলা এন্টনীকে যাবার মুখে বললে, তরে গেলি রে! কিন্তু এ মালার শোধ আমি নেবো।

—তা নিস্ ভাই। জয় বল, প্রশংসা বল তোরই, বাবু শম্ভুনাথ তোরই সুখ্যাতি ক'রে গেল।

প্রশংসায় ভোলানাথ সপ্রতিভ হাসি হেসে বললে, সুখ্যাতি আমার একার করেনি, তুমিও পেয়েছ।

এন্টনী হাতের আঙ্গুল দিয়ে সংকেত ক'রে বললে, কণিকা মাত্র। তাও তোমার সঙ্গে ব'লেই। তা ভাই, একটি কথা নিবেদন ক'রে রাখি তোমায়, আগামী শ্যামাপূজার দিন এই অধমের আস্তানায় একটু পদধূলি দিও। ঐদিন আমার মাতৃমূর্তি প্রতিষ্ঠার দিন ভাই। তুমি গেলে গৃহিনী খুব খুসী হবে।

—নিশ্চয়ই যাবো, নিশ্চয়ই যাবো। তার আগে তোমার সঙ্গে হালসিবাগানের গানে দেখা ত হচ্ছে।

—তা হচ্ছে, আর তোমার দোকানেও যাবো। ঐ দিন আমার মন পাঁচেক রসের গোল্লাও বানিয়ে দিও।

—অতো কি হবে হে?

এন্টনী হেসে বললে, অতিথি-সেবায় লাগবে ভাই ভোলানাথ। তোমার দেশের লোকে কি বলবে জানিনে, তবে তোমাদের শক্তি মায়ের কল্পনাটি বড়ই অর্থপূর্ণ, পদতলে শিব হলেন জড়। আর তাঁর বুকে পা দিয়ে শক্তি পেলেন চৈতন্য—কি মনোহর কল্পনা! জড়-শক্তির মিলনেই এই বিশ্বসংসারের কল্যাণ। এ মূর্তি প্রতিষ্ঠার সাধ শুধু ব্রাহ্মণীর নয় আমারও।

—শুনে প্রীত হলাম ভাই এন্টনী। তোমার মনস্কাম পূর্ণ হোক, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি।

এন্টনী তৃপ্তির হাসি হেসে ভোলানাথের করমর্দন ক'রে বললে, তোমাদের মত পাঁচজন জ্ঞানী-গুণীর সদিচ্ছার ফলেই আমি যৎসামান্য জ্ঞান লাভ করেছি ভোলানাথ। প্রথম যৌবনে অসৎ সঙ্গ করেছি। তারপর আমার প্রাণ-প্রতিমার সাক্ষাতে জীবনকে ধীরে বুঝেছি,

উন্মোচন করেছি ভাই। সে-ই সব। তার ইচ্ছে আমি তোমাদের…। ভাববিহ্বল স্বর এণ্টনীর, কথা শেষ করতে পারে না।

ভোলানাথ এণ্টনীর হাতের মুঠি চেপে আন্তরিক স্বরে ব'লে ওঠে, জানি ভাই, তাঁর মত মহিলা এদেশে দুর্লভ। যদিও আসরের খাতিরে, সময় সময় তোমার খাতিরে তাঁকেও একটু আধটু… বুঝলে না…

—তিনিও কুপিত হে তোমার উপর, এণ্টনী হেসে ভোলানাথের কথার মাঝেই ব'লে ওঠে!

—তাই নাকি! তা একদিন গিয়ে ভিজিয়ে আসবো তাঁকে। বুড়ো বয়সে শেষে কি ব্রাহ্মণীর অভিশাপ লাগবে নাকি! হাসে ভোলানাথ।

না না, শাপ-মন্দ করার মত মনের মানুষই সে নয় হে। যেও যেও একদিন। সাক্ষাৎ হলে দেখবে, কি শান্ত উদার মন তার! আজ তা'হলে ভাই চল্লাম।

—কিন্তু কবে আসছো?

—দু'চার দিনের মধ্যেই, এই ব'লে এণ্টনী ভোলানাথের কাছে বিদায় নেয়।

এণ্টনী মহানন্দে মন্দির তৈরীর কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। সময় পেলেই তদারক করে: তাড়াতাড়ি হাত চালাও ভাই। সময় বেশী নেই।

সৌদামিনী কিন্তু অভিযোগ করে: তুমি কিছুই দেখছো না। গঙ্গাস্নানে যাবার আসবার পথে পাল্কি থামিয়ে নিজেও দেখে কাজকর্ম কতদূর এগিয়েছে। প্রতিদিন এণ্টনীকে সকালে জলখাবার খাইয়ে একরকম তাড়া দিয়ে পাঠিয়েও দেয়। আজও তাগিদ দিলে সৌদামিনী, যাও না গো। শেষে বিনি আচ্ছাদনেই না মা-কে প্রতিষ্ঠে করতে হয়!

সৌদামিনীর হতাশ সুর কানে বাজে এণ্টনীর। ও মুখ তুলে বললে, চৌকাঠে দাঁড়ালেই কি করছে না করছে দেখতে পাই। ফাঁকি দিতে কি সাহস পাবে। যা কড়া ঠাকুরুণটি তাদের—এণ্টনী হাসিতে সহজ করতে চায়।

কিন্তু সৌদামিনী মুখ ভার ক'রেই বললে, হতো তোমার ভোলার নেমনৃতন্ন! অমনি ছুটতে শনৈশনৈ।

—কি যে বল সখি। তোমার ডাক তোমার কাজ সবার আগে। এণ্টনী আরো মন ভেজানোর উদ্দেশ্যে সৌদামিনীকে কাছে টানবার চেষ্টা করতেই ও পিছিয়ে গিয়ে কপট ভৎ'সনা ক'রে ব'লে ওঠে: যত বয়স বাড়ছে ততই ভীমরতি হচ্ছে তোমার। এই সাত-সকালে টানাটানির কি বয়েস আছে নাকি!

—আছে গো আছে। তোমার যত বয়েস বাড়ছে ততই যে সুন্দর হচ্ছো মধুমুখী! লোভ আমি সামলাই কি ক'রে বলোতো? এণ্টনী দুষ্টু হাসি হেসে সৌদামিনীকে ধরবার জন্য দুই হাত প্রসারিত করে।

—সত্যি বাপু রঙ্গ রাখ। দেখগে না, ছাত পিটতে মাগীগুলো এসেছে কি না।

—মাগী দেখবো কি গো সাত-সকালে! এণ্টনী হাসে হো হো ক'রে।

—রঙ্গই কর: সৌদামিনী মুখ ভেংচে চলে যাবার উদ্যোগ করে।

—যাচ্ছো কোথায়? শোন শোন, আমায় পান ত দিয়ে যাও। বেরুব, তোমার মন্দিরের তদারকেই বেরুব। ফিরে তাড়াতাড়ি আবার মহলায় বসতে হবে। গান আছে যে আজ হালসিবাগানে।

—সে আমি জানি, তুমি আর গেছ। এখুনি নিচে গিয়ে গাঁজার সাজ নিয়ে বসবে, এই ব'লে সৌদামিনী এগিয়ে আসে। পালঙ্কের নিচে ডাবর থেকে পান বের ক'রে এণ্টনীর হাতে তুলে দিতেই এণ্টনী সৌদামিনীর চিবুক স্পর্শ ক'রে বললে, তোমার কাজেই যাচ্ছি, ভোলার গানের কথা পরে ভাববো কি বল?

—থাক, আর শুকনো পিরীতে কাজ নেই!

—রসই পিরীতের রীতি সখি। শুকনো পিরীত তো হয় না।

—হয় না, কিন্তু হচ্ছে যে চোখের সামনে। সৌদামিনী রাগত স্বরে ব'লে ওঠে, নৈলে এক কথা নিয়ে খোসামোদ করতে হয়। এটা কি রসের আদিখেত্যা নাকি!

—এই দেখ রেগে উঠছো তুমি! কিন্তু সৌদামিনী, রাগলে তোমায় এত সুন্দর মানায় কি বলবো? বুড়ো হলে কি এত রং আসে—কৈ দেখি দেখি!

—যাও, আর দেখতে হবে না। সৌদামিনী এণ্টনীকে কাছে ঘেঁসার অবকাশ না দিয়ে ঘর ছেড়ে চলে যায়।

এণ্টনী হাসলো একচোট। তারপর পানের খিলি কয়েকটা মুখে পুরে চর্বণ করতে করতে মখমলের পাদুকাটি পায়ে দিয়ে পথে নেমে সৌদামিনীরই কথা রাখে: মন্দির তদারক করে অনেক বেলা পর্যন্ত। শেষে সৌদামিনীকেই ডেকে আনতে হয় নটবরকে পাঠিয়ে।

খেতে বসে এণ্টনী বললে, মনে হচ্ছে দিন দশেকের মধ্যেই ছাদটা শেষ হয়ে যাবে। দিয়েছি আজ খুব ধমকে।

সৌদামিনী কোন কথা বলে না। চুপ ক'রে থাকে।

—বুঝলে সৌদামিনী মণ-পাঁচেক রসের গোল্লা বানাতে বলেছি ভোলাকে।

এবার সৌদামিনী মুখ খোলে, বলে, ভোলার সবই ভাল যে দেখছি! এত গাল দেয় তবু কি যে আটার কাটি লাগিয়ে দিয়েছে সেই জানে!

—আজও তো গান আছে, যাবে নাকি?

—না, গাল শুনতে যাবার সাধ নেই। ওকি, দুধটা আবার পড়ে রইল কেন?

—আর পাচ্ছিনে গো। বড় চাপ লাগছে পেটে। রাতে গাইতে হবে না—চাইলো করুণ চোখে এণ্টনী সৌদামিনীর দিকে।

—হ্যাঁ, মণ্ডা-মেঠায়ের জন্যে এখন থেকেই জায়গা রাখবে না!

রাখো আর নাই রাখো, এই দুধটুকু তোমায় খেতেই হবে। নইলে আজ আর……কথা শেষ না ক'রে চোখ পাকায় সৌদামিনী।

এণ্টনী মিনমিনে স্বরে ব'লে ওঠে, খেতে না পারলেও খেতে হবে, একি শাসন রে বাবা! মুখে বললেও খেয়ে নেয় এণ্টনী দুধটুকু চুমুক দিয়ে। তারপর ঢেঁকুর তুলে কোনমতে উঠে দাঁড়ায়।

সৌদামিনী বললে, দু'দণ্ড শুয়ে তারপর যা খুশী তাই করো, কিছু বলতে যাবো না।

এণ্টনী চোখ মোটকে মুচকি হেসে বললে, শুতে কি মন চায়। তুমি থাকবে পাশের ঘরে মহাভারতে ডুবে, আর আমি শুয়ে শুয়ে কড়িকাঠ গুণবো নাকি?

সৌদামিনী জবাব দেয় না, আপন মনে পান সাজতে থাকে।

এণ্টনী ইচ্ছে ক'রেই দাঁড়িয়ে থাকে সৌদামিনীকে রাগানোর জন্যে। বেশ খানিকক্ষণ পর সৌদামিনী দমকা স্বরে বললে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাতের সোগড়ি শুকোবে নাকি। হাত ধুয়ে এসো না। অভিমানের কথা এমন কিছু বলিনি। কথায় কথায় এমন অভিমান করলে কি করি বলোতো। আমার ঘাট হয়েছে, তোমার যা মন চায় তাই কর বাপু, সৌদামিনী মুখ গোমড়া ক'রে বসে থাকে।

এবার এণ্টনী সরসকণ্ঠে হেসে বললে, আমার ওপর রাগ ক'রে তুমি যে বেশীক্ষণ থাকতে পারো না, তার প্রমাণ হাতে হাতে পেলে তো?

—ওইটিই জানো ব'লেই তো আমায় জ্বালাতন করো। এখন যাও, হাতটা ধুয়ে এসে আমার মাথা রক্ষে কর।

এণ্টনী হেসে চলে যায়, কিছু আর বলে না।

মান-অভিমানে মিলন-বিরহে দিন কাটে এণ্টনীর। রাতে গানের আসরে যে ক্লান্তি জমা হয়, সৌদামিনীর সরস সাহচর্যে তা দূর হয়ে যায়। আবার নতুন উৎসাহে আসরে নামে এণ্টনী।

হালসিবাগানে গানের আসরে যাবার প্রাক্কালে সৌদামিনী ঠাকুরের ফুল এণ্টনীর হাতে দিয়ে বললে, ভাল ক'রে গেয়ো গান।

এণ্টনী সৌদামিনীর কপালে চুম্বন এঁকে বললে, গাইবো গো মন খুলেই গাইবো।

সৌদামিনী এবার তির্যক চাহনির সঙ্গে ঠোঁটে হাসির রেশ রেখে বললে, তোমার ভোলানাথকেই মিষ্টির বায়না দিয়ো, বুঝলে। আর বলবে তাকে, রসকে যেন গোল্লায় না দেয়! রাম বসুর বিরহের মিহিদানার মতন মিহি না হোক রসগোল্লাই যেন বানায়।

এণ্টনী মেজাজী হাসিতে সৌদামিনীকে তারিফ করে, বেশ বলেছো কথা! বলবো, নিশ্চয় বলবো ভোলাকে। আচ্ছা এখন অনুমতি দাও যাই। দেরী হল বোধ হয়। নীচে ওরা অনেকক্ষণ ধরেই অপেক্ষা করছে। আসি তাহলে, এই ব'লে এণ্টনী বেরুনোর উদ্যোগ করে।

সৌদামিনী স্নিগ্ধ মনে শান্ত চোখে চেয়ে থাকলো।

কলকাতার হালসিবাগান। জমজমাট। বারোয়ারীতলায় বিভিন্ন ধরণের লোকের সমাগম। ভোলা-এণ্টনীর গান শুনতে সংস্কৃত কলেজ থেকে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র এবং আরো পণ্ডিতরা এসেছেন। শম্ভুবাবু, মুন্সীবাবু প্রভৃতি কবি-গানের সমজ্‌দাররা আসরে এসে বসেছেন। বাবুমহলের অনেকে এসেছেন বাইজীর আসর ছেড়ে। ঝানু মাতালদের কেউ কেউ ইংরেজী কায়দায় 'রাবিশ! যত সব নেষ্টি নোয়েস!' বলতে বলতে আসরে ঝুপ ক'রে বসে পড়ছে। কেউ কেউ আসরের দেরী দেখে চুটকি গান ধরেছে ইয়ার-বন্ধুদের নিয়ে নিচু সুরে:

হদ্দ মজা কলিকালে কল্লে কলকাতায়।
মাগীতে চড়লো গাড়ী, ফেটিং জুড়ী, হাতে ছড়ি হ্যাট্ মাথায়।
ষষ্ঠী মাকাল আর মানে না, সেঁজুতির ঘর আর আঁকে না,—
এখন গাউন পরে, ঘোড়ায় চড়ে, গঙ্গাস্নান ত দেছে ছেড়ে
গোসলখানায় খানসামাতে গা মোছায়!…

—বা ভাই, বেশ!

—কোথায় শিখলি ভাই?

—হেঁ হেঁ বাবা, একি তোর কবি—ছো! এ হলো মজলিসি।

—আরে আসুন আসুন—এই যে৷ জায়গা এখানে।

—কখন আরম্ভ হবে ?

—এই বোধ হয় সুরু হবে—ঢোল-টোল নিয়ে দোহাররা ত বসে গেছে। ঐ ঐ এণ্টনী এসে গেছে। না, বয়স হয়েছে অনেক হে !

—তা হবে না। ছোট বয়স থেকেই ত শুনছি এণ্টনীর নাম।

—দেখ না কি রকম দম আছে।

—তা থাকবে না বাবা, ওরা কি যে-সে লোক—এণ্টনী-ভোলার গলার জোর চিরকালই থাকবে হে, ওরা হলো গিয়ে তোমার যাকে বলে বরন্ পোয়েট্। ঐ বাজনায় ধরতা চলেছে।

এণ্টনী মেজাজে পান-মুখে রাঙা-ঠোঁটে হেলে-দুলে ধরতা দিলে সখীসংবাদের ঃ

ফিরে এস হে, রাধার মান দেখে মান ক'রে শ্যাম আজ যেও না।
তুচ্ছ নারীর মান ক'দিন রবে, তোমার রাই তোমার হবে,
শ্যাম হে, কেবল কথাই রবে,
রাগের ভরেতে ব্রজাঙ্গনার প্রাণ বধো না ॥

—লাখো লাখো বরস্ জিয়ে রহো সাহেব ! আহা ! শ্রোতার মেজাজ আসে।

এণ্টনী মিচকি হেসে রঙ্গ-ভঙ্গিতে খাদে গাইলো—

চল হে নিকুঞ্জে, মান যাবে না ॥

—বলিহারি ! এ যেন ইলশে গুঁড়ি। ধরলেই পড়বে আর রাধা খাবে গো কৃষ্ণ ডিয়ার !, মাতাল রসিক পার্শ্বরস জমায়।

—চুপ কর, নৈলে তুলে মাতলামী বের ক'রে দেবো।

মাতালটি ভয়ে চুপ ক'রে বিড়বিড় করে।

ফুকায় এণ্টনী গেয়ে ওঠে ঃ

শ্যাম তুমি হে রসিকমণি, জানি তোমার চিন্তামণি,
গুণমণি বলি শ্যাম তোমায়, তুচ্ছ তায়।
(শ্যাম হে) থাক বঁধু ধৈর্য ধরে, পাবে তোমার শ্রীরাধারে,
কালো বরণ না দেখে রাই অমনি মূর্চ্ছা যায় ॥

দোহাররা এণ্টনীর সঙ্গে মেলতা ধরে :

এতই চিন্তা কেন গুণমণি শ্যাম
নীরোদ-বরণ নীরদ-বরণ
মানের দায় বংশীবদন আর কেঁদো না ॥

—ও হো ও হো ! কেঁদে কালা ধেনু চরাগে যা ! হাসির রোল ওঠে শ্রোতাটির মন্তব্যে।

চিতেনে গলা চড়ালো এণ্টনী :

শ্রীমতী মানের দায়ে বিদায় তুমি বল্লে এখন ॥

পড়েনে হাতের মুদ্রাসংকেতে গায় এণ্টনা :

রাধার মান দেখে তোমার প্রাণ কাতরা অধরা হে
দুঃখে দহে জীবন ॥

আধুনিক শ্রোতারা মুখ বাঁকায়—এ মাইরি সেকেলে পচা জিনিস রাধে আর কেষ্ট—ছোঃ !

—বস না, এই ত সবে সন্ধ্যে। জমবে তখনই যখন ভোলা বোল ছাড়বে।

ওদিকে এণ্টনী গেয়ে যায় :

(২ ফুকা) রাই তোমায় বিদায় দিয়ে, কুঞ্জে কাঁদেন ব্যাকুল হয়ে,
আকুল হয়ে ধৈর্য ধরে না ধরে না শ্যাম হে।
আমরা উভয় পক্ষের দাসী, উভয় পক্ষ ভালবাসি,
রাধাশ্যাম বিচ্ছেদ হলে প্রাণে সহে না ॥

এবার এণ্টনী হেসে মেলতা ধরে :

প্যারী কাল ভালবাসে জনি হে কালশশী,
শ্রীরাধার মানের দায়ে আর ভেব না ॥

(অন্তরা) বলবো কি হে শ্যাম তোমাকে
গিয়ে রাধার দশা দেখ চোখে ॥
পড়েছেন রাই ধরাতলে, সদাই ডাকেন কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে,
কৃষ্ণ কই বোলে বোলে ॥
হয়ে কৃষ্ণহারা, প্রাণ কাতরা, সদাই কাঁদে মনের দুঃখে ॥

—ধন্য ধন্য ! আহা এ যেন গোঁসাই ভাবে-স্বরে ! ধন্যি এণ্টনী !

—সত্যি, আশ্চর্য লাগে এণ্টনী সাহেবকে !

—তা যা বলেছো। এ যেন বংশধারার শিক্ষার মতন ধ্যান গান। কিন্তু সত্যি সত্যি তো ও বিদেশী—আশ্চর্য, কি ক'রে রপ্ত করলে ভাবতে পারাও যায় না।

এণ্টনী দ্বিতীয় চিতেনে গান ধরল :

কাতর বল্লেম তোমায়,
তাতেই হরি আমরা গোপীকায় ॥

তারপর পড়েনে ছন্দের তালে তালে নাচের ভঙ্গিতে গেয়ে ওঠে :

চল চল শ্যাম হে, সেই রাধার কুঞ্জে,
বলি তাই হে, ধরি রাঙ্গা পায় ॥
কৃষ্ণপ্রাণা রাই, বলি তাই শ্যাম হে,
আমরা সবে ব্রজনারী, কৃষ্ণ বিনে সইতে নারি,
চরণ বিনে গোপীগণের অন্য উপায় নাই ॥

—মনে বড় সন্তোষ হলো হে! সম্ভ্রান্ত শ্রোতা তৃপ্তির স্বরে পাশের শ্রোতাটিকে ব'লে ওঠে।

ওদিকে নটবর ঘুরেফিরে বাজনায় চমক সৃষ্টি করছে। এণ্টনীও মুগ্ধ হয়ে তালে তালে নাচে। আসর নিশ্চুপ। বেশ খানিকক্ষণ গেলে নটবর তেহাই দিলে এণ্টনী মেলতায় গেয়ে ওঠে :

তোমার অভয় পদে আছি সঁপে মন,
গোপী সবে ঐ চরণ বিনে নাইকো আর উপায় ॥

গান শেষে শ্রোতারা আনন্দে এণ্টনীকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ক'রে ওঠে : আজ অদ্ভুত গলা বল্লছে, অদ্ভুত! আজ নেওয়া চাই-ই ভোলাকে।

—দেখবো দেখবো কি কর তুমি! ভোলার গোঁড়ারাও চীৎকার করে।

বিরতিতে পরিচিত অপরিচিত পরস্পর কবি-গানের আলোচনায় মুখর হয়ে ওঠে।

এরপর আবার আসর জমে। ভোলানাথ পালটা করে। তারপর এণ্টনী উত্তর দেয়। আসরে ধীরে ধীরে উত্তেজনাও বাড়ে। উভয়

পক্ষের গোঁড়াদের মধ্যে গালাগালিও চলে। রাতও প্রায় শেষ হয়ে আসে। কিন্তু শেষবেশ ভোলানাথ এণ্টনীকে জব্দ করলে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ তুলে।

চোখ ঠেরে ব্যঙ্গ ভঙ্গিতে কোমর বেঁকিয়ে ভোলানাথ গান ধরলে ঃ

ওহে সাহেবের পো এণ্টনী,
তোর কটা বাপ বল শুনি।
না বল্‌তে পারলে দেখ্‌বি আজ ভোলার কেমন শক্ত ঘানি।
বিলাতে তোর আসল বাবা, এখানে তোর পাদরী বাবা,
তোর মত হাবাগোবা আমি আর দেখিনি।
পথেঘাটে দেখিস্‌ যারে, অমনি বাপ বলিস্‌ তারে,
যেতে হবে শীঘ্র গোরে, তার কিছু তুই করলিনি,
শোন্‌রে গুণধর, তোর নাই বংশধর,
তোর বংশ-রক্ষার বন্দোবস্ত করবে তোর বাম্‌নী।
করবে তোর সৌদামিনী বাম্‌নী॥

—তাই নাকি! চুপকে চুপকে, এ ত ডহর জলের ন্যাটা মাছ বাবা! হো হো শব্দে শ্রোতা হাসে।

নটবর রাগে জ্বলতে থাকে। এণ্টনীরও মুখ রাঙে।

বিশিষ্ট শ্রোতাদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র মন্তব্য করেন, ভোলার মত কবি হয় না। অমন উপস্থিতবুদ্ধি কারো নেই।

ভোলা মুচকি হেসে চোখ মোটকে গান ধরলে নেচে নেচে ঃ

তোর রসবতী গুণবতী ঘরের শ্রীমতী
জুটবে তার কতশত সুরসিক পতি।

—তোমারও নোলা আছে নাকি ভোলা ময়রা? এণ্টনীর গোঁড়াদের একজন চীৎকার ক'রে ওঠে।

ভোলানাথ এসব কান করে না। ও গেয়ে চলে ঃ

কফিনে পা দিবি পুরে, ঢুকবি গিয়ে অম্‌নি গোরে,
যীশু বলবি বদন্‌ ভরে, তার উপায় কি বল শুনি।
না ভজিলে যীশু-নাম, তোর গোরে ডাকবে ব্যাঙ,
ভেঙে দেবে তোর ঠ্যাঙ্‌, যত মাম্‌দো ভুত আর পেতনী॥

ভোলার গান শেষ হলে আসর হৈ হৈ ক'রে ওঠে এন্টনীর গান শোনার জন্যে।

এন্টনী ওঠে। নটবর বাজনা ধরে। এন্টনীও রাগের ঝাল ঝাড়ে ভোলার রসকলি, বৈষ্ণবী ভেক্‌কে বিদ্রূপ ক'রে, ওকে নচ্ছার প্রতিপন্ন ক'রে নাজেহালও করে।

শ্রোতা আবার এন্টনীর গুণ গেয়ে হৈ হৈ ক'রে আসরে ঝাঁপাই ঝোড়ে। জয়-পরাজয় নিষ্পত্তি হয় না। দুই-ই সমান, এই রায়ে আসর ভাঙে।

বাড়ী ফেরার মুখে এন্টনী তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললে, শোন ভোলা, বামনীর আমার শুধু ইহকালেরই নয় পরকালের সঞ্চয়ও করিয়ে দিচ্ছি। তোমায় বলেছি, এখনও বলছি, আগামী চতুর্দশীতে যেতে, কি করছি দেখে এস, নেমন্তন্ন রইল।

—নিশ্চয় যাবো, মহানন্দে যোগ দেব রে হেস্‌সুম, ভোলানাথ হেসে আহ্লাদ ক'রে ব'লে ওঠেঃ বড্ড লেগেছে দেখছি বামনীর জন্যে!

—তোমার পরিবার তো ডালভাত! উদরস্থ করলেই বাঁচো। কিন্তু আমার যে মালা। গলার মালা, বুঝলে ভোলানাথ।

ভোলানাথ একগাল হেসে বললে, তা আর জানি না। জানি ব'লেই তো ঠুকি! না ঠুকলে তুই যে বাজিস্‌ না। তুই বাজলেই তো আমি আরাম পাই হেস্‌সুম!

—তোমার মনের ইচ্ছে তুমিই জানো। তবে কি জানো ভাই ভোলানাথ, আমার গিন্নীর নামে কিছু বললে আজকাল আরো বেশী ক'রে বাজে। বোধ হয় বয়েস হয়ে গেছে ব'লেই,—ম্লান হাসে এন্টনী।

ভোলা এন্টনীর পিঠ চাপড়ে বললে, বুড়োবুড়ীর পিরীতের তুলনা নেই ভাই হেস্‌সুম।

এন্টনী ঘাড় নেড়ে বললে, তাই বুঝেছি, বয়েস না হলে প্রেমের আসল রসই পাওয়া যায় না। তা চলি। গিন্নীর কড়া হুকুম, মন্দির এই সপ্তাহের মধ্যেই শেষ করতে হবে। তা হ্যাঁ, তুমি মিষ্টিটা যথাসময়ে তৈয়ার রেখো। আমি যাই বা আমার লোক গেলে দিয়ে দিও।

আর তুমি যেন ভুলে যেও না আসতে। আমাদের জানাশোনা কবিওয়ালাদের সকলকেই বলেছি।

—না না, ভুলবো কেন। নিশ্চয়ই যাবো।

—এস তা হলে। আমি চল্‌লাম ভাই ভোলানাথ। এণ্টনী মনে কোন রকম রাগ-অভিমান না রেখেই স্বাভাবিকভাবেই বিদায় নিলো ভোলানাথের কাছ থেকে।

জব চার্ণকের সহর কলকাতা। এই তো সেদিন চার্ণক সাহেব জাহাজ নঙর ক'রে তীরে নামলেন। গঙ্গার তীরে গোলপাতার আট-চালা বানালেন জনকয়েক ইংরাজ কর্মচারী নিয়ে। গঙ্গার তীরে বটতলায় বসে বসে সহর বানাবার স্বপ্ন দেখলেন। তারপর ঐ গঙ্গার তীরে কোন এক সহমরণ-ভীতা সুন্দরী হিন্দু রমণীর চীৎকার শুনে তাকে উদ্ধার ক'রে তার রূপে মুগ্ধ হয়ে বিবাহ করলেন। কোম্পানীর সহর গড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের ভাবী বংশধর রেখে কালের কাছে মাথা নত করলেন জব চার্ণক আর সেই সুন্দরী বঙ্গনারী এই সহর কলকাতায়।

তারপর একদিন ইংরেজরা কালীঘাটের মন্দিরে পুজো দিয়ে পলাশী যুদ্ধে গিয়েছে—বাংলা-বিহার উড়িষ্যায় ইংরেজ রাজার নিশান উড়িয়েছে। তারপর জয়োল্লাসে ধনরত্ন লুণ্ঠন আর নারীমেধ যজ্ঞে তৎপর সেদিনের সেনানী ইংরেজ আবার ধীরে ধীরে স্থির হয়েছে। রাজ্য-বিস্তারের উদ্দেশে দেশী-বিদেশীর সখ্যতার মধ্যমানের নীতি গ্রহণ করেছে। হেষ্টিংস-ফ্রান্সিসের ব্যক্তিগত প্রেমের দ্বন্দ্ব যুদ্ধের শেষেও ঐ মধ্যমান নৈতিক আচরণের প্রশ্ন থেকে গেছে—বিলাতের আদালতে জেরও টেনেছে ফ্রান্সিস।

সেই কলকাতার কৈশোরের একটি হেমন্ত সন্ধ্যায় হান্সম্যান এণ্টনী বৌবাজারের বাসিন্দাদের জানান দিলো কালীপুজা এ পাড়াতেও হতে পারে।

সুশীলা ডি সিলভারা অবাক হয়।

বাঙালীবাবুরা খবর ছাড়তে থাকেন—ফিরিঙ্গী কালী প্রতিষ্ঠা করলে রে! আজব সহর কলকাতায় কিনা সম্ভব, চ চ দেখে আসি।

ভীড়ে ভীড়। রাস্তা ভরে গেছে।

এণ্টনী পট্টবস্ত্রে ভূষিত হয়ে মন্দিরের সাম্‌নে শান্ত হাসি হেসে অতিথি-আগন্তুকদের করজোড়ে সাদর অভ্যর্থনা করে ঃ আসুন আসুন। এ তো আপনাদেরই মন্দির। এখানে একটিও মায়ের মন্দির ছিল না কিনা তাই মায়ের আমার ইচ্ছেতেই এই মন্দির ঃ এণ্টনীর তৃপ্তিভরা শান্ত স্বরে অতিথিরা সন্তোষ লাভ করেন।

সৌদামিনী তৃপ্ত। শুচিতায় স্নিগ্ধ শান্ত মন। গরদ শাড়ী পরে পুজোর আয়োজনে তৎপর সৌদামিনী।

—এস ভোলানাথ, এস। এস, রামবাবু যে! আরে স্বর্ণকার-মশায় যে, আসুন আসুন, ওহে নটবর, পান-তামুকের ব্যবস্থা করো—এণ্টনী উৎসব আনন্দে বাড়ীর কর্তার দায়িত্ব পালনে মশগুল হয়ে ওঠে।

দীপালীর আলোর মালা। অসংখ্য প্রদীপ-আলোয় অমানিশার শঙ্কা কাটে—চৈতন্যের আবির্ভাবে জড়ে প্রাণ সঞ্চার হয় ঃ এণ্টনী অর্দ্ধ-নিমীলিত নয়নে আরতির সময় প্রতিমা অবলোকন করে। সৌদামিনীও অপলক দৃষ্টিতে এণ্টনীর ভাবান্তর লক্ষ্য ক'রে আশ্চর্য হয়।

আজ যদি জোসেফের মত কোন বাল্যবন্ধু এখানে উপস্থিত থাকতো, যদি কিছুক্ষণ এণ্টনীর তন্ময়তা লক্ষ্য করতো তা'হলে সমস্ত বিদ্বেষ মুছে ফেলে ওর আন্তরিকতাকে শ্রদ্ধা করতো।

পুজো শেষ হলে মন্দির-প্রাঙ্গণে নটবর ঢোলের বাজনা সুরু করে।

আর এণ্টনী করজোড়ে মুদিত নয়নে গেয়ে ওঠে—

দয়াময়ী, আজ আমায় দয়া করবে কি মা,
কোন কালে বা কারে তুমি দয়া করেছ।
জানি তোমার চরণ সাধন করি
ব্রহ্মা হলেন ব্রহ্মচারী—দণ্ডধারী,
দেখ সকল ফেলে, ক্ষীরোদ জলে ভাসলেন শ্রীহরি—

আবার শূন্য ক'রে সোনার কাশী
ওগো শ্যামা সর্বনাশী,
শিবকে ক'রে শ্মশানবাসী
সন্ন্যাসী তায় সাজিয়েছ।

এণ্টনীর দু'চোখ বেয়ে ধারা নামে। পরিচিত অপরিচিত জন বাইরে বিস্ময়ে হতবাক হলেও এণ্টনীর আকুলতা তাদেরকেও অন্তর-মুখী ক'রে তোলে।

সৌদামিনীর আনন্দের সীমা নেই।

অশ্রুবিগলিত নয়নে প্রতিমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে আনন্দাশ্রু ফেলে আর অন্তর অনুভূতির কাঁপনে কাঁপে।

হাস্যম্যান এণ্টনী মুদিত নয়নে দরদ-ভরা কণ্ঠে আত্মনিবেদন করতে থাকে ঃ

ভজন পূজন জানিনে মা, জেতেতে ফিরিঙ্গী
যদি দয়া ক'রে তারো মোরে এ ভবে মাতঙ্গী ॥

প্রেম-ভক্তি-শ্রদ্ধায় আত্মসমর্পনের বিশ্বাসানন্দে এণ্টনী মশগুল হয়ে ওঠে। জীবনের আর এক নতুন অধ্যায় যেন খুঁজে পায় সে।

তারপর কালসমুদ্রে আরো দিন গেছে। অনেক অনেক দিন। এণ্টনী অনেক গান গেয়ে বাংলার রসিক চিত্তে রস জুগিয়ে এক সময় গৌরহাটির সৌদামিনীর ভালবাসার নীড়ে ঘুমিয়ে গেছে।

আজও গঙ্গায় ছায়া পড়লে, সমস্ত কলরব শান্ত হলে, মন্দির-মসজিদ-গীর্জায় সন্ধ্যা-উপাসনা আরম্ভ হলে তোমার মত কেউ যদি এই গঙ্গার কোলে ক্ষণেক স্তব্ধ হয়, তাকেও পরম যত্নে পুরাতন ধুলি কবিয়াল এণ্টনী ফিরিঙ্গীর এই কাহিনী শুনিয়ে যাবে।